

স্ফোটবাদ বিচার

শ্রীভক্তিবিনায়ক ভারতী

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গী জয়তঃ ।

স্ফোটবাদ বিচার

বর্ণ ও শব্দের অর্থপ্রকাশ শক্তি, উৎপত্তির মূল, তত্ত্ব, সিদ্ধান্ত, বিভিন্ন প্রকাশ বিচিত্রতা, শব্দ-ব্রহ্মের প্রকাশ বৈচিত্র্য ও মহাশক্তি-মত্তত্ব, শ্রীনাম ভজনের মৌলিকত্ব এবং মহাপ্রকাশ-মাহাত্ম্য ও উপায় সুবৈজ্ঞানিক ও সুদার্শনিক বিধানে প্রকাশিত গ্রন্থ। শ্রীকৃষ্ণলীলার অপ্রাকৃতত্ব ও গূঢ় সিদ্ধান্ত বিদ্বদ্ৰুঢ়ি বৃত্তিতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা তত্ত্বানুসন্ধিসু ও দার্শনিক-গণের মহা উৎকর্ষা বৃদ্ধিকারী ও মীমাংসা গ্রন্থ। শুদ্ধ নাম-ভজনকারীর যে-সকল বিষয় না জানিলে বহু সাধনেও শ্রীনাম-প্রভুর কৃপালাভ হইতে পারে না, তাহার বিস্তৃত বিবরণ ও প্রণালী-বিধানে একমাত্র সহায়ক। সঙ্গীত বিষয়ক সকল তথ্য, প্রকার-ভেদ ও মাহাত্ম্য সম্বলিত গ্রন্থ।

শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণ-পার্শ্বদ-প্রবর ঔষিষুপাদ শ্রীশ্রীগম্ভাজিসিদ্ধান্ত-
সরস্বতী গোস্বামি ঠাকুরের কৃপাকণাধারী
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীগম্ভাজিবিন্যাস ভায়তী মহারাজ
কর্তৃক সংগৃহীত, সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।

আনুকূল্য-৬০, ~~৬০~~ টাকা মাত্র

—ପ୍ରାପ୍ତିସ୍ଥାନ—

ଶ୍ରୀରୁପାନ୍ତୁଗ ଭଜନାଶ୍ରମ—ପି, ଏନ, ମିତ୍ର, ବ୍ରିକଫିଲ୍ଡ ରୋଡ,
କଲିକାତା—୧୦ ।

ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ଗୌଡ଼ୀୟ ଋଷି—୩୧, ସତୀଶ ମୁଖାର୍ଜି ରୋଡ,
କଲିକାତା—୨୬ ।

ଶ୍ରୀରୁପାନ୍ତୁଗ ଭଜନାଶ୍ରମ—ପୋ: ଶ୍ରୀମାୟାପୁର, ଈଶୋଦ୍ୟାନ,
ହଲୋର ଘାଟ, ନଦୀୟା ।

ସଂସ୍କୃତ ପୁସ୍ତକ ଭାଣ୍ଡାର—୩୮, ବିଧାନ ସରଣୀ, କଲିକାତା—୬ ।

ମହେଶ ଲାଇବ୍ରେରୀ—୨୧୧, ଶ୍ୟାମାଚରଣ ଦେ ପ୍ଲଟ (କଲେଜ
ସ୍କୋୟାର) କଲିକାତା—୧୨ ।

ତା:—ଉତ୍ଥାନକାଦଶୀ ତିଥି ।

୧୧ଟି କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ରବାର, ୧୩୧୧ । ଇଂ :ଲା ନଭେମ୍ବର ୧୯୬୮ ।

ତ୍ରିଦଣ୍ଡିସ୍ଵାମୀ ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ରୀବିଳାସ ଭାରତୀ ମହାରାଜ କର୍ତ୍ତୃକ
ଶ୍ରୀରୁପାନ୍ତୁଗ ଭଜନାଶ୍ରମ, ପି, ଏନ, ମିତ୍ର, ବ୍ରିକଫିଲ୍ଡ ରୋଡ,
କଲିକାତା—୧୦ ହିତେ ପ୍ରକାଶିତ ଓ ଶ୍ରୀମଦନ ମୋହନ ଚୌଧୁରୀ
କର୍ତ୍ତୃକ “ଶ୍ରୀଦାମୋଦର ପ୍ରେସ” ୧୧୧, କୈଲାସ ବୋସ ପ୍ଲଟ,
କଲିକାତା—୬ ହିତେ ମୁଦ୍ରିତ ।

স্ফোটবাদ বিচার

প্রহ্ন বোধন

যাঁহার প্রকাশে ও কুপায় আমাদের চিত্তদর্পণ আবিলতা নিস্মুক্ত হইবে, ভবমহাদাবাগ্নি নির্বাপিত হইবে, তখন আমাদের শ্রেয়ঃ-কুমুদ-জ্যোৎস্না প্রকাশিত হইবে, বিদ্যা প্রতিভা বিকশিত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণাশ্রিত হইয়া সেবা করিতে থাকিবে, আমাদের প্রশুপ্ত নিত্যানন্দ-সমুদ্র প্রবৃদ্ধ হইবে, প্রতিপদে পূর্ণ-সেবামৃত লাভ করিয়া আমাদের ইতর প্রসঙ্গের ঔজ্জ্বল্য-দর্শনে অনাদর হইবে এবং সর্ব্বাত্মা পরিম্নাত হইবে। আমাদের পরম-পূজ্য, পরম-বিশুদ্ধ শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যকাল যে বিস্মুরিত মহাশক্তি “স্ফোটশক্তি” ধারণ করত নিত্য জীব-কল্যাণব্রতে মহাদাতৃশিরোমণিরূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন, তদীয় পদপৃষ্ঠ নীরে আমাদের নিত্যকাল স্নিগ্ধ করুন। যে স্ফোটের স্কুলিঙ্গ-শক্তির প্রকাশে ভক্তিবিরোধী কৰ্ম্মকাণ্ড-রত, অন্ত্ৰভিলাষ-প্রিয়, মায়াবাদী জনগণও জীবনুক্ত হইয়া, আনন্দরসামৃত সমুদ্রের রসাস্বাদন-লোলুপ হওয়াত নিরন্তর তৎপর হইলেই তাঁহাদের নিজ নিজ বিকৃত শ্রেয়ঃ-পথে ভ্রমণ কার্যে নিশ্চয়ই ঔদাসীন্য লাভ ঘটবে। এবং তাঁহারা কোটি-চন্দ্রশুশীতল শ্রীরূপানুগগণের পদকমলের সৌন্দর্য্য দর্শন, সুরভিগ্রহণ, শ্রবণপুটে হৃৎকর্ণরসায়ণ শ্রীরূপ কথামৃতের পানাদি অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন তারতম্য গ্রহণ এবং সপ্তরসের

তাৎকালিক আগমনের বিচার পরিদর্শন করিয়া ত্রিতাপদগ্ন জীবনে নিত্য পরশাস্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবেন।

এই গ্রন্থের প্রারম্ভে শ্রীল প্রভুপাদের ‘গৌড়ীয়-দর্শনে’ প্রকাশিত ‘ফোটবাদ-বিচার’ উদ্ধার করত তদনুগত্যে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের, শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভুর, শ্রীল রূপ-সনাতন প্রভুর, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের—প্রভৃতি মহাজনগণের প্রকাশিত গ্রন্থ প্রমাণ হইতে সুবৈজ্ঞানিক উপায়ে ফোটবাদের প্রকৃত সুগুপ্ত সিদ্ধান্ত-সকল প্রকাশিত হইয়াছে। ফোটের মহাশক্তির প্রকাশ, মূলতত্ত্ব নিরূপণ, প্রকাশ তারতম্য ও বৈশিষ্ট্য সুবৈজ্ঞানিক উপায়ে শ্রীরূপানুগ-গুরুবর্গের কৃপায় তাঁহাদের শক্তিসঞ্চারে সংগৃহীত হইয়াছে। পরিশেষে ফোটের সঙ্গীতে প্রকাশ বর্ণন করিয়া অপ্রাকৃত শ্রীগৌরকৃষ্ণ সুখানুসন্ধানমূলক সংকীর্ণনাঙ্গরূপ সেবার কথা প্রকাশ করা হইয়াছে। এই গ্রন্থ দার্শনিক, তार्কিক, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ভক্ত ইত্যাদি সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই পরমাদরের গ্রন্থ। ইহাতে কাহাকেও আক্রমণ বা কটাক্ষ না করিয়া সুবৈজ্ঞানিক উপায়ে সত্য নির্ধারণ করা হইয়াছে। জগতের সর্বব্যাপারেই যে ফোটের শক্তি কি ভাবে কার্যকরী হইতেছে, তাহা সুবৈজ্ঞানিক উপায়ে সুযুক্তিধারা প্রদর্শিত হইয়াছে। ঐহিক, পারত্রিক ও পারমার্থিক সকল প্রকার ব্যক্তিরই অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। বিশেষতঃ শ্রীনামভজনকারীর যে বিষয় না জানিলে নামের

কুপা ও শক্তি লাভ করিতে পারিবে না তাহাই বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে ।

সুধী পাঠকবর্গ এই গ্রন্থ আলোচনা করিলে যে, সকল তত্ত্বের মৌলিকত্ব ও সম্যক সম্প্রকাশিত চরম ও পরম পরাৎপরতত্ত্বের সন্ধান পাইবেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । শ্রীকৃষ্ণলীলার গূঢ় তাৎপর্য্য-সিদ্ধান্ত অবগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও তদীয় ভজন তাৎপর্য্যের রহস্য অবগত হইয়া কৃষ্ণভজনে দৃঢ়নিষ্ঠায়ুক্ত হইয়া ভজনোন্নতি লাভ করিতে পারিবেন । অযোগ্যতা নিবন্ধন দোষ ক্রটি অবশ্যই মার্জ্জনীয় । অজ্ঞ, মূর্থ, নীচ, পতিত হইলেও যাঁহাদের কুপাদেশ ও শক্তি সম্বল করিয়া এই ছুরুহ ব্যাপার সমাধানে ব্রতী হইয়াছি তাঁহাদের কুপা শক্তিই আমার চালক ও পালক হইয়া নিত্যকাল রক্ষা করুণ ইহাই, বিনীত নিবেদন ।

ভগবদ্দাসানুদাস অকিঞ্চন

শ্রীভক্তিবিলাস ভারতী ।

প্রকাশিত বিষয়ের নির্দেশ

প্রথম ক্রম—১—২৬ । ফোটেটের প্রভাববিস্তার ক্ষেত্র, শব্দ, ফোটেট শব্দের অর্থ, বিভিন্ন দার্শনিকের ফোটেটের বিচার, শ্রীমদ্ভাগবতে ফোটেটের বিচার ১—৮ । 'আন্তর ও বহিঃ ফোটেট, শ্রীজীবগোস্বামীর বিচার, বিদ্বৎ তাৎপর্য্য, ত্রিবিধ রুটি । শ্রৌতপন্থা ও ফোটেটের কদর্থ, গোড়ীয়াচার্য্য ও মহাপ্রভুর ফোটেটের বিচার ৮—১৮ । কস্ম ও লীলা প্রবেশ, গোড়ীয়া-দর্শনে সর্ব্ব-সম্বয়, শ্রবণানুগ্রহে দর্শন, ১৮—২৬ । দ্বিতীয় ক্রম ২৬—

৩৮। অনুগতি ২৬—৩০। ফোটে'র স্বাংশে প্রকাশ, দশাবতারে
 ফোটে'র রস প্রকাশ ৩০—৩৮। তৃতীয় ক্রম—৩৮—৪৩।
 (ঐ পরাবস্তুস্বরূপে প্রকাশ) শ্রীনৃসিংহ, শ্রীরামচন্দ্র,
 শ্রীবলদেব ৩৮—৪৩। চতুর্থ ক্রম—৪৩—৯৩। ব্রজলীলা,
 শ্রীকৃষ্ণ, রাসলীলা, মাথুর লীলা, দ্বারকা-লীলা ৪৩—৭০।
 শ্রীকৃষ্ণাপ্তি ৭০—৭৩। সমাধিদৃষ্ট স্বরূপ-সৌন্দর্য্য ৭৩—৮০।
 ব্রজভাবগত কৃষ্ণভক্তদিগের প্রতি ফোটে'র প্রক্রিয়া
 ৮০—৮৬। ভক্তের প্রতি ফোটে'র প্রক্রিয়া ৮৭—৯৩।
 ফোটে'র শব্দপ্রকাশশক্তি ৯৩—৯৫। পঞ্চম ক্রম—৯৫
 —১১২। শ্রীচৈতন্যদেব ও ফোটে'বাদ ৯৫—১১২। ষষ্ঠ
 ক্রম—১১২—১৩১। ফোটে'র আনন্দময়ত্ব ১১২—১১৯।
 ফোটে'র প্রকাশ তারতম্য, সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন ১১৯—
 ১৩১। সপ্তম ক্রম—১৩১—১৩৮। ফোটে'র প্রকাশ তারতম্য
 ১৩১—১৩৮। অষ্টম ক্রম—১৩৮—১৬৬। ফোটে' শব্দ বিজ্ঞান
 —১৩৮—১৪৪। সমস্ত শব্দ—হরি—১৪৪—১৪৮। ফোটে'র
 কৃপায় চেতন-ধর্ম্মের পূর্ণ অভিব্যক্তি—১৪৮—১৫৩। ফোটে'র
 বলদেবত্ব ১৫৩—১৬২। ফোটে'র অপ্ৰাকৃতত্ব—১৬২—১৬৬।
 নবম ক্রম—নামভজন—১৬৬—১৮২। নামাভাস—১৬৮
 ১৭১। অপ্ৰাকৃত নামের বিচার ১৭১—১৭৬। ফোটে'র
 অপ্ৰাকৃতত্ব ১৭৭—১৮২। দশম ক্রম—১৮৩—২১৩। শিক্ষাষ্টক
 ব্যাখ্যা—১৮৩—১৮৬। চিত্তদর্পণ মার্জ্জন ১৮৬—১৮৮। ভব-
 মহাদাবগ্নি নির্বাপণ—১৮৮—১৮৯। শ্রেয়ঃকুমুদবিকাশচন্দ্রিকা
 বিতরণ—১৮৯—১৯০। বিদ্যাবধুর জীবন—১৯০—১৯৩।

আনন্দাম্বুধিবর্ধন—১৯৩—১৯৪। প্রতিপদে পূর্ণায়ুতাস্বাদন—১৯৪—১৯৫। সর্বাঙ্গস্বপন ১৯৫—১৯৬। শিক্ষাষ্টকের দ্বিতীয় শ্লোক ১৯৬—১৯৭। রস-বিজ্ঞান—১৯৮—২০৩। তৃণাদপি সুনীচ—২০৩—২০৩। চতুর্থশ্লোক ও পঞ্চম শ্লোক—২০৫—২১০। ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম শ্লোক, ও নাম ভজনকারীর অধিকার—২১০—২১৩। একাদশ ক্রম। ফোন্টের সঙ্গীত প্রকাশ—২১৩—২৪৮। সঙ্গীত ২১৪—২১৫। নাদ—২১৫—২১৭। স্বর, মূর্ছনা, বর্ণ, বাদী, রাগ, রাগিনী, আলাপ—২১৭—২৩১। তাল—২৩১—২৩৪। গীত—২৩৪—২৩৮। বাদ্য—২৩৮—২৪০। নর্তন—২৪০—২৪৮।

মুদ্রণ ভ্রম নিদর্শন—

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	১৬	পরব্যোমাতীর্ণ	পরব্যোমাবতীর্ণ
১০	৪	অসম্ভব	অসম্ভব
২৬	৯	কুপাদশীর্বাদ	কুপাশীর্বাদ
৪১	১৭	ধেনুকাসুর	ধেনুকাসুর
৫৫	১২	সদাসুর	মদাসুর
৫৫	১৮	সম্বুদ্ধি	সম্বুদ্ধি
৬৩	৯	বিভূত	বিভূতি
৬৩	২০	সাম্বন্ধিকী	সাম্বন্ধিকী
৭৫	১৯	স্বল্প	স্বল্প
৮৩	১২	বিষয়	বিষয়ী

৯৪	১১	মিনিত্ত	নিমিত্ত
৯৯	১	দ্বারকালীলা	শ্রীচৈতন্যদেব ও ফোটাবাদ
৯৯	৬	সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত
১০৯	১৩	এবং	এবং
১১০	৮	পৃথিবীতে	পৃথিবীতে
১১১	৯	সুকঠিন	সুকঠিন
১১২	১৬	চতুর্থক্রম	ষষ্ঠক্রম
১১২	২২	আত্মত্বের	আত্মত্বের
১১৩	”	যেহেতু	যেহেতু
১৩৭	১	কৃষ্ণবর্ণ	কৃষ্ণবর্ণ
১৫১	২০	গোপলননা	গোপলননা
১৬৫	৮	আরণ্যকে	আবরণ্যকে
১৬৮	২৩	গ্রহণের	গ্রহণে
১৭০	৮	সমতা	সমতা
১৭২	১	নাই	পাই
১৭৩	১৪	শ্রীকৃষ্ণমাদিনান	শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন
১৭৫	১৩	Onthropo	Anthropo
১৭৬	৯	সৃষ্টি	সৃষ্টি
১৮৩	১	অষ্টম	দশম
২১৩	২০	দশম ক্রম	একাদশ ক্রম
২১৮	৬	নামিকা	নাসিকা
২৩৪	২০	সক	সকল

॥ श्रीश्रीगुरुगोराम्भोजो जयतः ॥

स्फोटवाद-विचार

प्रथम क्रम

श्रीगुरुचरणान वन्दे यत्पादाश्रयवीर्यतः ।
संगृह्यात्याकरत्रातादङ्गः सिद्धान्तसम्पन्नीन् ॥
अगत्येकगतिं नत्वा हीनार्थाधिकसाधकम् ।
श्रीचैतन्यं लिखतेऽस्य स्फोटवाद विनिर्णयः ।
यदि तव থাকे मन पঙ্গु नाचाइते ।
शक्ति सङ्घारिते पद धरह शिरेते ।

श्रीगौड़ीय-दार्शनिकगण श्रीगुरुदेव ও শ্রীকৃষ্ণে নিত্য-অভিন্ন-
বুদ্ধিতে শ্রীগুরুদেবে পরভক্তিযুক্ত । এই পরভক্তি-বৃত্তি যাঁহাতে
পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান, তাঁহারই হৃদয়ে পূর্ণ স্ফোটশক্তি সম্পূর্ণ-
ভাবে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে । হরিসেবারহিত চেষ্টা,
কৰ্ম, জ্ঞান, যোগ, তপস্বাদির আবরণ-আবর্জনার কর্ণ-মলে
কর্ণপুট অবরুদ্ধ থাকিলে তাহাতে স্ফোটশক্তি সঙ্ঘারিত
হইতে পারে না । সেবোন্মুখ কর্ণে প্রবিষ্টমান পরব্যোমাতীর্ণ
নিত্য-শক্তিসমন্বিত অর্থ-প্রতীতি-সমুৎপাদক শব্দ 'স্ফোট'-পদ
বাচ্য । অমাদি-দোষ-চতুষ্টয়যুক্ত বিষয় দর্শন-দোষে দুষ্ট
জ্ঞানের পরিবর্তে দোষাতীত আনন্ড-পন্থীর কর্ণদ্বারে স্ফোটের
বিচার প্রবেশিত হয় ।

শব্দ :—শব্দ দুই প্রকার—নিত্য ও অনিত্য । মহর্ষি

পাণিনি প্রভৃতি বৈয়াকরণগণ ফোন্টাত্মকরূপে শব্দের নিত্যত্ব এবং বর্ণাত্মকরূপে শব্দের অনিত্যত্ব বিচার করেন। পতঞ্জলীর মতও—পাণিনির অনুরূপ। পাণিনি ফোন্টকে জগন্নিদান-স্বরূপ নিরবয়ব শব্দই সাক্ষাদ ব্রহ্ম বলিয়াছেন—“জগন্নিদানং ফোন্টাত্মো নিরবয়বো নিত্যঃ শব্দো ব্রহ্মৈবেতি।” ব্রহ্মকাণ্ডে—“অনাদিনিধনং ব্রহ্ম শব্দতত্ত্বং যদক্ষরম্। নিবর্ত্ততেহর্থভাবেন প্রক্রিয়া জগতো যতঃ ॥” শ্রীহরি স্বয়ং ব্রহ্মকাণ্ডে বলিয়াছেন—শব্দতত্ত্ব অনাদিনিধন ও অক্ষয় ব্রহ্মস্বরূপ। ইহা হইতেই জগতের প্রক্রিয়া হইয়া থাকে। জিজ্ঞাস্য হইতে পারে—অর্থ-প্রত্যয় সমুৎপাদন করে কে? ব্যস্ত (বিভক্ত বা পৃথক্কৃত) বর্ণ অথবা সমস্ত (সমুদায়) বর্ণ? মহর্ষি পাণিনি, বলেন,—ব্যস্তবর্ণ অথবা সমস্তবর্ণ কোনটাই অর্থ-প্রতীতি-উৎপাদনে সমর্থ নহে। কেন না, ব্যস্ত (পৃথক্কৃত) বর্ণ হইতে অর্থ-প্রত্যয় সম্ভবপরই হইতে পারে না। যেমন ‘ভক্ষণ’—এস্থানে ‘ভ’, ‘ক’, ‘ষ’ ও ‘ণ’ দ্বারা পৃথগ্‌রূপে ভক্ষণ-ক্রিয়া-বিষয়ক কিছুমাত্র অর্থ-প্রতীতি হয় না। আর বর্ণসকল যখন ক্ষণিক, তখন তাহাদের সমূহও অসম্ভব; ‘ভ’, ‘ক’, ‘ষ’ এবং ‘ণ’—এই বর্ণ-চতুষ্টয়ের নাদ একটীর পর আর একটী লয় প্রাপ্ত হইয়া যাওয়ায় উহাদের চারিটীর একত্র অবস্থান হইয়া কমল-পত্র-শতবেধণায়-বিচারে অর্থবোধ-জন্মান অসম্ভব। আবার ব্যাস ও সমাস উভয়ের দ্বারা অণু প্রকারও সাধিত হইতে পারে না। একারণে বর্ণসকলের ফোন্টবিচ্ছিন্ন স্বতঃসিদ্ধ-বাচকত্ব অনুপপন্ন হয়। সুতরাং যাহার বলে অর্থ-প্রতীতি

সমুৎপন্ন হয়, তাহাকেই 'ফোন্ট' বলে,—তস্মাদ্বর্ণানাং বাচকত্বানু-
পপত্তো। যদ্বলার্থপ্রতিপত্তিঃ স ফোন্ট ইতি বর্ণাতিরিক্তো
বর্ণাভিব্যঙ্গোহর্থপ্রত্যায়কো নিত্যঃ শব্দঃ ফোন্ট ইতি তদ্বিদো
বদন্তি। অতএব স্ফুট্যাতে ব্যঞ্জ্যাতে বর্ণৈরিত্তি ফোন্টো বর্ণাভিব্যঙ্গঃ
স্ফুটীভবতাস্মাদর্থ ইতি ফোন্টোহর্থ প্রত্যায়ক ইতি ফোন্টশব্দার্থ-
মুভয়থা নিরাহুঃ ॥ অর্থাৎ বর্ণসকলের বাচকত্ব অনুপপন্ন
হওয়ায় যাহার বলে অর্থ-প্রতীতি সমুৎপাদিত হয়, তাহাকেই
'ফোন্ট' বলে। তদ্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, বর্ণাতিরিক্ত
বর্ণাভিব্যঙ্গ অর্থ-প্রত্যয়-সমুদ্ভাবক নিত্যশব্দই 'ফোন্ট'-পদবাচ্য।
বর্ণাভিব্যঙ্গ—'বর্ণের দ্বারা অভিব্যঙ্গ অর্থাৎ 'অভি' সর্বতোভাবে
ব্যক্ত বা স্ফুটিত হয় বলিয়া ইহার নাম 'ফোন্ট'। আর ইহা
হইতে অর্থ স্ফুটিত হয় বলিয়া ইহাকে অর্থ-প্রত্যয়-সমুদ্ভাবক
'ফোন্ট' বলা হয়। এইরূপে উভয় প্রকারে ফোন্ট-শব্দার্থ
নিরুক্ত হইয়াছে।

পতঞ্জলি, কৈয়ট প্রভৃতিও ফোন্টের বিচার প্রদর্শন
করিয়াছেন। মীমাংসা-শ্লোকবাত্তিকের ভট্টাচার্য্যগণও ফোন্ট-
বাদের আলোচনা করিয়াছেন। সর্বদর্শন-সংগ্রহকার
ফোন্টবাদের যে আলোচনা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে
সংক্ষেপে এই বলা যাইতে পারে যে, পাণিনিপ্রমুখ বৈয়াকরণ-
ফোন্টবাদিগণ বলিতেছেন, ফোন্ট না থাকিলে কেবল বর্ণাঙ্ক
শব্দের দ্বারা অর্থ বোধ হইত না। যেমন 'অ', 'গ', 'ন' ও 'ই'—
এই চারিটী বর্ণস্বরূপ যে 'অগ্নি' শব্দ, তদ্বারা বহির বোধ হয় ;
কিন্তু ঐ বোধ কেবল চারিটী বর্ণের দ্বারা সম্পাদিত হইতে

পারে না। যদি এই চারিটি বর্ণের প্রত্যেক বর্ণের দ্বারাই বহির বোধ হইত, তাহা হইলে কেবল অকার কিম্বা গকার উচ্চারণ করিলেও বহির বোধ হয় না কেন? যদি কেহ বলেন, ঐ চারিটি বর্ণ পৃথক্ পৃথক্ উচ্চারিত হইলে তাহা বহিবোধক না হইলেও ঐ চারিটি বর্ণ একত্রিত হইয়া বহির বোধ জন্মাইয়া দেয়। এখানে ফোন্টবাদিগণ বলেন যে, এরূপ যুক্তি একটা বাল-কোলাহল মাত্র; কেন না, বর্ণসকল আশু-বিনাশী। পর পর বর্ণের উৎপত্তিকালে পূর্ব পূর্ব বর্ণসকল বিনষ্ট হইয়া যায়; কাজেই অর্থবোধের কথা দূরে থাকুক, তাহাদের একত্র অবস্থানই সম্ভবপর হয় না। অতএব ঐ চারিটি বর্ণের দ্বারা প্রথমতঃ ফোন্টের অভিব্যক্তি অর্থাৎ স্কুটতা জন্মে, পরে স্কুট ফোন্ট দ্বারা বহির বোধ হয়। এস্থানে কেহ কেহ পূর্বোক্ত রীতিক্রমে পূর্বপক্ষ করিয়া থাকেন, প্রত্যেক বর্ণের দ্বারা ফোন্টের অভিব্যক্তি স্বীকার করিতে হইলে পূর্বোক্ত প্রত্যেক বর্ণের দ্বারা অর্থবোধস্থলীয় দোষ ঘটে। আর সমুদয় বর্ণের দ্বারা ফোন্টের অভিব্যক্তি স্বীকার করিলে সেই দোষই উপপন্ন হয়। কাজেই উভয়পক্ষেই যখন এরূপ দোষ জাগরুক রহিয়াছে, তখন ফোন্টবাদ-আবাহনের আবশ্যক কি?

ফোন্টবাদিগণ এই পূর্বপক্ষের উত্তরে বলেন, যেমন একবারমাত্র পাঠের দ্বারাই স্বাধ্যায় অবধারিত হয় না, কিন্তু বারংবার আলোচনা বা অভ্যাসের দ্বারাই পাঠ্যগ্রন্থের তাৎপর্য্য দৃঢ়রূপে অবধারিত হয়, তেমনি প্রথমবর্ণ ‘অ’ কার দ্বারা ফোন্টের কিঞ্চিন্মাত্র স্কুটতা জন্মাইলেও পরে দ্বিতীয়, তৃতীয়

প্রভৃতি বর্ণের দ্বারা ক্রমশঃ স্ফুটতর ও স্ফুটতম হইয়া ফোট বহির বোধক হয়। কিঞ্চিন্মাত্র স্ফুট হইলেই যে ফোট অর্থ বোধক হইবে, এরূপ নহে। যেমন, রত্নতত্ত্ব প্রথম প্রতীতিতে স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় না, কিন্তু চরমে চিত্তে যথাবৎ অভিব্যক্ত হয়, তেমনি প্রথমে নাদ দ্বারা বীজ আহিত হয়, পরেঃ অন্ত্য-ধ্বনির সঙ্গে আবৃত্তির পরিপাক হইলে বুদ্ধিতে শব্দ অবধারিত হইয়া থাকে।

পতঞ্জলী বলেন,—শব্দার্থপ্রত্যয়ানামিতরেতরাধ্যাসাৎ সঙ্করস্তৎপ্রবিভাগসংযমাৎ সৰ্ব্বভূতরুতজ্ঞানম্ ॥ (পাতঞ্জল সূত্র ৩য় অঃ ১৭ সূত্র)।

ভাষ্যতাৎপর্য—বর্ণসমূহ এককালে উৎপত্তিশীল না হওয়ায় অর্থ-প্রতিপাদনে পরস্পর পরস্পরের সহায়ক হইতে পারে না। তাহারা পদকে স্পর্শ না করিয়া, তাহাকে প্রকাশিত না করিয়াই (অর্থাৎ তাহার প্রকাশের পূর্বেই) আবির্ভূত ও তিরোহিত হইয়া থাকে, অতএব তাহারা প্রত্যেকে পদ-স্বরূপে গণ্য হয় না। পরন্তু তাহারা প্রত্যেকেই পদাত্মক এবং যাবতীয় অর্থপ্রকাশক শক্তিবিশিষ্ট বলিয়া সহকারী অন্যান্য বর্ণ-সমূহের সহিত বিভিন্নক্রমে সংযুক্ত ও বিভিন্ন রূপ প্রাপ্ত হইয়া বিভিন্নার্থ-প্রতিপাদক হইলেও পূর্ববর্ণ পরবর্তী বর্ণের দ্বারা এবং পরবর্তী বর্ণ পূর্ববর্তী বর্ণ দ্বারা কোন নিয়তরূপে নিয়তার্থ-বিশেষেই স্থাপিত রহিয়াছে। এইরূপে ক্রমানুরোধে মিলিত বহুবর্ণ কোন বিশেষ-অর্থের সূচকরূপেই নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। যেমন ‘গ’ কার, ‘ঙ’ কার এবং বিসর্গ বর্ণ প্রত্যেকে

সর্বার্থপ্রকাশ-শক্তিসম্পন্ন হইয়াই কোন নির্দিষ্ট-ক্রমে সজ্জিত হইয়া ‘গৌঃ’ ইত্যাকার পদরূপে সান্নাদিবিশিষ্ট (গল-কম্বলাদিক্রম) প্রাণিবিশেষেরই প্রকাশক হইয়া থাকে । অতএব ঐ বর্ণসকলের উচ্চারণের পর (বিনাশ হইলেও) অর্থ-প্রকাশকরূপে নিয়ত ঐ বর্ণসকলের উচ্চারণ-ক্রমসমূহ স্মৃতিবলে একত্র সংগৃহীত হইলে যে একটা বুদ্ধির প্রকাশ পায়, উহাই ‘পদ’ (ফোন্ট) নামে অভিহিত এবং উহাই বাচ্যবস্তুর বাচকরূপে নিয়ত হইয়া থাকে ।

ফোন্টবিচারে জৈমিনী ঃ—জৈমিনী শব্দের নিত্যত্ব-স্থাপনের যুক্তি প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছেন ;—“নিত্যস্ত স্মাদর্শনস্ত পরার্থত্বাৎ ।” (১।১।১৮) । শব্দের কেন নিত্যত্ব স্বীকৃত হইবে ? জৈমিনী তাহার কারণ নির্দেশ করিতেছেন— শব্দকে ‘নিত্য’ বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে ; কেন না, উচ্চারণের দ্বারা পূর্বাভাগত শব্দই পরের বোধ জন্মাইবার হেতুস্বরূপ হয় । শব্দ ত’ পূর্ব হইতেই আছে । শব্দ পূর্বাভাগি বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া কোন একটা বিশেষ অর্থের সঙ্গে সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া রহিয়াছে । বক্তার বুদ্ধিতে প্রথমে তাহা দৃষ্ট হইলে তদ্ব্যঞ্জক ধ্বনি বক্তার দ্বারা উচ্চারিত হয় । পরে শ্রোতাও সেই ধ্বনি দ্বারা প্রবুদ্ধ হইয়া সেই ফোন্ট হইতে শব্দের অর্থ বোধ করেন । কাজেই ‘ফোন্ট’-শব্দটী ধ্বনি হইতে ব্যতিরিক্ত । উদাহরণ-স্বরূপে বলা যাইতে পারে,— আলোক ও দৃষ্টিশক্তিসাহায্যে একটা বস্তু এখন আমার দর্শনের বিষয় হইয়াছে বলিয়া সেই বস্তুটীকে তৎকালেই যেমন

আলোকের দ্বারা উৎপন্ন বস্তু বলা যাইবে না, তেমনি শব্দও উচ্চারণ-ক্রিয়াসাহায্যে এখন বুদ্ধিতে আকৃষ্ট হইল বলিয়া শব্দকে উচ্চারণোৎপন্ন ধ্বনি বলা যাইবে না; উহা ধ্বনি-নিরপেক্ষ একটা সদ্বস্তু, কাজেই শব্দ—নিত্য।

সাংখ্যের বিচার :-সাংখ্য বৈয়াকরণগণের স্ফোটবাদ নিরাস করিয়াছেন;—“প্রতীত্যপ্রতীতিভ্যাং ন স্ফোটাভুক্তঃ শব্দঃ ॥” (৫।৩৭)। অর্থাৎ বর্ণসমূহ উচ্চারণের পর তৃতীয় ক্ষণেই বিনাশশীল বলিয়া তাহাদের মিলিতভাবে শব্দরূপে কোন অর্থ-প্রতিপাদনের সামর্থ্য না থাকায় পতঞ্জলি প্রভৃতি শাস্ত্র-কারগণ শব্দকে বর্ণাভুক্তরূপে স্বীকার করেন না। পরন্তু ঐ বর্ণসমূহের উচ্চারণ-প্রকাশিত ‘স্ফোট’ নামক কোন অতিরিক্ত পদার্থ ই—শব্দের স্বরূপ এবং উহাকেই তাঁহারা অর্থপ্রতিপাদক-রূপে কল্পনা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের উক্ত মত-খণ্ডনের জন্ত সাংখ্যকার এই সূত্রে বলিতেছেন যে,—তোমরা অর্থের প্রতীতি জনকরূপে যে স্ফোট পদার্থের স্বীকার করিতেছ, উহা স্বয়ং প্রতীত হয় কি না? যদি বল প্রতীত হয়, তাহা হইলে যে সকল বর্ণের উচ্চারণ হইতে তাহার প্রতীতি হয়, সেইসকল বর্ণের উচ্চারণ হইতে অর্থের প্রতীতিও জন্মিতে পারে, মধ্যবর্তী ‘স্ফোট’ নামক অতিরিক্ত পদার্থের কল্পনা আবশ্যিক হয় না। পক্ষান্তরে, যদি বল, স্ফোট-পদার্থ স্বয়ং প্রতীত না হইয়াই অর্থের প্রতীতিজনক হয়, তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, কোন বস্তু স্বয়ং অপ্রতীত হইয়া অপরের প্রতীতি-জননে সমর্থ হয়

না। অতএব প্রতীতি এবং অপ্রতীতি—উভয়কল্প-বিচারেই ফোঁটের সাধন অসম্ভবপর বলিয়া শব্দ ফোঁটাত্মক নহে।

আন্তরক্ষোঁট ও বহিঃক্ষোঁট :—কোন কোন আচার্য্য আন্তর-ক্ষোঁটও বহিঃক্ষোঁট বিচার করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন,—

“ততোহভূত্রিবৃদোক্কারো যোহব্যক্তপ্রভবঃ স্বরাট্ ।

যত্তল্লিঙ্গং ভগবতো ব্রহ্মণঃ পরমাশ্রনঃ ॥”

অর্থাৎ অনন্তর সেই নাদ হইতে অব্যক্তপ্রভব স্বতঃ স্বদয়ে প্রকাশমান ত্রিমাত্র অর্থাৎ কণ্ঠ-ওষ্ঠাদি দ্বারা উচ্চার্য্যমান অথবা ‘ত্রিবৃৎ’ শব্দে ‘অ’কার, ‘উ’ কার ও ‘ম’ কারাত্মক ওঁ-কার উৎপন্ন হইল। এই ওঁকার—পরব্রহ্ম, পরমাশ্রা, ভগবানের বোধদ্বার অবয়বস্বরূপ।

শ্রীমদ্ভাগবতের এই প্রমাণানুসারে প্রণবাত্মক বর্ণ-সমূহের নিত্যত্ব প্রমাণিত হইতেছে। আকাশের নিত্যদ্রব্যত্বহেতু তদগুণস্বরূপ শব্দের ও নিত্যত্ব যুক্তিসিদ্ধ। বায়ুর প্রেরণ ও অপ্ৰেরণ-বশতঃই যখন শব্দের অভিব্যক্তি ও অনভিব্যক্তি হইয়া থাকে, তখন শব্দ—নিত্য পদার্থ। অন্তঃকরণে উপলভ্যমান এই নিত্যবর্ণই আন্তরক্ষোঁট। শব্দার্থ যদি অন্তরে উপলভ্যমান হয়, তাহা হইলে তাহা আন্তর-ক্ষোঁটবাচ্য। সেখানে যে শব্দক্ষোঁট, তাহাই শব্দব্রহ্ম। এই আন্তর-ক্ষোঁট—নিরংশ, বর্ণের সহিত অভিন্ন নিত্যজ্ঞানস্বরূপ ও শব্দার্থময়। এই মতে প্রণব হইতেই নিখিল বেদের আবির্ভাব। অন্তরে উপলভ্যমানত্ব হেতু সেই প্রণব আন্তরক্ষোঁট অর্থাৎ অব্যক্ত।

উদাহরণস্বরূপ ইহারা বলেন,—“জাতাক্ষমুকবধিরস্তান্তঃস্বীয়-
পরামুশি। স্ববাক্শব্দার্থবোধো আন্তরক্ষোটি এব সং ॥”
অর্থাৎ যাহারা জন্মাবধি অক্ষ, মুক বা বধির, তাহাদের চক্ষু
প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের অভাব থাকার দরুণ অন্তঃকরণে স্বতঃই
শব্দার্থের পরামর্শ ঘটে এবং তাহাদের বাক্য ও শব্দার্থের
বোধও জন্মিয়া থাকে, ইহাই আন্তরক্ষোটি।

বৈয়াকরণগণ শব্দবোধের প্রতি বহিঃক্ষোটিকেই কারণরূপে
নির্দেশ করেন। তাঁহাদিগের বিচারে পূর্ব পূর্ব বর্ণোচ্চারণে
যে সংস্কার অভিব্যক্ত হয়, তত্তৎ সংস্কার-সহকৃত যে চরম বর্ণ-
সংস্কার, সেই সংস্কারনিষ্ঠ পদজন্তু একপদার্থ-বোধজনকতাই
‘পদক্ষোটি’। এইরূপ পূর্ব পূর্ব পদের উচ্চারণে যে সংস্কার
অভিব্যক্ত হয়, তত্তৎ সংস্কার-সহকৃত আবার যে চরম পদ-
সংস্কার, তৎসংস্কারনিষ্ঠ-বাক্য জন্তু একবাক্য-বোধকতাই
বাক্যক্ষোটি। অদ্বিতীয় নিত্য, পদাভিব্যঙ্গ্য, বাক্যাভিব্যঙ্গ্য,
অখণ্ড এবং তাদৃশ অনেক পদঘটিত মহাবাক্যক্ষোটিই—
‘জাতিক্ষোটি’-পদবাচ্য। এই ব্যক্তিক্ষোটির সহিত জাতি-
ক্ষোটিই মহাবাক্য জন্তু শব্দবোধের কারণ। ইহাই বৈয়াকরণ-
গণের মত। তাঁহারা বলেন, পদব্যুৎপাদন-সময়ে ক্ষোটিদ্বারাই
শব্দ-বোধ হইয়া থাকে। এতদ্বিষয়ে প্রত্যক্ষ ও অর্থাপত্তি,
উভয় প্রমাণের সম্ভাবনা আছে। যেমন ‘গোঃ’ উচ্চারণ করিলে
‘গ’ কার, ‘ওঁ’ কার ও বিসর্গ প্রতীত হয় না, গলকম্বলাদি-
বিশিষ্ট কোন পদার্থই প্রতীত হইয়া থাকে, ইহাই প্রত্যক্ষ।
আর ‘গো’ কারাদি বর্ণসমূহ ব্যস্তভাবে ও সমস্তভাবে অর্থবোধ-

জনক হয় না, ইহার কারণও পূর্বে বলা হইয়াছে অর্থাৎ বৈয়াকরণগণ বলেন, একটা বর্ণ দ্বারাই অর্থ-প্রতীতি হইলে অপরাপর বর্ণোচ্চারণের ব্যর্থতা হয়। আর বর্ণ যখন উৎপন্ন হইয়াই বিনষ্ট হয়, তখন বর্ণসমূহেরও সমস্তজ্ঞান অসম্ভব। এইরূপে ফোটেই অর্থাপত্তি প্রমাণসিদ্ধ।

“পৃথগ্‌সম্বন্ধানাং সংস্কারাণাং ক্রমেণ পরস্পরসম্বন্ধকারিত্বং ফোটেত্বম্।” অর্থাৎ আনুপূর্বীরহিত সংস্কার-সমূহের প্রত্যেক বর্ণের উচ্চারণের ক্রমানুসার পরস্পর আনুপূর্বীরূপ সম্বন্ধবিশিষ্ট চরমবর্ণের জ্ঞানে শব্দ-বোধের জনকতাই ফোটেত্ব। এইরূপ ফোটে স্বীকার না করিয়া তত্তদ্বর্ণজ্ঞানের জ্ঞাত শব্দবোধ-স্বীকারে ‘রস’ স্থানে ‘সর’ বা ‘নদী’ স্থানে ‘দীন’ এইরূপ প্রতি-লোম-পাঠেও রেফ-স-কারাদি বর্ণ-জ্ঞাত সংস্কারের বিঘ্নমানতা-হেতু ‘সর’ ও ‘নদী’ বস্তুদ্বয়ের শব্দ বোধ হইতে পারে। অনু-লোম-(অনুকুল, সোজা) সংস্কারবশে যাদৃশার্থবিশিষ্ট পদ ব্যুৎপাদিত হইবে, প্রতি-লোমোচ্চারিত সে-সকল বর্ণ কখনই তাদৃশ পদের ব্যুৎপাদক হইতে পারে না। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে অনুলোম ও প্রতিলোম-পদের কোন ভেদই থাকে না।

শ্রীল-শ্রীজীব গোস্বামীঃ—গৌড়ীয়-দার্শনিকগুরু সর্ব-সম্বাদিনীকার শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ সাধারণ ফোটেবাদ নিরাস করিয়া বর্ণরূপ ‘বেদ’-শব্দের নিত্যত্ব ও অর্থপ্রত্যায়কত্ব স্থাপন করিয়াছেন,—তদেব সর্বম্বিন্নপি বেদাত্মকে সর্বস্বার্থং

প্রতিপ্রামাণ্য—মুপলক্ষে স কথমর্থং প্রসূত ইতি বিব্রিয়তে ;
 —তত্র বর্ণানামাশুবিনাশিত্বান্নার্থং জানয়িতুং শক্তিঃ সম্ভবতি ।
 ততশ্চপূর্ব - পূর্বাক্ষর-জন্ত-সংস্কারবদন্ত্যাক্ষরশ্চেবার্থপ্রত্যায়কত্বং
 মন্বন্তে । তে চ সংস্কারাঃ কার্য্য-মাত্রপ্রত্যায়িতাঃ অপ্রত্য-
 ক্ষত্বাং, সংস্কার-কার্য্যস্য স্মরণস্য ক্রমবর্ত্তিত্বাং সমুদায়প্রত্যায়া-
 ভাবান্নান্ত্যবর্ণস্থাপ্যার্থপ্রত্যায়কত্বমিত্যভিপ্রেত্যাপরে তু ফোটিমেব
 তৎপ্রত্যায়কমাত্ত্বঃ—“স চ বর্ণানামনেকত্বেনেকপ্রত্যয়ানুপপত্তে-
 রেকৈক-বর্ণ প্রত্যায়াহিতসংস্কার-বীজেহন্ত্যবর্ণ-প্রত্যয়জনিত-
 পরিপাকে প্রত্যয়িনি একপ্রত্যয়বিষয়তয়া ঋটিতি প্রত্যব-
 ভাসতে ।” (ব্রহ্মসূত্র ১।৩।২৮ সূত্রীয় শঙ্করভাষ্যে)

অতএব ফোটিরূপত্বাচ্ছেদস্য নিত্যত্বং তস্য প্রত্যচ্চারণং
 প্রত্যভিজ্জায়মানত্বাৎ । বেদান্তিনস্ত “বর্ণা এব তু শব্দ ইতি
 ভগবানুপবর্ষ” ইত্যেতৎ ত্রায়মনুসৃত্য ‘দ্বির্গো’ শব্দোহয়মুচ্চারিতঃ,
 —ন তু দ্বৌ গৌশব্দাবিত্যেকতৈব সর্বৈবঃ প্রত্যভিজ্জায়মানত্বাৎ
 বর্ণাশুকানমেব শব্দানাং নিত্যত্বমঙ্গীকৃত্য তে চ বর্ণাঃ পিপীলিকা-
 পংক্তিবৎ ক্রমাদনুগৃহীতার্থবিশেষসংবন্ধাঃ সমস্তঃ স্বব্যবহারেহ-
 প্যেকৈক-বর্ণগ্রহণান্তরং সমস্ত-বর্ণ-প্রত্যয়দর্শিত্বাৎ বুদ্ধৌ তাদৃশ-
 মেব প্রত্যবভাসমানাস্তং তমর্থমব্যভিচারেণ প্রত্যায়য়িস্ত-
 ত্তীত্যতে বর্ণবাদিনাং লঘীয়সী কল্পনা স্মাৎ ; ফোটিবাদিনাং তু
 দৃষ্টহানিরদৃষ্টকল্পনা চ ; তথা বর্ণাশেচমে ক্রমেণ গৃহমাণাঃ
 ফোটিং ব্যঞ্জয়ন্তি, স ফোটিোর্হর্থং ব্যনন্তীতি গরীয়সী কল্পনা
 স্যাদिति মন্বন্তে । তদেবং বর্ণরূপাণামেব বেদশব্দানাং নিত্যত্ব-
 মর্থপ্রত্যায়কত্বং চাঙ্গীকৃতম্ ।”

এইরূপে বেদাত্মক যাবতীয় শব্দই সমস্ত স্বার্থ-বিষয়ে প্রামাণ্য লাভ করায় ঐ শব্দ কিরূপে অর্থপ্রকাশক হয়, তাহা বিবৃত হইতেছে। প্রথমতঃ, আপত্তি এই যে, বর্ণসমূহ শীঘ্র বিনাশশীল অর্থাৎ তৃতীয়ক্ষণবিধ্বংসী বলিয়া অর্থ-প্রতিপাদনে তাহাদের শক্তি সম্ভবপর হয় না। অতএব কেহ কেহ শব্দস্থিত পূর্ব পূর্ব অক্ষরসমূহের উচ্চারণজনিত সংস্কারের সহিত সংযুক্ত অন্ত্য অক্ষরই অর্থ প্রকাশক হয় বলিয়া মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। সেই সেই পূর্ব পূর্ব বর্ণের উচ্চারণজনিত সংস্কার অপ্রত্যক্ষ পদার্থ বলিয়া কেবলমাত্র অর্থপ্রকাশরূপ কার্য্যদ্বারাই প্রতীতির বিষয়ীভূত হইয়া থাকে। অপর কেহ কেহ বলেন, —পূর্ব পূর্ব বর্ণ যেরূপ ক্রমশঃ উচ্চারিত হয়, সেইরূপ তাহাদের উচ্চারণজনিত সংস্কারের কার্য্যস্বরূপ স্মরণও ক্রমশঃই হয়, পরন্তু এককালে হয় না। অতএব এককালে সমুদয়ের প্রতীতি না হওয়ায় তৎসহকৃত অন্ত্যবর্ণও অর্থপ্রতীতিজনক হইতে পারে না। এই অভিপ্রায়ে তাঁহারা ‘ফোন্ট’ নামক পদার্থ-বিশেষকেই অর্থপ্রতীতিজনকরূপে বলিয়া থাকেন।

“বর্ণ-সমূহের অনেকত্বনিবন্ধন এক প্রতীতি অসম্ভব বলিয়া এক একটা বর্ণের যে প্রতীতি, উক্ত প্রতীতিসমূহ দ্বারা যে সংস্কার উপস্থাপিত হয়, উক্ত সংস্কাররূপ বীজযুক্ত এবং অন্ত্য-বর্ণের প্রতীতিজনিত পরিপাকবিশিষ্ট পুরুষে এক প্রতীতির বিষয়রূপে উক্ত ফোন্ট প্রতিভাসমান হইয়া থাকে।”

অতএব ফোন্টস্বরূপ বলিয়া বেদ নিত্য, যেহেতু প্রতি বর্ণের উচ্চারণেই তাহার প্রত্যভিজ্ঞ অর্থাৎ পূর্ব পূর্ব সংস্কার-জ্ঞান

বর্তমান। বৈদান্তিকগণ বলেন,—“ভগবান্ উপবর্ষ-বর্ষ-সমূহকেই শব্দস্বরূপ বলিয়া থাকেন”—এই নীতির অনুসরণ পূর্বক “দ্বির্গো” এই স্থলে এক শব্দেরই উচ্চারণ, পরন্তু দুইটী ‘গো’ শব্দের উচ্চারণ হয় নাই, যেহেতু একত্বরূপেই সমস্তের প্রত্যভিজ্ঞান হইয়াছে। অতএব বর্ণাত্মকরূপেই শব্দের নিত্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন। উক্ত বর্ণসমূহ পংক্তিস্থিত পিপীলিকা-সমূহের স্থায় ক্রমশঃ অনুগৃহীত অর্থবিশেষের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া নিজ-ব্যবহারে ও এক একটী বর্ণোচ্চারণের অনন্তর সমস্ত বর্ণের প্রতীতি-প্রকাশিনী বুদ্ধিতে অর্থবিশেষ সম্বন্ধরূপেই প্রতিভাসমান হইয়া নিয়মিতরূপে উক্ত অর্থের প্রতীতি জন্মাইয়া থাকে। অতএব বর্ণবাদিগণের কল্পনার লাঘব হইয়া থাকে। ফোন্টবাদিগণের মতে অর্থ-প্রতীতিবিষয়ে দৃষ্টবর্ণসমূহের পরিহার-হেতু দৃষ্টহানি এবং অদৃষ্ট-ফোন্টের উপাদানহেতু অদৃষ্ট-কল্পনারূপ দোষদ্বয়ের উপস্থিতি হইয়া থাকে। বিশেষতঃ এই বর্ণসকলই একবার ক্রমশঃ উচ্চারিত হইয়া ফোন্টকে প্রকাশ করে, পুনরায় ঐ ফোন্ট-পদার্থ অর্থকে প্রকাশ করে, এই কল্পনাপক্ষে কল্পনা-গৌরবরূপ দোষ ঘটিয়া থাকে। অতএব এইরূপে বর্ণাত্মক বৈদিক শব্দসমূহেরই নিত্যত্ব এবং অর্থ-প্রতীতিজনকত্ব অঙ্গীকৃত হইল।

শাস্ত্রভাষ্যে রত্নপ্রভা-টীকা, আনন্দগিরি, ভামতী, জয়ন্তভট্ট-কৃত স্থায়মঞ্জরী প্রভৃতিতে ফোন্টবাদের অনেক আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু শ্রীমন্নহাপ্রভু তাঁহার অধ্যাপক-লীলায়, আচার্য্য-লীলায় যে অভূতপূর্ব ফোন্টবাদের বিচার

প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেই বিচার পরমার্থ-বিজ্ঞান-বিশ্বে আর ইতঃপূর্বে এরূপ সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ তৎসন্দর্ভীয় অনুব্যাখ্যায় সাধারণ ফোটেবাদ নিরাস করিয়া যে বর্ণরূপ বেদশব্দের নিত্যত্ব ও অর্থপ্রত্যায়কত্ব স্বীকার করিয়াছেন, তাহা দ্বারা, শ্রীমন্নহাপ্রভু অধ্যাপক-লীলায় যে ফোটেবাদের বিদ্বদ্রুটিগত বিচার প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাই স্থাপিত হইয়াছে। শ্রীল জীবগোস্বামিপাদের শ্রীহরিনামামৃতব্যাকরণের অবতারণা পাণিনীয় সাধারণ ফোটেবাদ নিরাস করিয়া ফোটেবাদের বিদ্বদ্রুটি-স্থাপনাভিপ্রায়েই হইয়াছিল। বিদ্বদ্রুটিগত ফোটেবাদ গোড়ীয়-দর্শনের সার-শিক্ষা শ্রীনাম-ভজনেই পরিস্ফুট হইয়াছে। শিক্ষাষ্টকে যে বিদ্যাবধুজীবন-শ্রীনামসঙ্কীর্ণনের বিজয়-ছন্দুভি ঘোষিত হইয়াছে, তাহাতে বিদ্বদ্রুটিগত ফোটেবাদই পরিস্ফুট হইয়া পড়িয়াছে।

বর্ণের উচ্চারণবোধক বেদাঙ্গশাস্ত্রকে 'শিক্ষা বলে। উদাত্ত, অমুদাত্ত প্রভৃতি স্বরবিজ্ঞান 'শিক্ষা'-বেদাঙ্গের আলোচ্য বিষয়। কিন্তু শিক্ষাষ্টক সেরূপ বেদাঙ্গমাত্র নহেন। শিক্ষাষ্টকের অন্তর্গতই নিখিল সাস্ত্রবেদ। শিক্ষাষ্টকে যে শিক্ষা, তাহাতে বেদাঙ্গ-শাস্ত্রের বিদ্বদ্রুটিগত বিচার বেদের অঙ্গমাত্র আবদ্ধ না থেকে সাস্ত্রবেদকে ক্রোড়ীভূত করিয়া ফেলিয়াছে। সেই শিক্ষাষ্টকে নামী হইতে অভিন্ন স্বরাট্ কৃষ্ণচৈতন্যরসবিগ্রহ শ্রীনামচিন্তামণি ফোটেবাদের কথা ব্যক্ত হইয়াছে।

বৈয়াকরণগণ বা শাস্ত্রিকগণ ফোটেকে বর্ণাতিরিক্ত বা

বর্ণ হইতে ভিন্ন বিচার করিয়া নানাপ্রকার সাম্প্রদায়িক বাদ-বিসম্বাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু গোড়ীয়-দর্শনের শ্রীনামের বিচারে সাধারণ স্ফোটবাদের যাবতীয় সাম্প্রদায়িক বিবাদ প্রশমিত হইয়াছে। সাধারণ স্ফোটবাদে বর্ণ ও বর্ণীতে ভেদ, কেন না, তাহাদের বর্ণ বা শব্দের বিচার প্রকৃতি বা ইতর-ব্যোমের অন্তর্গত; কিন্তু বিদ্বদ্ভূটিগত স্ফোটবাদের বিচারে কোন প্রকার মায়ার ব্যবধান নাই। সেখানে বর্ণ ও বর্ণীতে, শব্দ ও শব্দীতে, বাচ্য ও বাচকত্বে কোন ভেদ নাই। সেখানে বর্ণসকলের বাচকত্ব অসম্ভাবিত নহে। কারণ, সেখানকার বর্ণ ও বর্ণী, শব্দ ও শব্দী, বাচ্য ও বাচক, উভয়েই পরব্যোমের বস্তু। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীল সূত গোস্বামী শৌনকাদি ঋষিগণের নিকট এইরূপ বিদ্বদ্ভূটিগত স্ফোটবাদের কথাই বলিয়াছিলেন,—

“শৃণোতি য ইমং স্ফোটং সুপ্তশ্রোত্রে চ শূন্যদৃক্। যেন বাগ্যজ্যতে যস্য ব্যক্তিরাকাশ আত্মনঃ ॥ স্বধায়ো ব্রহ্মণঃ সাক্ষাদ্বাচকঃ পরমাত্মনঃ। স সর্বমন্ত্রোপনিষদ্বৈবীজং সনাতনম্ ॥ (ভাঃ ১২।৬।৪০-৪১)

যে সময় আচ্ছাদনাদি হেতু শ্রবণেন্দ্রিয় বৃত্তিশূন্য হইয়া থাকে, সেই সময় ইন্দ্রিয়সমূহের সাহায্য ব্যতীত স্বাভাবিক জ্ঞানশালী যে-পুরুষ স্ফোট অর্থাৎ অব্যক্ত ওঁকারধ্বনি শ্রবণ করিয়া থাকেন, তিনিই পরমাত্মা। ঐ স্ফোট দ্বারাই বৃহতী-সংজ্ঞক বাক্যের প্রকাশ হয় এবং ঐ স্ফোট স্বয়ং হৃদয়াকাশে আত্মার নিকট হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ঐ স্ফোট নিজের কারণস্বরূপ পরমাত্মা ব্রহ্মবস্তুর সাক্ষাদ্বাচক এবং

উহাই যাতীয় মন্ত্রসমূহের রহস্য ও বেদসমূহের সনাতন বীজস্বরূপ।

স্ফোটবাদের বিদ্বৎ-তাৎপর্য—স্ফোট—ব্রহ্ম-বস্তুর সাক্ষাৎ বাচক। সাধারণ বিচারে ‘স্ফোট’ শব্দে—ব্রহ্ম। ব্রহ্ম ক্ষুদ্রত্বের পর পর বিচারে উন্নত দর্শনমাত্র। বৃহত্ত্ববোধক বিচার জ্ঞাপন করিবার জন্য ‘ব্রহ্ম’ বলা হইতেছে। ক্ষুদ্রতা পরিহার করিয়া ‘ব্রহ্ম’ শব্দের অবতারণায় বৃহত্ত্ববাচক স্ফোট-বাদের বিচার। হৈয়ণ্যগর্ভগণ বলেন,—সেই বিচারটা পরমাত্মাতে আবদ্ধ। সেইরূপ বিষয়টা এরূপভাবে বিচারগ্রাহ্য নহে। ‘নব’ ও ‘বন’ শব্দের সাম্য-বিচারে শব্দার্থের বিচার হয়। ‘নদী’, ‘দীন’, ‘সর’, ‘রস’ প্রভৃতি শব্দের বিছাসের বৈপরীত্যহিসাবে উদ্দিষ্ট বস্তুর ভেদ লক্ষিত হয়। সেই সকল শব্দের ন্যায় ‘ব্রহ্ম’-শব্দ নহে। মনোধর্ম্যচালিত হইয়া ‘ব্রহ্ম’ শব্দের ব্যাখ্যা করিতে গেলে শব্দের সত্যার্থ প্রকাশিত হয় না। গুরুপাদাশ্রিতের নিকট তাহা স্বয়ং প্রকাশিত হয়।

ত্রিবিধ রূঢ়ি—স্ফোটের বিচার সমৃদ্ধ হইয়া রূঢ়ি প্রকাশিত হয়। রূঢ়ি তিন প্রকার—অজ্ঞরূঢ়ি, সাধারণরূঢ়ি ও বিদ্বদরূঢ়ি। বিদ্বদরূঢ়ি অদ্বয়জ্ঞানকে লক্ষ্য করে, সাধারণ-রূঢ়ি ব্যবহারিক পরিভাষাগত বস্তুর ধারণায় বুদ্ধিবৃত্তিকে আবদ্ধ করে, অজ্ঞরূঢ়ি তাহা অপেক্ষাও সঙ্কীর্ণতা পোষণ করিয়া ব্যবহারজগতে রজস্তমোগুণেরও মর্যাদা স্থাপন করে—জীবের বিভিন্ন প্রতীতির জন্য এই সকল কথা আসিয়া উপস্থিত হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে স্ফোটবাদের বিদ্বদরূঢ়ি পরব্রহ্ম-

বস্তুকে লক্ষ্য করে। সেখানে স্ফোট কেবল বাচকমাত্র নহে, তাহাতে বাচ্যের বিচারও পরিস্ফুট, তখন আমরা জানি,— নামও নামী অভিন্ন।

শ্রৌতপন্থা ও স্ফোটের কদর্থঃ—যাহার প্রতিকূলে অপর কেহ তর্কবাদ অবলম্বন করিয়া তাহার বাস্তবতাকে প্রতিহত করিতে পারে না, তাহাই শ্রৌতপন্থা। স্থূলসূক্ষ্মাকারে যদি শব্দের বিদ্বদ্ভ্রুটি চেতনের নিকট আবৃত হয়, তাহা হইলেই স্ফোটের কদর্থ হইয়া থাকে, তখন শব্দ ক্ষুদ্র পরিচ্ছিন্ন বস্তুর অভিজ্ঞান উপস্থিত করে। শব্দ গীত হইয়া কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল বটে ; কিন্তু চিদাকাশে বিচরণশীল বাস্তব-কর্মে প্রবেশ করিবার অবকাশ পাইল না। তাহাতে শব্দের বাস্তব বিজ্ঞান আবিষ্কৃত হইতে না পারায় পরিচ্ছিন্ন, সঙ্কীর্ণ, বিকৃত ও বিবর্তগ্রস্ত জ্ঞানে স্ফোটকে আবৃত করিয়া ফেলিল।

গৌড়ীয়াচার্য্য ও মহাপ্রভুর স্ফোটের বিচারঃ
শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু, শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু প্রভৃতি গৌড়ীয় দার্শনিক গুরুগণ অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্তে এইরূপ স্ফোটের বিচার প্রশ্ন করিয়াছেন ;—মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক— স্ফোটবিচারেরই পরিস্ফুট বিজ্ঞান। মহাপ্রভু অতি অল্লাঙ্করে স্ফোটের বিচার বলিয়াছেন,—“কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।” হরি সর্বদা কীর্তনীয়। যাহাতে অদ্বয়জ্ঞানের ব্যাঘাত হয়, সেরূপ শব্দ দ্বারা লোককে আচ্ছন্ন হওয়ার উপদেশ মহাপ্রভু দেন নাই। বিদ্বদ্ভ্রুটি-বৃত্তিতে প্রত্যেক শব্দ বিষু-বাচক—পরব্রহ্ম-বাচক। প্রত্যেক শব্দে স্ফোটধর্ম হইতে বিদ্বদ্ভ্রুটি প্রকাশিত। মহাস্ত

গুরুর দ্বারা কর্ণবেধসংস্কার হইলে—দিব্যজ্ঞান লাভ হইলে স্ফোটধর্মগত বিদ্বদ্ভ্রুটি প্রকাশিত হয়। রুড়িবৃত্তি শ্রীমূর্তির প্রকাশ করে। অজ্ঞ ও সাধারণরুড়িতে বাচ্য-বাচক ও শব্দ-শব্দীতে ভেদ থাকায় সেখানে পৌত্তলিকতা বা প্রাকৃত-সাহ-জিকবাদ উপস্থিত হয় ; কিন্তু বিদ্বদ্ভ্রুটিতে বাচ্য-বাচকে আবরণ না থাকায় সেখানে পৌত্তলিকতার কোন স্থান নাই। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু ষট্‌সন্দর্ভে, শ্রীল রূপ-সনাতন প্রভু ভাগবতামৃত প্রভৃতিতে এবং গোড়ীয় দার্শনিকগণ সকলেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথিত এই বিচার বিশেষভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন।

জড়াকার, চিদাকার ও শব্দার্চ্য—যখন কোন একটা বস্তু আকারবিশিষ্ট না হয়, তখন আমাদের দর্শনের বিষয় হয় না। কেবল নিরাকারের ধারণা অবাস্তব দার্শনিকগণের আকাশের পশ্চাদ্ভূমিকার কল্পনা মাত্র। যে বস্তু কিছুক্ষণ স্থূল-স্থূল আকার সংরক্ষণ করিয়া নিত্য চিদাকার সংরক্ষণ করিতে পারে না, সে বস্তু অবাস্তব কল্পনামাত্র, তাহা কখনও সচ্চিদানন্দবস্তু নয়। গোড়ীয়-দর্শনে যে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ সর্বকারণকারণ পরমেশ্বর-বস্তুর কথা বলা হইয়াছে, তাহা নিত্য চিদাকার-বিগ্রহ। তাহাই বাস্তব দার্শনিকগণের মূল প্রতিপাত্ত বিষয় এবং তাহাই স্ফোটের বিদ্বদ্ভ্রুটি দ্বারা গুরুপাদাশ্রিত বিদ্বজ্জন-গণের শ্রুতিতে ও বাণীতে শব্দার্চ্যাকারে প্রকাশিত।

কর্ষ ও লীলা—গোড়ীয়-দর্শনের গোড়ার কথা—‘কর্ষ’

ও 'লীলা'তে আকাশ-পাতাল ভেদ আছে। কর্ষ—বহিন্মুখ-জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ, লীলা—সেবোন্মুখ-চিদ্রিয়গ্রাহ। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের দ্বারা ভোগ্য জড়ের গ্রাহ্য বুদ্ধিয়া লইতে পারা যায়, লীলা এরূপ কোন কার্য্য প্রকাশ করে না। মনের দ্বারা জড়ের যে আকার ধারণা করিতে পারা যায়, তাহা বস্তুর বাস্তব আকারের সহিত ভেদ স্থাপন করে। কিন্তু শব্দ এই তুর্ভেদতুর্গ দেহ ও মন ভেদ করিয়া চেতনের সন্ধিনীতুমিকায় প্রকাশিত হয়। বিদ্বদ্রুটিতে সেই শব্দ সাক্ষাৎ বিগ্রহবান্ হরিরূপে গোড়ীয়-দার্শনিকের দর্শনের বিষয় হয়। শাস্ত্রের সর্বত্রই এই হরির গান আছে। যে-সকলকে ইংরেজী পরিভাষায় Scripture বলা হয়—যাহাকে 'শাস্ত্র' বলা হয়—'বেদ', 'ভাগবত', 'পুরাণ' বলা হয়, সে-সকলের মধ্যেই হরির কথা বর্ণিত আছে,—“বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা। আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্বত্র গীয়তে ॥” লীলার ভাষায় বেদাদিতে 'হরি' শব্দের অবতারণা। গীতার উদ্দিষ্ট কৃষ্ণতত্ত্ব বিদ্বদ্রুটিগত বিচারে না বুঝিতে পারিয়া অনেকে তাহাতে স্বকপোল-কল্পনা বা মনোধর্মের আবরণ আনিয়া ফেলিয়াছে। উহাতে শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থের উপলব্ধি হয় না। “কৃষ্ণতত্ত্ব কর্শ্মান্তর্গত নহে”। যাহা স্বরাট—যাহা সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র—যাহা একমাত্র স্বেচ্ছাময়, তাহা কর্ষের অধীন হইতে পারে না। গোড়ীয়-দর্শন এই চরম সত্য কথা—পরম সত্যের স্বেচ্ছাময়ত্ব, লীলাময়ত্ব দর্শন করিয়া থাকেন,—“জন্মাদ্যশ্চ যতোহব্য়াদিতরশ্চার্থেষুভিজ্ঞঃ স্বরাট্ তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে মুহন্তি যৎ সুরয়ঃ ॥ তেজোবারিমুদাৎ

যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোহমৃষা ধান্না স্মেন সদা নিরন্তুকুহকং
 সত্যং পরং ধীমহি ॥” (ভাঃ ১।১।১)। শ্রীমদ্ভাগত এই গোড়ীয়-
 দর্শনের ভাষ্যগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভাগবতে যে নৈকস্ম্যবাদ আবিষ্কৃত
 হইয়াছে, তাহা কস্মবাদগহর্ণকারী কেবলাদ্বৈতবাদমাত্রকে
 লক্ষ্য করে না। ভক্তির বিচার অবলম্বন না করা পর্য্যন্ত কস্ম-
 জ্ঞান-যোগাদির জাগতিক ও অসম্যক্ বিচারের হাত হইতে
 কিছুতেই অবসর পাওয়া যায় না। গোড়ীয়-দর্শনিক না হওয়া
 পর্য্যন্ত কুদার্শনিক-বিচারের হস্ত হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া
 বাস্তব বিচারের পরিপূর্ণ পদবীতে উপনীত হওয়া যায় না।
 মনোধর্ম ও দেহধর্ম নানা প্রকার ধর্মের আবাহন করিয়াছে।
 সেই সকল ধর্মের ধারণা ও কর্তব্যতা হৃদয়ে সমারুঢ়
 থাকা কাল পর্য্যন্ত গোড়ীয়-দর্শনের অনাবিল সাম্রাজ্যে
 প্রবেশলাভ ঘটে না। সমস্ত জগৎ যে সকল কথায় ব্যস্ত
 রহিয়াছে, গোড়ীয়-দার্শনিক সেই সকল কথার জগ্ন
 অধিক সময় দেন না,—“সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
 ভবন্তি হ্রৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ। তজ্জাষণাদাশ্বপবর্গবর্জ্জনি
 শ্রদ্ধা-রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্টি ॥

শব্দব্রহ্মের নিত্যরাধনাই কর্তব্য,—একমাত্র
 স্ফোটাকারে শব্দরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন যে অদ্বয়জ্ঞান—স্বতঃ-
 সিদ্ধ কথা, সদা তাহার আলোচনা করিতে হইবে। একবার
 নহে, দুইবার নহে, বিশ্রাস্ত নহে, প্রতিহতভাবে নহে, নিত্যকাল
 অবিশ্রাস্ত, অপ্রতিহ তভাবে সেই স্ফোটব্রহ্মের—ভগবন্মামের
 আলোচনা করিতে হইবে—সর্ব্বেন্দ্রিয়ে নৃত্য করাইতে হইবে।

লীলা প্রবেশ—সেই শব্দ হৃদয়-কর্ণকে রসযুক্ত করে। অসাধুর সঙ্গে বা নিজে নিজে কিম্বা অন্তমনস্ক হইলে হৃদয়-কর্ণ রসযুক্ত হয় না। স্বরূপোপলক্ষিত্রমে সেবোন্মুখ কর্ণে সাধুর প্রসঙ্গযোগে হৃৎকর্ণ রসযুক্ত হয়। সাধুর সঙ্গ আরম্ভ করিলেন যাঁহারা, তাঁহারা অন্ত কার্যে সময় দিতে পারেন না, সর্ব-চিদ্রিয়ের দ্বারা হৃষীকেশকে আকর্ষণ করেন এবং নিজেও প্রকৃতির বাস্তব-বিষয় অপ্রাকৃত হৃষীকেশের আকর্ষণে আকৃষ্ট হন, ইহাই হইল - লীলায় প্রবেশ। ‘সাধুসঙ্গই মূল’—মুক্তির পথে আবদ্ধ থাকিবার যে বিচার-প্রণালী, তাহা হইতে মুক্ত হইয়া - কাল্পনিক মুক্তি—ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান হইতে মুক্ত হইয়া পরম মুক্ত-গণের উপাস্ত লীলাপুরুষোত্তমের নাম-রূপ-গুণ-লীলায় প্রবেশ ঘটে সাধুগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতে। তখন আর কর্তৃসত্তাগত বা কর্মসত্তাগত বিচারে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হয় না।

‘শ্রদ্ধা’ শব্দে—নির্ভরতা। জড়জগতের ইন্দ্রিয়জজ্ঞান যাহা সত্য বলিয়া স্থির করিয়া দিয়াছে, তাহাতে নির্ভর করিয়া ‘কর্মবীর’ বলিয়া যাঁহারা প্রতিষ্ঠিত হইতে চাহেন, তাঁহাদের সেই ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান পরমুহূর্তেই তাঁহাদিগের ছলনা করে। Phenomena তে যদি শ্রদ্ধা করি, তাহা হইলে তাহাতে কেবল কর্মালানে বদ্ধ হইব। যখনই আমাদের এইরূপ শ্রেয়ো বিচার হয়—“যস্ত দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্মৈতে কথিতা হৃথাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥” তখনই ঋতিগত শব্দের বিদ্বদ্ভ্রুতিবৃত্তি আমাদের অধিগত হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয় দ্বারা—চক্ষু-নাসা-দ্বারা—মানসিক পর্য্যালোচনা

দ্বারা শব্দের যে অর্থ-বিচার, তাহা অচিদ্বিলাস। ঐসকল ইন্দ্রিয়-পরিচালনা—ভোগ মাত্র। বহির্জগতের অর্থ আমাদিগকে শ্রোতপথ হইতে বিচলিত করে—বাস্তব সত্য হইতে ভ্রষ্ট করে; সে প্রণালীতে আমরা পরমেশ্বরের সন্ধান পাই না। ভূতাকাশের শব্দ ফোটাকার ধারণ করিয়াছে দেখিয়া সেই জিনিষটাকে যদি বলি ‘ব্রহ্ম’, তাহা হইলে সেইরূপ ধরণের Analogy draw (সাদৃশ্য অনুমান) করিয়া সত্যবিষয়ের অভিজ্ঞান নাও হইতে পারে। কর্মের বিচার কখনই সূষ্ঠ নহে। জ্ঞানও—খণ্ডজ্ঞান ও অখণ্ডজ্ঞান; সমগ্র জ্ঞান নহে। কর্মত্যাগ না করিলে জ্ঞানে প্রবেশ হয় না; আবার জ্ঞানের দ্বারা অতন্নিরসনই হইতে পারে। কিন্তু ভগবৎসম্বন্ধজ্ঞানের উদয়ে জীবের সেবাপথ আবিষ্কৃত হয়। অতন্নিরসনে ‘তৎ’ নির্দিষ্ট হয়, সেই তদ্বস্ত যখন আপনাকে আপনি প্রকাশ করেন, তখনই সেই ফোটাকার ‘ওঁতৎসৎ’ এর স্বরূপ আমাদের নির্মূল চেতনবৃত্তিতে প্রকাশিত হয়,—“যাবানহং যথা-ভাবো যদ্রূপগুণকর্মকঃ। তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্ত তে মদনুগ্রহাৎ” ॥ ভগবানের কৃপা হইলে তিনি শব্দরূপে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি রূপধৃক্, গুণময়, লীলাময়, পরিজনপরিবেষ্টিত, তাঁহার ধাম আছে, এই জগৎ তাঁহারই নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পারকরবৈশিষ্ট্যের বিকৃত হয়ে প্রতিফলন। সেই শ্রীহরিই কৃপা করিয়া—‘তিনি কিরূপ আকারের হরি, কি রকম রংএর হরি’,—সকলই চেতনের বৃত্তিতে প্রকাশিত করিয়া দেন।

গৌড়ীয়-দর্শনে পূর্ববস্ত দর্শন করা যায়, আর অগৌড়ীয়-

দর্শনে বিকৃত, অসম্যক্ আংশিক দর্শনের প্রচেষ্টা আছে। গৌড়ীয়-দর্শনে নিত্য-দর্শনীয় বস্তুকে আমরা ভোগ্য বলিয়া জানি না। ভোক্তা—কর্তৃহাভিমাণে ব্যস্ত। কর্তৃহাভিমান লইয়া যে-সকল দর্শনের প্রচেষ্টা, তাহাতে ভগবদ্দর্শন হয় না। শুদ্ধাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত-বিচারে আমরা বিবর্তবাদ ছাড়িয়া দিতে পারি। নির্বিশেষ বিচারটা কিছু খারাপ নয়, কারণ, জড় বিশেষটা—পৌত্তলিকতা। জড়বিশেষরহিত হওয়া আবশ্যিক ; কিন্তু জড়বিশেষরহিত অবস্থাটাই শেষ বা চরম কথা নহে। জড়বিশেষকে অতিক্রম করিয়া নিত্য চিদ্বিশেষের রাজ্যে উপনীত হওয়াই—চেতনের স্বভাবে আগমন।

গৌড়ীয়-দর্শনে সর্ব-সম্বয়ঃ—গৌড়ীয়-দর্শন একদেশ-দর্শী জড়সাকার-বাদীকে সমর্থন করেন না, কিম্বা একদেশদর্শী নিগূর্ণবাদীকেও প্রশ্রয় দেন না। গৌড়ীয়-দর্শনের 'সাকারবাদ জড়সাকারবাদ নহে ; কিন্তু গৌড়ীয়-দর্শন জড়সাকারবাদ নিরাস করিয়া অচিহ্ন্যশক্তিসম্পন্ন সচ্চিদানন্দবিগ্রহের নিরাকার আকার বা সূক্ষ্ম ভূতাকাশময় আকার কল্পনা করিয়া দ্বিতীয় প্রকার কপটতাময় জড়সাকারবাদরূপ ব্যুৎপন্ন বা পাপের আবহান করেন না, কিম্বা অবিচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন পরমেশ্বরের পারমেশ্বর্য্যকে মানবীয় মস্তিষ্কের বা মনোধর্ম্মের ছাঁচে ঢালিয়া অপরাধময় আকার কল্পনা করিতে ধাবিত হন না, অথবা তথাকথিত নিগূর্ণবাদ আবাহনের নামে ত্রিগুণাতীত শুদ্ধ-সত্ত্বতনু কল্যাণবারিধিকে মানবীয় অকল্যাণময় চিন্তাশ্রোতের দ্বারা বিচার করিয়া পরমেশ্বরকে শূন্যবাদের যুপকার্ঠে বলি

দিবার পাষণ্ডতাও করেন না। গোড়ীয়-দর্শন চিদ্বিশেষ বা চিৎসাকারবাদ স্বীকার করেন। জড়সাকারবাদকে নিরাস করায় গোড়ীয়-দর্শনে ‘অতল্লিরসন’ নামক নিরাকারবাদেরও সামঞ্জস্য আছে, কিন্তু নিরাকারবাদের একদেশদর্শিতা ও হেয়তা নাই। গোড়ীয়-দর্শন মিশ্রসত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই প্রাকৃত গুণসমূহে পূর্ণচেতন পরমেশ্বরের আরোপ করেন না বলিয়া এবং পরমেশ্বরকে শুদ্ধসত্ত্বতনু অখিল কল্যাণনিলয় বিচার করেন বলিয়া নিগূর্ণবাদেরও প্রকৃত তাৎপর্য গোড়ীয়-দর্শনেই সমন্বিত হইয়াছে। যাঁহারা ‘সাকারবাদ’, ‘নিরাকারবাদ’ বা ‘নিগূর্ণবাদ’ কথাগুলি লইয়া মারামারি করিতেছেন, তাঁহারা যদি গোড়ীয়-দর্শনের সুসম্যক্ বিচার পরিদর্শন করেন, তাহা হইলে ঐরূপ একদেশ-দর্শিতা ও সাম্প্রদায়িক বিবাদ হইতে নিরস্ত হইতে পারেন।

শ্রবণানুগ্রহে দর্শন—স্ফোট কাহাকে লক্ষ্য করিতেছে—কোন্ আকারকে লক্ষ্য করিতেছে? স্ফোট যখন স্ফুটিত, অভিব্যক্ত হয়, তখন সেই অভিব্যক্তি বা স্ফোটের লক্ষীভূত নাম-রূপ-গুণ-লীলার অভিজ্ঞানকে ‘দর্শন’ বলি। শ্রবণানুগ্রহে যখন সেই অভিজ্ঞানটী আসিয়া উপস্থিত হয়, তখনই তাহাকে ‘দর্শন’ বলিতে পারি, এটা যেন বালকদিগের kindergarden system এর মত। সাধুর মুখে স্ফোটের নাম-রূপ-গুণ-লীলা অর্থাৎ নামের নাম, নামের রূপ, নামের গুণ, নামের লীলার কথা শ্রবণকারীই স্ফোটবাদের যথার্থ তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ। জীবস্বরূপে জ্ঞানস্বরূপতা

ও জ্ঞাতৃস্বরূপতা—উভয়ই আছে। যে-কাল পর্য্যন্ত আনন্দধর্ম জীবে প্রস্ফুটিত না হয়, ততদিনই বদ্ধজীবাবিমান থাকে। সাধুর সঙ্গক্রমে ভগবানের কথা শ্রবণ করিবার সুযোগ যখন হয়, তখনই জীব বুদ্ধিতে পারে, তাহাতে আনন্দ-ধর্ম আছে। অপ্রাকৃত আনন্দানুসন্ধানে বিরত হইয়া জীব জ্ঞানপথে প্রধাবিত হয়,—“জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্ত নমন্ত এব জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্তাম্। স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্গনোভির্যে প্রায়শোহজিত জিতোহপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্ ॥ অক্ষজ চেষ্টা লইয়া বহির্জগতের যে সমস্ত কথা আছে, তাহাকে ভূমিকা করিয়া অভিজ্ঞতার সিঁড়ি প্রস্তুত করিতে করিতে যদি রাবণের মত স্বর্গে উঠিতে থাকি, তাহা হইলে বাস্তব আনন্দলাভের সৌভাগ্য হইবে না—যে জিনিষটি আমাদের আত্মার অভীষ্ট, সেই জিনিষটি পাইব না। বহির্জগৎ দর্শন করিয়া ইন্দ্রিয়জ্ঞানের সাহায্যে যে অভিজ্ঞতা লাভ হয়, সেই অভিজ্ঞতা অবলম্বন করিয়া কখনও অধোক্ষজ-জ্ঞান-লাভের সম্ভাবনা থাকে না। যখন আমরা জাগতিক যাবতায় অভিজ্ঞতার অভিমান পরিত্যাগ করি, তখনই অধোক্ষজজ্ঞান জ্ঞানিতে পারি। বহু বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি—সমস্ত পৃথিবী দর্শন করিয়াছি—লোককে অশ্রু প্রকার বুঝাইয়া দিতে পারি—এরূপ বিচার লইয়া পূর্ণজ্ঞান, শুদ্ধজ্ঞান বা মুক্তা-বস্থার জ্ঞান আমরা কখনই পাইতে পারি না। যেমন তলবকারোপনিষৎ বলিতেছেন,—নাহং মন্ত্রে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ। যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ ॥

যস্যমতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ ॥ অবিজ্ঞাতং
বিজ্ঞানতাং বিজ্ঞাতমবিজ্ঞানতাম ॥

দ্বিতীয় ক্রম

অনুগতি—চিন্ময় বিশ্বয়রতি হইতে জাত চিন্ময় অদ্ভুতরসের আশ্রয় স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণদেবের নিঃশ্বাস হইতে ফোটসংরক্ষিত হয় অর্থাৎ আধ্যক্ষিকতা-দ্বারা শুদ্ধ ফোটজ্ঞানের অপব্যবহার হইলে শ্রীকৃষ্ণদেব তাহা হইতে রক্ষা করেন। শ্রীমদ্ভাগবতের উপসংহারে শ্রীসুত গোস্বামিপাদ দ্বাদশ রসের সর্ব্বরসেই বর্তমান অদ্ভুত-রসের দৈবত শ্রীকৃষ্ণদেবের কৃপাদর্শীর্বাদ যে অপ্রাকৃত ফোটব্রহ্মের প্রকাশক ও রক্ষকরূপে জ্ঞাপন করিয়াছেন, তদ্রূপ শ্রীলকবিরাজ গোস্বামিপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উপসংহারেও শ্রীল দাসগোস্বামিপাদের ‘শ্রীগৌরঙ্গ-স্ববকল্পবৃক্ষ’ হইতে একটি শ্লোক উদ্ধার করিয়া সেই পরম-মহানির্বাচ্যতম, অচিন্ত্যাদপি অচিন্ত্য, অদ্ভুত হইতেও অদ্ভুত রসের অধিদেব শ্রীকৃষ্ণদেবরূপে আত্ম-প্রকাশকারী ‘অদ্ভুত বদান্ত’ শ্রীগৌরসুন্দরের ভজন-প্রকাশ ফোটের পরিপূর্ণতম প্রকাশপরাকাষ্ঠারূপে ইঙ্গিত প্রদান করিয়া জগজ্জীবকে আহ্বান করিয়াছেন। রসস্বরূপ ও রসরাজ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের রসাস্বাদ কামনারও বিশ্বয়োৎপাদক যে অপ্রাকৃত রসফোটের অভিব্যক্তি প্রকাশক ও আস্বাদক যে রস-চমৎকারিতা-বিশেষের পরাকাষ্ঠা অবিস্কার ও বিস্ফারক বিপ্রলম্ব-বিগ্রহ কমঠাকৃতি শ্রীগৌর-সুন্দরের মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য মহিমা গান করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণদেবের কৃপা বৈচিত্র্য

সকলের পক্ষে অগম্য। তাঁহার শ্বাসবায়ুরাশি সংস্কার বশতঃ সেই অপ্রাকৃত বস্তুশক্তির স্ফূরণ হইলেও তৎকৃপায় তাহা জীবের উপযোগী হইতে পারে। তিনি যখন নিশ্বাস ফেলেন তাহাতে অপ্রাকৃত কৃষ্ণ সেবোপযোগী বস্তু ও বৃত্তি স্ফূটিত হইয়া জীবের লভ্য হয়, আবার ফিরিয়া যায়। সেই স্ফোটোৎপাদক ব্যাপার নিত্য। তদ্বারা জীবের স্ফোটজ্ঞান ও তত্ত্ব উপলব্ধি হইতে পারে। এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণদেবের শ্বাস-প্রশ্বাস আমাদের মঙ্গল বিধান করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণদেবের শ্বাসানিল আমাদের রক্ষা ও কৃপা না করিলে জাগতিক সৌভাগ্য লাভ করিয়া সেবা-বিমুখ হইয়া স্ফোটের কৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়া যাই, সেইটি আমাদের মহা অনর্থের কথা।

বিষ্ণুর স্ফোট প্রকাশেচ্ছা হইতে সমুদ্র-মন্ডনের ব্যবস্থা হইল। তদ্বারা দেব ও অসুর উভয় ভূতসর্গের অভীষ্ট সিদ্ধির ব্যবস্থা আছে। দেবতারা দৈত্যগণের সহিত কৌশলে সন্ধি স্থাপন করিয়া দেবদানব মিলিয়া মন্দরপর্বতকে মন্ডনদণ্ড ও বাসুকীকে বন্ধন রজ্জু করিয়া ক্ষীরসাগর মন্ডন করিতে সঙ্কল্প করিয়া মন্দর পর্বত আনিতে গেলেন। গুরুভার বহনে অক্ষম হইয়া অনেক দেব দানবের প্রাণ নষ্ট হইল। তখন পরমকারুণিক ভগবান্ কৃপাদৃষ্টি দ্বারা স্ফোট-শক্তি সঞ্চারিত করিয়া মৃতগণকে পুনর্জীবিত করিয় একহস্তে অবলীলাক্রমে স্ফোটশক্তিদ্বারা মন্দরপর্বতকে সমুদ্রে স্থাপন করিলেন। পর্বত আধারশূণ্য হওয়ায় নিম্নগামী হইয়া সলিল-মগ্ন হইতে আরম্ভ করিলে কৃষ্ণদেব স্ফোটের ধারণীশক্তি প্রকাশে নিজ পৃষ্ঠে পর্বত ধারণ

করিলেন। প্রথমেই ফোটেবাদের জড় সন্ধিনী-দ্রব্যরূপে হলাহল বিষ, ধ্বংসাত্মক শঙ্কর্যণাবতার রুদ্রের প্রকাশরূপ উঠিল। তাহা হইতে ধ্বংসকার্য হইতে নিরস্ত হইবার জন্ত তদীয় মূল অংশী সদাশিবের শরণাগত হইলেন। সদাশিব তখন ফোটেবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশরূপ অচ্যুত, অনন্ত, গোবিন্দাদি শ্রেষ্ঠ ভগবান্নামের সহিত আনুষ্ঠুপাদি ছন্দ ও প্রণব সংযুক্ত করিয়া শ্রীনাম প্রভুকে কণ্ঠে ধারণ করিয়া শ্রীনামের অপ্ৰাকৃত রূপ প্রকাশক নীলকণ্ঠ নাম ধারণ করিয়া তৎপ্রভাবে বিষের বীৰ্য্যকে পরাভূত করিয়াছিলেন। বিষ তাঁহার নামফোটেবাদের শক্তিতে কোনপ্রকার জড়ীয় প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। তাহা নীলকণ্ঠেই সম্ভব। ফোটেবাদের প্রকাশ নীলকণ্ঠ। তদ্ব্যতীত কল্পনা করিয়া নামের কৃপালাভ করিয়াছি ভাবিয়া বিষপান করিতে গেলে মৃত্যুই অবশ্যসম্ভাবী। শ্রীকুর্মেদেবের স্বাসানিল সম্ভূত বিষ্কারিত ফোটে হইতে বহিরঙ্গা মায়াকৃত কয়েকটি দ্রব্য উদ্ভিত হইল। ঐরাবত, পারিজাত, অপ্সরা প্রভৃতি ইন্দ্র গ্রহণ করিলেন। উচ্চৈশ্রবা অশ্ব বলিকে প্রদান করিলেন। বারুণি-নাম্নী সুরা অশুরেরা গ্রহণ করিল। সুরভী গাভী ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ যজ্ঞের হবির নিমিত্ত উহা গ্রহণ করিলেন। কৌস্তভমণি ও লক্ষ্মীদেবীকে ভগবান্ বিষ্ণু গ্রহণ করিলেন। এ লক্ষ্মী চঞ্চলা, বিষ্ণু গ্রহণ করিয়া তদীয়স্বরূপশক্তির সেবায় নিযুক্ত করিলেন। পরিশেষে বিষ্ণু-অংশ-সম্ভূত-ধন্বন্তরী অমৃত কলস হস্তে লইয়া উঠিলেন। দেব দানব মধ্যে অমৃত লইয়া কলহ উপস্থিত হইলে ভগবান্ মোহিনীরূপ ধারণ করিয়া অশুর

গণকে বঞ্চনা করিয়া দেবগণকে অমৃত বর্শন করিয়া দিলেন। তাঁহাতে বিশ্বয়রতি ও অদ্ভুত-রসের উদয় দেখা দিল। বিষ্ণুর মোহিনী মূর্ত্তি বিশ্বয় রতির কারণ। ফোটেয় বিকৃত সাধন জন্তু বিষের ক্রিয়া বৃশ্চিক, সর্প, দন্দশূকাদি লাভ করিয়া গৌরবাস্থিত হইল। ইহা মায়িক তমোগুণের সহিত বিজড়িত ফোটেয় জড়ীয় প্রকাশ। অমুরগণের প্রতি ফোটেয় রাজসিক ক্রিয়া এবং দেবগণের প্রতি ফোটেয় মায়িক সাত্ত্বিক ক্রিয়ার প্রকাশ। রাত্রে কেতুতে ফোটেয় সত্ত্ব ও রজো গুণের মিশ্র প্রকাশ। যে স্থানে শ্রীলক্ষ্মী পূজিতা হইয়া জাগতিক রত্নাদি ভোগ প্রদান করেন, তথায় শ্রীলক্ষ্মীদেবীর কপট কৃপা—চঞ্চলা লক্ষ্মীদেবীর কপটকৃপা, চঞ্চলালক্ষ্মীর কার্য। কারণ শ্রীলক্ষ্মীদেবীর শ্রীনারায়ণের সেবা ব্যতীত অন্য কোন কৃত্যই নাই। অন্য কার্যগুলি ছায়াশক্তির কার্য। বিষ্ণু কামদেব, তাঁহার কাছ থেকে কিছু আকাঙ্ক্ষা করা কর্তব্য নহে। কিন্তু বিমুখ ব্যক্তিগণের তাহাতেই প্রয়াস। রামচন্দ্র একটি পত্নী গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু রাবণ তাঁহাকেও গ্রহণের জন্ত সচেষ্ট ছিল। সেবা-বিমুখতা হইতে লক্ষ্মীহরণ পিপাসা আসে। তাহা হইতে রক্ষাকর্ত্তা শ্রীকুর্মেদেবের স্বাসানিল স্মৃতিত শুদ্ধ ফোটেয় প্রকাশ। শ্রীকুর্মেদেবের লীলায় অদ্ভুতরসের পরিচয় পাওয়া যায়। কুর্মেদেব দেবতাদিগের ভোগের ইন্ধন যোগাইতেছেন। এটি সাত্ত্বিক প্রবৃত্তিকে কিছু স্বীকার করিয়া তত্পরি তাহাকে সংশোধিত করিয়া নির্গুণ বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক ফোটেয় প্রকৃত কৃপা করিবার উদ্দেশ্যেই। তাঁহার ঈষৎ কৃপাজন্তু রক্ষিত দেবগণ

যাহা ভোগ করেন, সেটা স্বীকার করেন ভগবৎসেবাকে মুখ্য জ্ঞান করিয়া। দেবগণ লক্ষ্মীকে দেব-পূজ্যা নারায়ণভোগ্যা-জ্ঞানে নারায়ণকেই দান করিয়াছিলেন।

বেদরূপা ফোটের সস্থিৎ শক্তির প্রকাশ কুর্শ্মদেবের নিশ্বাস হইতে রক্ষিত। অতএব বহিরঙ্গার ফোটের ক্রিয়া সন্ধিনী, সস্থিৎ অর্থাৎ জড়ীয় জ্ঞান বিজ্ঞানাদি এবং লক্ষ্মীরূপা হ্লাদিনীর বহিঃপ্রকাশ সকল শ্রীকুর্শ্মদেবের ফোটের বঞ্চনাময়ী কপট ক্রাপাজাত বলিয়াই জানিতে হইবে।

ফোটের স্রাংশে প্রকাশ ঃ—মহাসর্ষনাংশ প্রথম পুরুষাবতার কারণোদকশায়ী ভগবান্ মহাবিষ্ণুর ফোটের দ্বিবিধ প্রকাশ লক্ষিত হয় একটা নিমিত্তাংশ ও অপরটা উপদানাংশ তদ্বারা নিজ বহিরঙ্গা মায়া বিরচিত পঞ্চভূত দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডরূপ পুর নিৰ্ম্মাণ করিয়া তাহার নিৰ্ম্মাণ কার্যরূপ ঈক্ষণাদিরূপ মায়াকে ক্রিয়াবতী করেন এবং উপাদানাংশ দ্বারা সমস্ত সত্ত্ব প্রকাশ করেন।

দ্বিতীয় পুরুষাবতার প্রচ্যুনাংশ গর্ত্তোদকশায়ী সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডগত অর্থাৎ সমষ্টি জীব বা হিরণ্যগর্ভের অন্তর্ধ্যামীতে ফোটের প্রকাশ দ্বারা বিশ্বের পালন, সৃষ্টি ও সংহারের শক্তিরূপ আবিভূত বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও রুদ্র—এই গুণাবতারত্রয় প্রকট করেন। তাঁহাদের মধ্যে সত্ত্ববিগ্রহ বিষ্ণু হইতেই শুভ ফলের উদয় হয়। ব্রহ্মা ও শিব হইতে হয় না। নিয়ামকতারূপে ফোটের অপ্ৰাকৃত গুণের সহিত সত্ত্বকে 'যোগ' বলে। অতএব বিষ্ণু সেই গুণত্রয়ের সহিত কখনই যুক্ত

হন না। বিষ্ণুর দ্বারা জগৎ-পালন কার্য্য ফোটে প্রকাশ। ব্রহ্মলোকের ঐশ্বর্য্য উপভোগকারী সূক্ষ্ম হিরণ্যগর্ভ এবং সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত ও বেদ প্রচারার্থ ব্রহ্মাদয় ফোটে শক্তিতে শক্তিমান হইয়া উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। শ্রীরুদ্র—
 অজৈকপাৎ, অহিব্রহ্ম, বিরূপাক্ষ, রৈবত, হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, সাবিত্র, জয়ন্ত, পিনাকী ও অপরাজিত—এই একাদশ বাহ্যযুক্ত এবং তাঁহার পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, সূর্য্য, চন্দ্র ও সোমযাজী এই অষ্টমূর্ত্তি। কোন কল্পে বিধির ললাট হইতে, কোন কল্পে বিষ্ণুর ললাট হইতে এবং কল্পাবসানে সংস্করণ হইতে কালাগ্নিরূদ্ভের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইহারা ফোটে বিক্ষারিত শক্তি প্রভাবে সংহার কার্য্য করেন। বায়ু-পুরাণাদিতে বৈকুণ্ঠের অন্তর্ভুক্তি শিবলোকে সর্ব্বকারণ স্বরূপ ও তমোগুণের সম্বন্ধ রহিত যে সদাশিব নাম্নী শিবমূর্ত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তিনি স্বয়ং ভগবানের (শ্রীকৃষ্ণের) বিলাস। “সেই রমাশক্তি যিনি ভগবৎপ্রিয়া ও ভগবদ্বশবর্ত্তিনী স্বপ্রকাশরূপা স্বরূপভূতা ভগবচ্ছক্তি; সৃষ্টিকালে শ্রীকৃষ্ণাংশ সংস্করণের স্বাংশ জ্যোতিরূপ কারণার্থবশায়ী প্রথম পুরুষের লিঙ্গ অর্থাৎ চিহ্ন স্থানীয় জ্যোতিরূপ সনাতন যে অংশ, তিনিই ভগবান্ শম্ভু (শম্ভুরূপ ভগবল্লিঙ্গ অর্থাৎ প্রকটিত চিহ্ন বিশেষ) বলিয়া কথিত। সেই লিঙ্গ নিয়তির বশীভূত প্রপঞ্চোৎপাদকাংশ (উপাদান কারণ)। ফোটে নিয়তিশক্তি হইতে যে প্রসবিনী—শক্তির উদয় হয়, তাহাই অপরাশক্তির যোনিরূপা মায়ার স্বরূপ। সৃষ্টির সময় উপস্থিত হইলে সেই

গোবিন্দের অংশ কারণাবশ্যায়ী প্রথম পুরুষের সৃষ্টির জন্ম
 মায়ার প্রতি দর্শনরূপ ক্রিয়া দ্বারা প্রপঞ্চ ও জীবগণের সহিত
 মহত্ত্বরূপ বীজ (কামবীজ) মায়াতে প্রদান করেন। তদুভয়
 সংযোগই হরির মহত্ত্বরূপ প্রতিকলিত কামবীজ—এই
 কামবীজ ফোটোথ গোলোকস্থ বিশুদ্ধ চিন্ময় কামবীজের
 মায়াতে প্রতিকলিত ছায়াশক্তিগত কাল্যাদি-শক্তির-কামবীজ।
 “লীলাবতারে প্রকাশিত” ফোটের প্রকাশ—শ্রীচতুঃসন—
 গর্ভোদকশায়ী পুরুষ ব্রহ্মা হইতে শুদ্ধজ্ঞান ও ভক্তির প্রচারার্থ
 ফোটশক্তি সহ অবতীর্ণ হন।

শ্রীনারদ :—সেই পুরুষ ঋষিস্বর্গলাভপূর্বক শ্রীনারদস্থ
 প্রাপ্ত হইয়া, যাহা হইতে কর্মের বন্ধহারিত্ব হয়, তাদৃশ সাহচ-
 তন্ত্র অর্থাৎ ‘নারদপঞ্চরাত্র’ নামক আগম শাস্ত্ররূপ ফোটের
 সন্থিদ প্রকাশ প্রণয়ন করেন।

শ্রীবরাহ :—এই বিশ্বের মঙ্গলের নিমিত্ত রসাতলগতা
 পৃথিবীর উদ্ধারার্থে ভগবান্ যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরি ফোটশক্তি
 গ্রহণ করিয়া বরাহ মূর্তি ধারণ করিয়াছিলেন। এই ব্রাহ্মকল্পে
 প্রথম স্বায়ম্ভুব মহন্তরে পৃথিবীর উদ্ধারার্থ ব্রহ্মার নাসারঞ্জ
 হইতে এবং পরে ষষ্ঠ চাক্ষুষ মহন্তরে পৃথিবীর উদ্ধারার্থ ও
 হিরণ্যাক্ষকে বধ নিমিত্ত জল হইতে আবির্ভূত হন। নূবরাহ,
 যজ্ঞবরাহমূর্তি—তিনি ফোটের যজ্ঞবিধির প্রবর্তক। পূর্বোক্ত
 কৃষ্ণ ও শ্বেত বরাহ মূর্তি।

শ্রীমৎস্য :—সেই পুরুষ (ভগবান্) চাক্ষুষ মহন্তরের
 অবসানে সমুদ্র প্লাবনে মৎস্যরূপে আবির্ভূত হইয়া পৃথিময়ী

নৌকাতে ভাবী বৈবস্বত মনু রাজা সত্যব্রতকে আরোহণ করাইয়া রক্ষা করিয়াছিলেন এবং শ্ফোটোদগীত বেদমার্গ গ্রহণ করিয়া ভয়ানক প্রলয় জলে বিহার করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের অবসানে হয়গ্রীব নামক দৈত্যকে বিনাশ করিয়া শ্ফোটের অক্ষরাগ্নক প্রকাশরূপ বেদ সকল আহরণ করেন। ইনিও দুইবার প্রকটিত হন।

শ্রীশত্ৰুঃ—সেই পুরুষ রুচি হইতে আকৃতির গর্ভে যজ্ঞরূপে আবির্ভূত হইয়া স্বীয় পুত্র যমাদি দেবগণের সহিত স্বায়ম্ভুব মন্বন্তুর পালন করিয়াছিলেন। ইনি শ্ফোটের মহার্জি-হরণ শক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রী নান্দ্রাশ্রয়ঃ—মনের বিষয়োন্মুক্ততা বিনাশপূর্বক পরব্রহ্মে নির্ধাকারী তপোভূষ্ঠান প্রদানরূপ শ্ফোটের প্রকাশক। “শ্রীকপিলদেব”—বিবেকপূর্বক তত্ত্ববর্গের বিশেষ নির্ণয়ার্থ সর্ববেদার্থ উপবর্দ্ধিত সাজ্জাতত্ত্ব রূপ শ্ফোটের তত্ত্ব প্রকাশ করেন।

শ্রীদত্তাভ্রেশ্বঃ—ভোগ ও মোক্ষরূপ যোগসিদ্ধি প্রদানকারী শ্ফোটের শক্তি প্রকাশক। “শ্রীহয়শীর্ষা”—সর্ববেদ-মৃতি ও বেদবিহিত যজ্ঞধারী, যজ্ঞে যজনীয় দেবতাগণের আত্মা। তাঁহার শ্বাসবায়ু পরিত্যাগ করিলে তাঁহার নাশপুট হইতে শ্ফোট স্ফুটিত মনোরম বেদবাণী সকলের আবির্ভাব হইয়াছিল। বাগীশ্বরীপতি এই হয়গ্রীব ব্রহ্মার যজ্ঞাগ্নি হইতে আবির্ভূত হইয়া মধু ও কৈটভ নামক বেদহরণকারী দৈত্যদ্বয়কে বিনাশ করিয়া পুনর্ব্বার বেদ সকলকে প্রত্যানয়ন

করেন। “শ্রীহংস”—স্ফোটের প্রকাশক ভক্তি ও তদ্বিষয়ের উপদেশ এবং জীবতত্ত্বের স্বরূপ প্রকাশক জ্ঞানযোগ প্রকাশ করেন। “শ্রীধ্রুবপ্রিয়”—ইনিই :পুষ্টিগর্ভ অবতার, স্ফোটের রস প্রকাশে বাৎসল্য রসের কিঞ্চিৎ প্রকাশক। “শ্রীঋষভ,—স্ফোটের পারমহংসাশ্রম বিচার প্রকাশকারী। “পৃথু”—স্ফোটের পালনীশক্তি প্রকাশক।

মহত্তরী ও মোহিনী :—স্ফোটের সুধা প্রকাশকারী, আয়ুর্বেদ প্রবর্তক ও অসুর মোহিনী বৃত্তি প্রকাশক অবতার দ্বয়। “শ্রীব্যাস”—স্ফোটের সম্বিৎ শক্তির আবিষ্ট অবতার। পরে শ্রীনারদ কৃপায় স্ফোটের হ্লাদিনী আবিষ্ট সম্বিতের আন্তর-স্ফোটের উপলব্ধি করিয়া সহজ সমাধিলব্ধ অবস্থায় স্ফোটের বিক্রম উপলব্ধি করিয়া বহিঃস্ফোটের প্রকাশক। “শ্রীবামন” :—বলির নিকট হইতে দ্বিপাদ বিভূতি গ্রহণ করিয়া স্ফোটের ত্রিপাদবিভূতি শরণাগতির দ্বারা প্রদর্শন প্রকাশক ও শিক্ষক।

মহত্তরী অবতার :—১। যজ্ঞ, ২। বিভূ. ৩। সত্যসেন, ৪। হরি, ৫। বৈকুণ্ঠ, ৬। অজিত, ৭। বামন, ৮। সার্বভৌম, ৯। ঋষভ, ১০। বিশ্বক্‌সেন, ১১। ধর্মসেতু, ১২। সুধামা ১৩। যোগেশ্বর, ১৪। বৃহদ্ভানু ইহারে স্ফোটের পালনীশক্তি দ্বারা বিভিন্ন সময়োপযোগী শক্তি প্রকাশ দ্বারা মহত্তর কাল পালন করেন।

দশাবতারে স্ফোটের রস প্রকাশ :—

১। মৎস্যদেব চিগ্নয়ী জুগুপ্সারতি হইতে জাত চিগ্নয়

বীভৎসরসের আশ্রয়স্বরূপ। ২। কুর্মেদেব চিগ্নয়ী
 বিস্ময়রতি হইতে জাত চিগ্নয় অদ্ভুতরসের আশ্রয়স্বরূপ।
 ৩। বরাহদেব চিগ্নয়ী ভয়রতি হইতে জাত চিগ্নয় ভয়ানক
 রসের প্রকাশমূর্তি। ৪। নৃসিংহদেব চিগ্নয়ী বাৎসল্যরতি হইতে
 জাত চিগ্নয় বাৎসল্যরসের প্রকাশমূর্তি। ৫। বামনদেব
 চিগ্নয়ী সখ্যরতি হইতে জাত চিগ্নয় সখ্যরসের প্রকাশমূর্তি।
 ৬। পরশুরাম চিগ্নয়ী ক্রোধরতি হইতে জাত চিগ্নয় রৌদ্ৰ-
 রসের প্রকাশমূর্তি। ৭। শ্রীরামচন্দ্র চিগ্নয়ী শোকরতি
 হইতে জাত চিগ্নয় করুণরসের প্রকাশমূর্তি। ৮। শ্রীবলদেব
 চিগ্নয়ী হাস্যরতি হইতে জাত চিগ্নয় হাস্য রসের প্রকাশমূর্তি।
 ৯। বুদ্ধদেব চিগ্নয়ী শান্ত রতি হইতে জাত চিগ্নয় শান্তরসের
 প্রকাশমূর্তি। ১০। কঙ্কিদেব চিগ্নয়ী উৎসাহ রতি হইতে
 জাত চিগ্নয় বীররসের প্রকাশমূর্তি। এখানে ফোটে'র বিশুদ্ধ
 রসপ্রকাশে বিষয়াশ্রয়ের বিপর্যায় দেখা যায়, কিন্তু অখিল-
 রসামৃতমূর্তি শ্রীকৃষ্ণে বিষয়াশ্রয়ের কোন প্রকার বিপর্যায়
 না থাকায় সুষ্ঠুভাবে রসবৈচিত্রী প্রকাশিত। তন্মধ্যে প্রকাশ
 তারতম্য বিচারে আশ্রয়ের ভাবকে লক্ষ্য করিয়া প্রকাশ
 তারতম্য লক্ষিত হয়।

বৈকুণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমূর্তি শ্রীনারায়ণে আড়াইটি
 মূখ্য রসের প্রকাশ থাকায় তথা হইতে প্রকাশিত ফোটে'র
 নামাবতারেও আড়াইটি রস প্রকাশিত হইয়া সত্য-
 যুগের তারকব্রহ্ম নামরূপে প্রকটিত হন যথা—“নারায়ণপরা
 বেদা নারায়ণপরাক্ষরাঃ। নারায়ণপরা মুক্তির্নারায়ণপরা

গতিঃ। ইহাতে ফোটের বহিঃফোট প্রকাশক বেদ ও অক্ষর নারায়ণপর এবং তাহার ফলপ্রদায়িনী শক্তি ও মুক্তি ও পরাগতি নারায়ণ পর্য্যন্ত। তথায় ঐশ্বর্য্যগত পরব্রহ্মের এই অবস্থায় শুদ্ধ শান্ত ও কিঞ্চিৎপরিমাণে দাস্ত্রের প্রকাশ দেখা যায়। তৎ পরযুগে (ত্রেতায়) “রাম নারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন। কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন ॥” উক্ত নাম সকলে নারায়ণের বিবিধ বিক্রম সকলের বিষয় সূচিত হইয়াছে। ইহাতে ফোটের সম্পূর্ণ দাস্ত্ররস ও কিয়ৎপরিমাণে সখ্যের আভাস প্রকাশিত হইয়াছে। তৎপরে ফোটের আর একটু বেশী রসের প্রকাশ দ্বাপর যুগের নামে দেখা যায়। “হরে মুরারে মধুকৈটভারে গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে। যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণে নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ ॥” ইহাতে নিরাশ্রিত জনের আশ্রয়রূপ কৃষ্ণকে লক্ষ্য করিতেছে। ইহাতে শান্ত, দাস্ত্র, সখ্য ও বাৎসল্য এই চারিটি রসের প্রবাল্য দৃষ্ট হয়। কলিযুগে সেই ফোট পরিপূর্ণরূপে স্কুরিত হইয়া সর্ব্বাপেক্ষা মাধুর্য্যপর নাম-মন্ত্ররূপে প্রকাশিত হইয়াছে— “হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥” ইহাতে প্রার্থনা নাই। মমতায়ুক্ত সমস্ত রসের উদ্দীপকতা দৃষ্ট হয়। ফোটের কোন প্রকার বিক্রম বা মুক্তিদাতৃত্বের পরিচয় নাই। কেবল আত্মা পরমাত্মা কর্তৃক ফোটশক্তিকর্তৃক কোন প্রেমসূত্রে আকৃষ্ট আছেন, ইহাই মাত্র ব্যক্ত আছে। ইজ্যা, ব্রত, অধ্যয়নাদি সমস্ত ফোটের পারমার্থিক অনুশীলন প্রক্রিয়া ইহার অন্তর্গত।

সকল শক্তি, সাধন ও সাধ্যকে ক্রোড়ীভূত করিয়া পরমস্বতন্ত্র-রূপে সর্বোপরি বিরাজমান। গুরূপদেশ, পুনশ্চরণ এবং দেশ কাল পাত্রানুগত কোন প্রকাশ সাধন চেষ্টাকে অপেক্ষা করেন না। বা উক্ত কোন প্রকাশ বিরুদ্ধ ব্যাপারও প্রতিহত করিতে পারে না। জীবের প্রাকৃত দেহ ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্বময় নাম-রূপ-গুণ-লীলা অনুভূত হয় না। কৃষ্ণ কৃপা করিয়া সেই সেই তত্ত্ব জীবের মঙ্গলের জন্য প্রত্যগ্ভাবে এই জগতে উদয় করাইয়াছেন। প্রত্যগ্ভাবেই চিদৃত্ত্বের স্বপ্রকাশভাব। নামরূপ কলিকা স্বল্প স্ফুট হইতেই কৃষ্ণাদি মনোহর চিন্ময়-রূপ বিকশিত হয়। পুষ্পের সৌরভের ন্যায় স্ফুটিত কলিকায় কৃষ্ণের চতুঃষষ্টি গুণসৌরভ অনুভূত হয়। নাম-কুসুম পূর্ণ প্রস্ফুটিত হইলে কৃষ্ণের অষ্টকাল চিন্ময় নিত্য-লীলা প্রকৃতির অতীত হইয়াও জগতে উদিত হন। ইহাই জীবের চরম সাধ্য ও সাধনা। ইহাই ফোটার চরম প্রস্ফুটিত প্রকাশ।

শ্রীরামচন্দ্রের প্রকাশে রসের সাড়েতিনটীর স্ফুরণ দেখা যায় শান্ত, দাস্ত, সখ্য ও গৌরবমিশ্র অসম্প্রকাশিত বাৎসল্য। তথায় নীতির দ্বারা বাৎসল্য রসকে সম্প্রকাশিত হইতে দেয় নাই। তদপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা লীলায় বাৎসল্যের বিষয়াশ্রয়ের বৈপরীত্য ভাবে প্রকাশিত। তথায় সেই বাৎসল্য প্রজাতে আশ্রয়ভক্তিরস রূপে এবং পুত্র-পৌত্রাদিতে প্রশ্রয় ভক্তিরসরূপ ধারণ করিয়াছে। তদপেক্ষা মথুরায় বাৎসল্যরস বিষয়াশ্রয়ের সুষ্ঠু সমাবেশ থাকায় অধিকতর সুষ্ঠু

প্রকাশিত হইলেও বিধিবাধ্যরূপ কারাগারে আবদ্ধ হইতে হইয়াছে। তথা হইতে ব্রজে সেই রস মধুররসসম্বিত বিষয়ে পরিপূর্ণতম আশ্রয়ে সমাবিষ্ট হইয়া পরিপূর্ণতম স্ফুটিত হইয়া প্রকাশিত। দ্বারকায় যে মধুর রসের প্রকাশ তাহাতে বৈধীভাবাচ্ছন্ন থাকায় শুদ্ধ মাধুর্য্য প্রকাশক না হওয়াতে দাস্ত্র ও সখ্য রসেরই প্রবল্য লক্ষিত হয়। ব্রজেই মধুর রসের পরিপূর্ণতম প্রকাশ পরাকাষ্ঠার স্ফুর্ভি।

ভাঃ ১০।৪৩।১৭ শ্লোকে মথুরায় শ্রীকৃষ্ণে যে দ্বাদশ রসের প্রকাশের কথা বর্ণিত আছে তাহাতে—মল্লগণের নিকট ‘রৌদ্ররসের’। উপস্থিত নরগণ—বিস্ময়রতির ‘অদ্ভুতরসের’। যুবতীগণ ‘শৃঙ্গাররসের’। শ্রীদামাদি গোপগণ—‘সখ্য ও হাস্য রসের’। অসংরাজগণ—‘বীররসের’। দেবকী বশুদেবাদি—‘বাৎসল্য ও করুণরসের’। কংসাদি—‘ভয়ানক বা ভয় রসের’। অজ্ঞ ব্যক্তিগণ—‘বীভৎস রসের’। যোগিগণ—‘শান্ত রসের’। যত্নগণ—‘দাস্ত্র রসের’। কিন্তু পরিপূর্ণতম প্রকাশ ব্রজে। তন্মধ্যে প্রকাশ পরাকাষ্ঠা তারতম্যে গোকুল, বৃন্দাবন, গোবর্দ্ধন ও শ্রীরাধাকুণ্ডে সম্প্রকাশিত। ফোটের পরিপূর্ণতম প্রকাশ পরাকাষ্ঠা তারতম্য শিরোমণি ও সর্ব্বরসের পরিপূর্ণতম অভিব্যক্তি শ্রীরাধাকুণ্ডেই স্ফুর্ভি-প্রাপ্ত।

তৃতীয় ক্রম

(পরাবাস্তবরূপে ফোটের প্রকাশ)

শ্রীনৃসিংহ—ফোটাধার শ্রীনৃসিংহদেবের হৃদয়ে সম্বিদ্-

শক্তিরূপা ফোটে বিরাজমানা ও শ্রীমুখে বাগাধিষ্ঠাত্রী শ্রীসরস্বতী-
দেবী নিত্য বিরাজমানা থাকিয়া ফোটে বিলাস সেবায় তৎপর।
ফোটেবিলাসবিরোধী যত প্রকার বাধাবিন্ম ও প্রতিকূল ভাব-
সকল হইতে রক্ষা করিতে তিনি মহাশক্তি সম্পন্ন। শুধু যে
তিনি প্রতিকূলভাব সকল বর্জনেই মহাশক্তির প্রকাশ করেন,
তাহা নহে; পরন্তু অনুকূলভাবে চেতনের প্রকৃষ্ট-আহ্লাদ
প্রদানে ভক্ত-ভগবানের ফোটেবিলাস সেবায়ও মহাকৃপা
প্রসারক। মাতৃচক্রে প্রমথন, হিরণ্যকশিপু প্রমথন, মার্জ্জাররূপ-
ধারণাদিরূপে ভক্তরক্ষা তৎপর।

শ্রীরাামচন্দ্র—ফোটে বিলাস বিরোধী কামাতুরতা ও
নির্বিশেষ বাদ হইতে রক্ষ কুলহস্তা লীলাদ্বারা ফোটে বিলাস
মাহাত্ম্য-প্রকাশক মহাধনুর্ধর অবতার। ধনুর্বানে ফোটে
শক্তিংশ প্রকাশ-দ্বারা ফোটে শক্তিবৈচিত্র্য বিষ্কারক।
গুরুভার প্রস্তরাদিকেও ফোটে শক্তিপ্রভাবে জলোপরি ভাসমান
ক্ষমতা প্রকাশকারী। সমুদ্রাদি জড়বস্তুর মধ্যেও যে
তদধিষ্ঠাত্রীর ক্রিয়া আছে ফোটে-শক্তিতে তাহারও
প্রকাশকারী। নীচ-মনুষ্যজাতিতেও ফোটে ভক্তিশক্তি
বিস্তারকারী। মনুষ্যেতর বানর পশু-পক্ষীর (সঙ্কুচিত
চেতনেও) ফোটে ভক্তিশক্তির প্রকাশকারী। জড়ীয়
ধনুর্বানে ফোটে মন্ত্রশক্তির অদ্ভুত শক্তিমত্ততা ও বিভিন্ন
মহাশক্তি প্রকাশ ক্ষমতার বিস্মুরক অবতার। ফোটে রস-
প্রকাশরূপ স্বরূপস্থ ভাবেরও রসচতুষ্টিয়ের শান্ত, দাস্ত, সখ্য ও
বাৎসল্য (কিঞ্চিৎ) আশ্বাদক অবতার। ফোটে অপ্রাকৃত

নীতিবাদের সমর্থনে বৈকুণ্ঠের অধোক্ৰম তত্ত্ব অপেক্ষা উন্নতভাব মাধুর্য্যের ও করুণরসের শোকরতির বৈশিষ্ট্য রসপ্রকাশক অবতারণা।

শ্রীবলদেব—ফোটের বল-প্রকাশক মহাশক্তিমানত্ব সন্ধিনীশক্তিমত্ত্ব বিগ্রহ। ফোটের অপ্রাকৃত হাশ্বরসের বিলাস বিস্ফারক। ব্রহ্মবাদীদিগের ব্রহ্মতত্ত্বে আত্মার লয় অর্থাৎ সম্পূর্ণ সাযুজ্যরূপ মোক্ষানুসন্ধানটী নিতান্ত আত্মচৌর্য্য-রূপ দোষবিশেষ; যেহেতু তাহাতে কিছুমাত্র আনন্দ নাই। তাহাতে জীবেরও কোন লাভ নাই এবং ব্রহ্মেরও কোন প্রকার উদ্দেশ্য সাধন হয় না। ঐ মত বিশ্বাস করিতে গেলে সমস্ত সৃজ্য জগৎকে মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়; ব্রহ্মে সম্পূর্ণ উদাসীনতা আরোপ করিয়া তাঁহার সত্তার প্রতি ক্রমশঃ সংশয় উৎপন্ন হয়, গাঢ়রূপে আলোচনা করিলে জীবসত্তার নাস্তিত্ব এবং একটি অমূলক অবিচার কল্পনা করিতে হয় এবং বস্তুতঃ সমস্ত মানব-চেষ্টা ও বিচার নিরর্থক হইয়া পড়ে। ঐ মতটী সময়ে সময়ে বৈষ্ণবদিগের মধ্যে প্রলম্বাসুররূপে প্রবেশ করত আত্মচৌর্য্যরূপ অনর্থের বিস্তার করে, ইহা ফোটের নামভজন-কারীর প্রীতিতত্ত্বের মহাপ্রতিবন্ধক। স্ত্রীলাম্পট্য, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাশাদিরূপে স্বরূপপ্রকাশকারী। প্রলম্বাসুর শ্রীকৃষ্ণ-বলরামকে মারিবার জন্ত কংসরূপ নির্বিশেষ-বাদের সখা-রূপে প্রেরিত হইয়া ভক্ত গোপসখারূপ ধারণ করিয়া ক্রীড়ারত হইয়াছিল। খেলায় হারিয়া বলদেবকে গোপনে কৃষ্ণের অসাক্ষাতে লইয়া মারিবার উদ্দেশ্যে

গোপনীয় স্থানে লইতেছিল। শ্রীবলদেব তাহা জানিতে পারিয়া তাহাকে বধ করেন। প্রলম্বাসুর—কপটতা, ধর্মের নামে গোপনে ব্যাভিচার, অর্থ-সংগ্রহ, কপটতাক্রমে সাধুত্ব প্রচারাদি প্রলম্বাসুরের কৃত্য। অভক্ত প্রলম্বাসুর ভক্তের সজ্জা লইয়া বলদেবকে সংহার করিয়া কংসের উপকার করিতে প্রয়াসী। তাহাতে হাসুরসের উদয় হয়। যাহার যে ক্ষমতা নাই, তাহা প্রকাশের চেষ্টায় হাসুরসের উদয় হয়। যাহাদের গুরুত্ব নাই, তাহারা যদি গুরুর আসনে আসীন হইয়া গুরুগিরি করিতে যান, তাহাতে হাসুরসের উদয় হয়। শ্রীবলদেব সেই সকল (স্বরূপ জ্ঞানবিরোধি) ফোটে বিরোধী-ভাব সকলকে কৃপা পূর্বক সংহার করিয়া হাসুরসেই শ্রীফোটের প্রকাশ করেন।

ধেনুকাসুর—বৈষ্ণবতত্ত্বে সূক্ষ্মবুদ্ধির নিতান্ত প্রয়োজন। যাহারা সম্প্রদায় কল্পনা করিয়া অখণ্ড বৈষ্ণবত্বকে খণ্ড খণ্ড করিয়া প্রচার করেন তাহারা স্থূলবুদ্ধি। ঐ স্থূলবুদ্ধি গর্দভস্বরূপ ধেনুকাসুর। মিষ্ট তাল ফল গর্দভ স্বয়ং খাইতে পারে না, অথচ অপর লোকে খাইবে—তাহাতেও বিরোধ করে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবদিগের পূর্বাচার্য্য মহোদয়গণ কর্তৃক যে সকল পরমার্থ-গ্রন্থ রচিত আছে, স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তিগণ তাহা নিজে বুঝিতে পারে না এবং অপরকে দেখিতে দেয় না। বিশেষতঃ ভারবাহী বৈধ, ভক্ত সকল স্থূলবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া উচ্চাধিকারের যত্ন পান না। কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম্ম অনন্ত-উন্নতি

গর্ভ থাকায়, বৈধকাণ্ডে যাঁহারা আবদ্ধ থাকিয়া রাগতত্ত্বের অনুভব করিতে যত্ন না পান, তাঁহারা সামান্য কর্মকাণ্ডে প্রিয় জনগণের তুল্য হইয়া পড়েন। অতএব গর্দভরূপী ধেনুকাসুর বধ না হইলে বৈষ্ণবতত্ত্বের উন্নতি হয় না। অনেক দুর্বল-চিত্ত পুরুষেরা বিধিমাগ্নি ত্যাগ করত রাগমাগ্নি প্রবেশ করেন। তাঁহারা অপ্ৰাকৃত আত্মগত রাগকে উপলক্ষি করিতে না পারিয়া বিষয় বিকৃত রাগের অনুশীলনে বৃষভাসুরের আচরণ করিয়া ফেলেন। তাঁহারা কৃষ্ণতেজে হত হইবেন। এই প্রতিবন্ধকের উদাহরণ স্বেচ্ছাচারী ধর্মধ্বজী দিগের মধ্যে প্রচুর লক্ষিত হয়। যাঁহারা পবিত্র ব্রজভাবগত হইয়া কৃষ্ণানন্দ সেবা করিবেন, তাঁহারা বিশেষ যত্ন পূর্বক প্রতিবন্ধক দূর করিবেন। জীবের শুদ্ধ ভাবগত প্রতিবন্ধক গুলি যথা— স্ব-স্বরূপ, নাম স্বরূপ ও উপাস্যস্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞান ও অবিজ্ঞা তাহাই ধেনুকাসুর। দৈন্য সবল হইলে অবশ্য কৃষ্ণকুপা হয়। তাহা হইলে বলদেব ভাবের আবির্ভাবে উহারা ক্ষণেকেই নষ্ট হয়।

ফোট প্রকাশার্থ ভগবদ্-দাস্ত্রভূষিত বিশুদ্ধ জীবতত্ত্ব জ্ঞানাস্রয়ময় চিত্তরূপ দেবকীদেবীতে প্রথমোদয়, কিন্তু কংসের দৌরাত্ম্যকার্য্য আশঙ্কা করিয়া ব্রজ মন্দিরে গমন করেন। তথায় বিশ্বাসময় ধাম ব্রজপুরী প্রাপ্ত হইয়া শ্রদ্ধাময় চিত্ত রোহিণীর গর্ভে প্রবেশ করেন। ইহার পরেই জীবহৃদয়ে ভগবদ্ভাব উদ্ভিত হয়। তথায় নানাভাবে ফোট প্রকাশ সেবা বিস্তার করেন। নিরীশ্বর প্রমোদরূপ দ্বিবিধ-বানর কৃষ্ণ-

প্রেমময় শুদ্ধ বলদেব কর্তৃক নিহত হয়। জীব-সম্বিন্দিত্তি ধামে বৃহদ্বানের মধ্যে ভাবরূপা গোপীদিগের সহিত বলদেব প্রেমলীলা করেন। জ্ঞানাদিকারী মথুরা দোষ সকল, কস্মা-ধিকারী দ্বারকাগত দোষসকল ও ভক্তগণ ব্রজদূষক প্রতিবন্ধক সকল দৈন্ত্রভরে শ্রীবলদেবের কুপায় সময়ে দূর করিলে ফোটা-কুপা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবেন।

চতুর্থ ক্রম

শ্রীকৃষ্ণ—ব্রহ্মজ্ঞান বিভাগরূপ মথুরায়, বিশুদ্ধসত্ত্বরূপ বসুদেবের অধিষ্ঠান। তিনি নাস্তিক্যরূপকংসের মনোময়ীভগিনী দেবকী দেবীকে বিবাহ করিলেন। কংস ঐ দম্পতি হইতে ভগবদ্-ভাবের উৎপত্তি আশঙ্কা করিয়া স্মৃতিরূপ কারাগারে আবদ্ধ করিলেন। তথায় তাঁহাদের যশ কীর্ত্তি প্রভৃতি ছয়টি পুত্র ক্রমশঃ উৎপন্ন হয়, কিন্তু দীর্ঘ-বিরোধী কংস তাহাদিগকে বাল্যকালেই হনন করেন। ভগবদ্ দাশভূষিত বিশুদ্ধ-জীবতত্ত্ব বলদেব তাঁহাদের সপ্তম পুত্র। তাহার অব্যবহিত পরেই ভগবদ্ভাব জীব হৃদয়ে উদ্ভিত হয়। নাস্তিক্যনাশরূপ কংসবধ ইচ্ছা করিয়া মহাবীর্যশালী ফোটাগ্নক ভগবান্ প্রাচুর্ভূত হন। চিচ্ছিত্তিগত সন্ধিনী-নির্মিত ব্রজভূমিতে ভগবান্ স্ব-স্বরূপে (শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে) নীত হইলেন। সেই ভূমির ভিত্তিমূল বিশ্বাস। জীবের যুক্তি-বিভাগে বা জ্ঞানবিভাগে ঐ ভূমি থাকে না কিন্তু বিশ্বাস বিভাগেই তাঁহার অবস্থান হয়। জ্ঞান বা বৈরাগ্য তথায় দৃশ্য হয় না। আনন্দমূর্ত্তি নন্দগোপ তথায় অধিকারী। এতন্ত্বে জাতির উচ্চত্ব বা নীচত্ব বিচার নাই। এই জন্মই ফোটার আনন্দমূর্ত্তি

গোপত্বে লক্ষিত হইয়াছেন। বিশেষতঃ গোচারণ ও গোরক্ষণ এবং অনৈশ্বর্যাত্মক মাধুর্য্যত্বও লক্ষিত হয়। উল্লাসরূপিণী নন্দপত্নী যশোদা, যে অপকৃষ্টতত্ত্ব মায়াকে প্রসব করেন তাহা ব্রজ হইতে বসুদেব কর্তৃক নীত হইল। পরানন্দধাম চিন্তায় বদ্ধজীবের পক্ষে যে মায়িক ভাব অনিবার্য্য, তাহা শ্রীকৃষ্ণাগমনে দূরীকৃত হইল। বিশুদ্ধপ্রেম-সূর্য্যকিরণসমূহ পরিপূরিত গোকুলে শুদ্ধ-জীবতত্ত্বরূপ রামের সহিত অচিন্ত্য ভগবত্তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধি পাইতে লাগিলেন। নাস্তিক্যরূপ কংস শ্রীকৃষ্ণকে বিনাশ করিবার বাসনায় বালঘাতিনী পূতনাকে ব্রজে প্রেরণ করিলেন। মাতৃস্নেহ ছলনা করিয়া পূতনা কৃষ্ণকে স্তম্ভদান করিয়া কৃষ্ণতেজে নিহত হইল। ধাত্রীচ্ছলে পূতনার ব্রজে আগমন রাগমার্গগত ভক্তগণের ছুষ্ঠগুরুরূপ ফোট প্রকাশের প্রথম প্রতিবন্ধক। গুরু দুইপ্রকার—অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ। সমাধিস্থ আত্মাই আত্মার অন্তরঙ্গ গুরু। “আত্মনো গুরুরাগ্নৈব পুরুষস্য বিশেষতঃ। যৎপ্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং শ্রেয়োহসাবহু-বিন্দতে ॥ (ভাঃ ১১।৭।২০)। যিনি যুক্তিকে গুরু বলিয়া তাহার নিকট উপাসনা শিক্ষা করেন, তিনি ছুষ্ঠ গুরু আশ্রয় করিয়াছেন। নিত্যধর্ম্মের পোষকরূপে যুক্তির ছলনা, পূতনার ছলনার সহিত তুলনা করা যায়। রাগমার্গের উপাসকগণ পরমার্থতত্ত্বে যুক্তিকে বিসর্জন দিয়া আত্মসমাধিকে আশ্রয় করিবেন। যে মনুষ্যের নিকট উপাসনাতত্ত্ব শিক্ষা করা যায়, তিনি বহিরঙ্গ গুরু। যিনি রাগমার্গ অবগত হইয়া শিষ্যের অধিকার বিচারপূর্ব্বক পরমার্থ উপদেশ করেন, তিনি সদগুরু।

যিনি নিজে রাগমার্গ অবগত নহেন অথচ উপদেশ করেন, অথবা রাগমার্গ অবগত হইয়াও শিষ্যের অধিকার বিচার না করিয়া কোন উপদেশ করেন, তিনি ছুষ্ঠ গুরু, তাঁহাকে অবশ্য বর্জন করিতে হইবে। কৃতক্ৰম ই দ্বিতীয় প্রতিবন্ধক। ব্রজে বাত্যরূপ তৃণাবর্ত বধ না হইলে ভাবোদগম হওয়া কঠিন। দার্শনিক, বৌদ্ধ ও যুক্তিবাদীদিগের সমস্ত তর্কই ব্রজভাব সম্বন্ধে তৃণাবর্তরূপ প্রতিবন্ধক। ভগবদ্ভাবের প্রভাবে তর্করূপ তৃণাবর্ত প্রাণ ত্যাগ করিবে।

যাঁহারা বৈধপর্বেঁর সার অবগত না হইয়া তাহার ভারবহনে তৎপর, তাঁহারা রাগানুভব করিতে পারেন না। অতএব ভারবাহিত্বরূপ বুদ্ধিমর্দক শকটভঙ্গ ভগবৎ কর্তৃক নিহত হইলে তৃতীয় প্রতিবন্ধক দূর হয়। ছুষ্ঠগুরুগণ রাগাধিকার বিচার না করিয়া অনেক ভারবাহী জনগণকে মঞ্জরী-সেবন ও সখীভাব-গ্রহণে উপদেশ দিয়া পরমতত্ত্বের অবহেলারূপ অপরাধ করায় পতিত হইয়াছেন। যাঁহারা ঐ সকল উপদেশমতে উপাসনা করেন, তাঁহারাও পরমার্থতত্ত্ব হইতে ক্রমশঃ দূরে পড়িয়া থাকেন, যেহেতু ঐ সকল আলোচনায় আর গম্ভীর রাগের লক্ষণ প্রাপ্ত হন না। সাধুসঙ্গ ও সত্বপদেশ ক্রমে তাঁহারা পুনরায় উদ্ধার পাইতে পারেন। ভগবৎ কর্তৃক উক্ত শকট ভঙ্গ হইয়া থাকে।

মুখব্যাদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ জননীকে মুখমধ্যে সমস্ত জগৎ দেখাইলেন। জননী চিচ্ছক্তিগত রতিপোষিকা অবিচ্ছিন্ন দ্বারা মুগ্ধ থাকায় কৃষ্ণেশ্বর্য্য মানিলেন না। চিদ্ভিলাসগত ভক্তগণ ভগবন্মাধুর্য্যে এতদূর মুগ্ধ থাকেন যে, ঐশ্বর্য্য সত্ত্বেও

তাহা তাঁহাদের নিকট প্রতীত হয় না। এ অবিজ্ঞা মায়াভাগত নয়। কৃষ্ণের বালচাপল্য (চিন্তা-নবনীত চৌর্য্য) দেখিয়া উল্লাসরূপিণী যশোদা রজ্জুদ্বারা কৃষ্ণকে বন্ধন করিবার জন্ম বুধা যত্ন পাইলেন। যাঁহার মায়িক পরিমাণ নাই, তাঁহাকে কেবল প্রেমসূত্রের দ্বারা যশোদা বন্ধন করিয়াছিলেন। মায়িক রজ্জুদ্বারা তাঁহার বন্ধন সিদ্ধ হয় না। কৃষ্ণের বাললীলাক্রমে দেবপুত্রদ্বয়ের বাক্যভাব হইতে অমায়াসে বন্ধচ্ছেদ হইল। ইহাতে দুইটি তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। সাধুসঙ্গে ক্ষণমাত্রেই জীবের বন্ধ-মোক্ষ হয়, এবং অসাধু-সঙ্গে দেবতারাও কুকর্মেবশ হইয়া জড়তা-প্রাপ্ত হন।

সখাদিগের সহিত বালরূপী কৃষ্ণ গোবৎস চারণার্থে কাননে প্রবেশ করেন অর্থাৎ চিচ্ছক্তিগত অবিজ্ঞামুক্ত শুদ্ধ জীবসকল নিষ্ঠাক্রমে গোবৎসত্ব প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বাধীন হন। গোচারণ স্থলে বালদোষরূপ বৎসাসুর বধ হয়। ইহাই চতুর্থ প্রতিবন্ধক। কংসপালিত ধর্ম্মকাপট্যরূপ মহাধূর্ত্ত বকাসুর পঞ্চম প্রতিবন্ধক। ইহাকেই নামাপরাধ বলে। যাহারা অধিকার বুঝিতে না পারিয়া ছুষ্ঠ গুরুর উপদেশে উচ্চাধিকারের উপাসনা লক্ষণ অবলম্বন করিয়াছে, তাহারা প্রবঞ্চিত ভারবাহী, কিন্তু যাহারা স্বীয় অনধিকার অবগত হইয়াও উচ্চলক্ষণ অবলম্বন করিয়া সম্মান ও অর্থসঞ্চয়কে উদ্দেশ করে তাহারাই রূপট। ইহা দূর না করিলে রাগোদয় হয় না। সম্প্রদায়লিঙ্গ ও উদাসীন লিঙ্গদ্বারা তাহারা জগৎকে বঞ্চনা করে। কংসপালিত ধর্ম্মকাপট্যরূপ বকাসুর, শুদ্ধবুদ্ধ

কৃষ্ণ কৰ্ত্ত্বক নিহত হয়। ঐ সকল দাস্তিকদিগের বাহুলিঙ্গ দেখিয়া যে সকল লোকেরা আদর করেন, তাঁহারা কৃষ্ণপ্ৰীতি-অনাপ্তির হেতু হইয়া জগতের কণ্টক হন। জ্ঞাতব্য এই যে,— বাহুলিঙ্গের প্রতি বিদ্বেষ পূৰ্ব্বক তৎস্বীকৰ্ত্তা কোন সারপ্রাহীর অনাদর না হয়। অতএব বাহুলিঙ্গের প্রতি উদাসীন থাকিয়া প্ৰীতিলক্ষণ অন্বেষণ করত সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবা করা বৈষ্ণব-দিগের নিয়ত কৰ্ত্তব্য। নৃশংসত্ব ও প্রচণ্ডরূপ অঘাসুরই ষষ্ঠ প্রতিবন্ধক। সৰ্ব্বভূত দয়ার অভাবে রাগের ক্রমশঃ লোপ-সম্ভাবনা কেন না দয়া কখনই রাগ হইতে ভিন্নবৃত্তি হইতে পারে না। জীব-দয়া ও কৃষ্ণভক্তির সত্তার ভিন্নতা নাই। নৃশংসতাস্বরূপ অঘ নামা সৰ্প মর্দিত হইল। তদন্তে ভগবান্ সরলতারূপ একত্র পুলিন ভোজন আরম্ভ করিলেন। ইত্য-বসরে সমস্ত জগতের বিধাতা চতুর্বেদ-বক্তা চতুমুখ কৃষ্ণের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া গোপবালক ও গোবৎস সকল চুরি করিলেন। ইহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পরমমাধুর্য্যে সম্পূর্ণ প্রভুতা প্রদর্শিত হইল। গোপাল হইয়াও জগদ্বিধাতার উপর পূর্ণপ্রভাব দেখাইলেন। চিজ্জগতের অতিপ্রিয় কৃষ্ণ কোন বিধির বাধ্য নহেন। ব্রহ্মা গোপবালক সকল ও গোবৎস সকল হরণ করিলে ভগবান্ অপহৃত সকলকেই স্বয়ং প্রকাশ করিয়া অনায়াসে চালাইতে লাগিলেন। চিজ্জগৎ ও অচিজ্জগৎ সমস্ত বিনষ্ট হইলেও কৃষ্ণেশ্বর্য্য কখনই কুণ্ঠিত হয় না। যিনি যতদূরই সমর্থ হউন, শ্রীকৃষ্ণ সামর্থ্য লঙ্ঘন করিতে কেহই পারেন না। নানাপ্রকার মতের নানা-প্রকার তর্ক ও বিচারশাস্ত্রে বিশেষরূপ চিন্তাভিনিবেশ করিলে

সমাধিপ্ৰাপ্ত সত্য সমুদয় বিলীন প্রাপ্ত হয়। ইহাকে বেদবাদ-জনিত মোহ বলে। ঐ মোহকর্তৃক মুক্ত হইয়া ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বে সন্দেহ করিয়াছিলেন। ঐ প্রকার মোহ সপ্তম প্রতিবন্ধক। ধেনুকাসুর অষ্টম প্রতিবন্ধক। উহা শ্রীবলদেব কর্তৃক নিহত হয়। কালিয় সপ্তরূপ খলতা বৈষ্ণবদিগের চিদ্রবতারূপ যমুনাকে সর্বদা দূষিত করে, ইহা নবম প্রতিবন্ধক, ভগবান্ লাঞ্ছনা করিয়া দূরীভূত করেন। দাবানলরূপ দশম প্রতিবন্ধক—সম্প্রদায় বিরোধ। সম্প্রদায় বিরোধ-ক্রমে, নিজ সম্প্রদায় লিঙ্গ ধারণ ব্যতীত কাহাকেও বৈষ্ণব বলিয়া স্বীকার করিতে না পারায়, যথার্থ সাধুসঙ্গ ও সৎগুরু প্রাপ্তিতে অনেক ব্যাঘাত হয়। উক্ত ভয়ঙ্কর দাবানলকে ব্রজধাম রক্ষার্থ ভগবান্ ভক্ষণ করেন। নাস্তিক্য-রূপ কংসের প্রেরিত প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত মায়াবাদ-স্বরূপ জীব-চৌর ছুষ্ট প্রলম্বাসুর শ্রীবলদেব কর্তৃক নিহত হয়।

মধুর রসস্থ দ্রবতার অধিক্য প্রযুক্ত তদগত প্রীতিকে প্রার্বট্‌কালের সহিত সাম্যবোধে কথিত হইল যে, প্রীতিবর্ষা উপস্থিত হইলে ভাবান্বিতা হরিপ্রিয়া গোপীগণ হরিগুণ গানে প্রমত্তা হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের বংশী গীতে ব্যাকুলা হইয়া ফোটেদের মহা-আকর্ষণী শক্তিতে গোপীগণ কৃষ্ণলাভেচ্ছায় ব্রজধামে যোগমায়া মহাদেবীর অর্চনা করিলেন। বৈকুণ্ঠতত্ত্বে মায়িক জগৎস্থিত জীবের চিহ্নিভাগে আবির্ভাবের নাম ব্রজ। ব্রজ-শব্দ—গমনার্থ সূচক। মায়িক জগতে আত্মার মায়া ত্যাগপূর্বক উর্দ্ধগমন অসম্ভব, অতএব মায়িক বস্তুর আনুকূল্য আশ্রয়-

পূর্বক তন্নির্দেশ্য অনির্বচনীয় তত্ত্বের অন্বেষণ করাই কর্তব্য। এতন্নিবন্ধন গোপিকাভাবপ্রাপ্ত জীবদিগের মহাদেবী যোগমায়া অর্থাৎ মায়াশক্তির বিচাররূপ অবস্থায় আশ্রয় পূর্বক বৈকুণ্ঠললনার সাহচর্য্য বর্ণিত হইয়াছে। যে সকল ব্যক্তির কৃষ্ণদাস্ত্রোচ্ছা অত্যন্ত বলবান্ তাঁহাদের স্বগত বা পরগত কিছুই গোপনীয় নাই। এই তত্ত্ব ভক্তদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য কৃষ্ণ গোপীদিগের বস্ত্রহরণ করিলেন। শুদ্ধসত্ত্বগত চিত্তই ভগবদ্ভতির অনাময় স্থান। তাহার আচ্ছাদন দূর করত প্রীতির অধিকার দর্শন করিলেন। গোচারণ করিতে করিতে মথুরার নিকটস্থ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদিগের নিকট অন্ন যাজ্ঞা করিলেন। জাত্যাভিমান বশতঃ ঐ ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞাদিকার্য্য শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া কৃষ্ণকে অন্ন দিলেন না। ইহার হেতু এই যে, বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বদা বেদবাদরত, যেহেতু তাঁহারা বেদের সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য বোধ করিতে না পারিয়া সামান্য কৰ্ম্ম ও জ্ঞানবাদ অবলম্বনপূর্ব্বক হয় কৰ্ম্মজড় হইয়া পড়েন, নয় আত্মজ্ঞান পরায়ণ হইয়া নিবিশেষ চিন্তায় মগ্ন হন। তাঁহারা শাস্ত্র ও পূর্ব্বপুরুষদিগের শাসনাধীনে থাকিয়া বিধিনিষেধের বাহক হইয়া পড়েন। সেই সকল অর্থ শাস্ত্রের চরম উদ্দেশ্য যে ভগবদ্ভতি তাহা তাঁহারা বুঝিতে সক্ষম হন না। অতএব তাঁহারা কি প্রকারে কৃষ্ণসেবক হইতে পারেন? এতদ্বারা একরূপ বুঝিতে হইবে না যে, সকল ব্রাহ্মণেরাই এইরূপ কৰ্ম্মজড় বা জ্ঞানপর। অনেক বিপ্রকুলজাত মহাপুরুষগণ ভগবদ্ভক্তির পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। অতএব তাৎপর্য্য এই

যে, বিধিবাহক অর্থাৎ ভারবাহী ব্রাহ্মণেরা কৃষ্ণবিমুখ, কিন্তু সারগ্রাহী বিপ্রগণ কৃষ্ণদাস ও সর্বপূজ্য। ভারবাহী ব্রাহ্মণ-গণের স্ত্রীগণ অর্থাৎ কোমলশ্রদ্ধ অনুগত লোকেরা বনে শ্রীকৃষ্ণ-নিকটে গমন করত পরমাত্মা কৃষ্ণের মাধুর্য্যাবশ হইয়া তাঁহাকে আত্মদান করিল। এই কোমলশ্রদ্ধ পুরুষেরাই সংসারী বৈষ্ণব। ইহা দ্বারা জীবগণের সমদর্শনরূপ তত্ত্ব নির্দিষ্ট হইল। কৃষ্ণ-প্রীতিসম্পন্ন হইবার জন্ম জাতিবুদ্ধির প্রয়োজন নাই। রবং সময়ে সময়ে ঐ বুদ্ধি প্রীতির প্রতিবন্ধক হইয়া পড়ে। উত্তমরূপে সমাজ রক্ষা করিবার জন্ম ভারতবর্ষে আর্য্যগণের মধ্যে বর্ণবিভাগ ও আশ্রম-বিভাগরূপ সামাজিক বিধি স্থাপিত হইয়াছে। সমাজ রক্ষিত হইলে সংসঙ্গ ও সদালোচনাক্রমে পরমার্থের পুষ্টি হয়। এতন্নিবন্ধন বর্ণাশ্রম সর্বতোভাবে আদরনীয়, যেহেতু তদ্বারা ক্রমশঃ শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি লাভ হইবার সম্ভাবনা আছে। অতএব এই সমস্ত অর্থগত ব্যবস্থার একমাত্র মূল তাৎপর্য্য পরমার্থ, যাহার অন্ততম নাম শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি। যদি এই সকল অর্থাবলম্বন না করিয়াও কাহারও পরমার্থলাভ ঘটে, তথাপি অর্থসকল অনাদৃত হইতে পারে না। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, উপেয় প্রাপ্ত হইলে উপায়ের প্রতি স্বভাবতঃ অনাদর হইয়া উঠে। উপেয়রূপ শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি যাঁহাদের লাভ হয় তাঁহারা গোণ উপায়রূপ বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা ত্যাগ করিলেও দোষী নহেন। অতএব অধিকার বিচার পূর্বক দোষগুণ নির্ণয় করাই সার-সিদ্ধান্ত।

সমাজ-সংরক্ষণ কৰ্ম্মের অধিষ্ঠাতা ভগবদাবির্ভাবের নাম যজ্ঞেশ্বর। তাঁহার জীব-প্রতিনিধির নাম ইন্দ্র। ঐ কৰ্ম্ম দুই প্রকার—নিত্য ও নৈমিত্তিক। সংসারযাত্রা-নিৰ্ব্বাহের জন্ম যাহা যাহা নিত্য কর্তব্য সেই সকল কৰ্ম্ম নিত্য, তদিতর সকল কৰ্ম্মই নৈমিত্তিক। বিচার করিয়া দেখিলে কাম্য কৰ্ম্ম-সকল নিত্য ও নৈমিত্তিকবিভাগে পর্য্যবসিত হয়। অতএব সকাম ও নিষ্কাম কৰ্ম্মসকল উদ্দেশ্যক্রমে বিচারিত হওয়ায় নিত্য নৈমিত্তিক বিভাগেই স্থাপিত হয়, বিভাগান্তরে লক্ষিত হয় না। কেবল শরীরযাত্রা-নিৰ্ব্বাহকরূপ নিত্যকৰ্ম্ম ব্যবস্থা করিয়া শ্রীকৃষ্ণভক্তদিগের সম্বন্ধে সমস্ত কৰ্ম্ম নিষেধ করিলেন। তাহাতে কৰ্ম্মপতি ইন্দ্র জগৎ-পুষ্টিকার্য্যসকল অনাদৃত হইল দেখিয়া বৃহত্পদ্রব উপস্থিত করিলেন। গোবর্দ্ধন অর্থাৎ নিরীহ জনের বর্দ্ধনশীল পীঠস্বরূপ ছত্র অবলম্বনপূর্ব্বক ভক্তদিগের আবশ্যকীয় সমস্ত বিষয় বর্ষণ ও প্লাবন হইতে ভগবান্ রক্ষা করিলেন। ভগবদ্-অনুশীলনকার্য্য-নিবন্ধন যদি মানবগণের জগৎ-পুষ্টিকার্য্যসকল কৰ্ম্মাভাবে নিবৃত্ত হয়, তাহাতে কৃষ্ণ-ভক্তদিগের কিছুমাত্র আশঙ্কা করা কর্তব্য নয়। কৃষ্ণ যাঁহাদের উদ্ধারকর্তা তাঁহাদিগকে কেহই নষ্ট করিতে পারে না, তাঁহাদের উপর কোন বিধির বিক্রম নাই। বিধিবন্ধন দূরে থাকুক, ভক্তদিগের প্রেমবন্ধন ব্যতীত আর কোনপ্রকার বন্ধন নাই। ভগবদ্ভক্তি অবলম্বন করিয়া কৰ্ম্মফলের আশায় দেবেন্দ্রাদি অশান্ত ক্ষুদ্র দেবতার পূজা করা বৈষ্ণবদিগের পক্ষে ত্রয়োদশ প্রতিবন্ধক। বিশ্বাসময় দেশে অর্থাৎ শ্রীবৃন্দা-

বনে চিদ্রবরুপিণী যমুনা নদী বহমান আছেন। নন্দরাজ তাহাতে মগ্ন হওয়ায় ভগবান্ লীলাক্রমে তাঁহাকে উদ্ধার করেন। জীবের নিরুপাধিক আনন্দকে নন্দ বলিয়া ব্রজে লক্ষ্য করা যায়। কোন কোন ভ্রান্ত ব্যক্তির ঐ আনন্দকে সম্বর্দ্ধন-করণাশয়ে মাদক সেবন করেন, তাহাতে আত্মবিস্মৃতি-রূপ বৃহদনর্থ ঘটয়া থাকে। নন্দের বরুণালয়-সংপ্রাপ্তিটি বৈষ্ণবগণের পক্ষে চতুর্দশ প্রতিবন্ধক। পরদ্রব্য হরণ ও মিথ্যা-ভাষণরূপ শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতিপর্যাপ্তি-সম্বন্ধে পঞ্চদশ প্রতিবন্ধক। উহা ব্যোমাসুররূপে ব্রজে উৎপাত করে। তদনন্তর ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র কৃপাপূর্বক গোপদিগকে নিজ ঐশ্বর্য্য বৈকুণ্ঠতত্ত্ব দর্শন করাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্য এত প্রবল যে, ঐশ্বর্য্য সমুদয় তাহাতে লুক্কায়িতরূপে থাকে, ইহাই প্রদর্শিত হইল।

রাসলীলা—নিত্যসিদ্ধগণ ও তাঁহাদের অনুগত জীবদিগের প্রিয় ভগবান্ প্রীতিতত্ত্বের পরাকাষ্ঠারূপ রাসলীলা সম্পন্ন করিলেন। অন্তর্দান-বিয়োগদ্বারা গোপিকাদিগের প্রেমাত্মক কাম সম্বর্দ্ধন করিয়া পরম কৃপালু ভগবান্ রাসচক্রে নৃত্য করিতে লাগিলেন। মায়াবিরচিত জড়াত্মক বিশ্বে একটা মূল ধ্রুবনক্ষত্র আছে। তাহার চতুর্দিকে সূর্য্যসকল স্ব স্ব গ্রহসহকারে ধ্রুবের আকর্ষণ বলে নিত্য ভ্রমণ করিতেছে। ইহার মূলতত্ত্ব এই যে, জড় পরমাণুসমূহে আকর্ষণ-নামা একটি শক্তি নিহিত আছে। ঐ শক্তিক্রমে পরমাণুসকল পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া একত্রিত হইলে বর্তুলাকার মণ্ডল নির্ম্মিত হয়। ঐ সকল মণ্ডল পুনশ্চ কোন বৃহদ্বর্তুলাকার মণ্ডল দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া

তচ্চতুর্দিকে ভ্রমণ করে। এইটী জড়জগতের নিত্যধর্ম। জড় জগতের মূলীভূত মায়া চিজ্জগতের প্রতিফলন মাত্র। চিজ্জগতে প্রীতিরূপ নিত্যধর্ম দ্বারা অণুচৈতন্য সকল পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া অপেক্ষাকৃত কোন উন্নত চৈতন্যের অনুগমন করে। ঐ সকল উন্নত চৈতন্য পুনরায় অধীন চৈতন্যগণ-সহকারে, পরমধ্রুবচৈতন্যরূপ শ্রীকৃষ্ণের রাসচক্রে অনুক্ষণ ভ্রমণ করিতেছে। অতএব বৈকুণ্ঠতত্ত্বে পরমরাসলীলা নিত্য বিরাজমান আছে। যে রাগতত্ত্ব চিদ্বস্ততে নিত্য অবস্থিতি করত মহাভাব পর্য্যন্ত প্রীতির বিস্তার করে, সেই ধর্মের প্রতিফলনরূপ জড়ীভূত কোন অচিন্ত্য ধর্ম আকর্ষণরূপে জড়-জগতে বিস্তৃত হইয়া উহার বৈচিত্রী সম্পাদন করিতেছে। এতন্নিবন্ধন, স্থূল দৃষ্টান্তদ্বারা সূক্ষ্মতত্ত্ব দর্শাইবার অভিপ্রায়ে কহিতেছেন যে, যেমত জড়াঙ্ক বিশ্বে সসূর্য্য গ্রহমণ্ডল সকল ধ্রুব নক্ষত্রের চতুর্দিকে আকর্ষণশক্তির দ্বারা নিত্য ভ্রমণ করে, তদ্রূপ চিদ্বিশ্বে শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণ-বলক্রমে শুদ্ধ জীবসকল, শ্রীকৃষ্ণকে মধ্যবর্তী করিয়া নিত্যকাল ভ্রমণ করেন। ইহাই স্ফোটের মহা-আকর্ষণী শক্তি। এই চিদ্গত মহারাসলীলায় কৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ এবং সমস্ত জীবগণই নারী। চিজ্জগতের সূর্য্যস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র একমাত্র ভোক্তা ও সমস্ত অণু-চৈতন্যই ভোগ্য। প্রীতিসূত্রে সমস্ত চিৎস্বরূপের বন্ধন সিদ্ধ হওয়ায়, ভোগ্যতত্ত্বের স্ত্রীত্ব ও ভোক্তৃত্বের পুরুষত্ব সিদ্ধ হইতেছে। জড়দেহগত স্ত্রী-পুরুষত্ব—চিদ্গত ভোক্তা ভোক্তৃত্বের অসং প্রতিফলন। সমস্ত অভিধান অন্বেষণ করিয়া এমত

একটী বাক্য পাওয়া যাইবে না, যদ্বারা চিৎস্বরূপদিগের পরম চৈতন্যের সহিত অপ্রাকৃত সংযোগ-লীলা সম্যক্ বর্ণিত হইতে পারে। এতন্নিবন্ধন মায়িক স্ত্রীপুরুষের সংযোগসম্বন্ধীয় বাক্য সকল তদ্বিষয়ে সর্ব্বপ্রকারে সম্যক্ ব্যঞ্জক বলিয়া ব্যবহৃত হইল। ইহাতে অশ্লীল চিত্তার কোন প্রয়োজন বা আশঙ্কা নাই। যদি অশ্লীল বলিয়া পরিত্যাগ করা যায়, তাহা হইলে আর ঐ পরতত্ত্বের আলোচনা সম্ভব হয় না। বাস্তবিক বৈকুণ্ঠগত ভাবনিচয়ের প্রতিফলনরূপ মায়িক ভাবসকল বর্ণন-দ্বারা বৈকুণ্ঠতত্ত্বের বর্ণনে অসমর্থ; তদ্বিষয়ে অণু উপায় নাই। যথা কৃষ্ণ দয়ালু, ইহা বলিতে হইলে মানবগণের দয়াকার্য্য লক্ষ্য করিয়া বলিতে হইবে। কোন রূঢ়বাক্যে ঐ ভাব ব্যক্ত করিবার উপায় নাই। অতএব অশ্লীলতার আশঙ্কা ও লজ্জা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, সারগ্রাহী আলোচকগণ মহারাসের পরমার্থ-তত্ত্ব অকুণ্ঠিতভাবে শ্রবণ, পঠন ও চিন্তন করিবেন। সেই রাসলীলার সর্ব্বোত্তম ভাব এই যে, সমস্ত জীবনিচয়ের পরমারাধ্যা কৃষ্ণমাধুর্য্য প্রকাশিনী হ্লাদিনী-স্বরূপা শ্রীমতী রাধিকা ভাবরূপা সখীগণে বেষ্টিতা হইয়া রাস মধ্যে পরম-শোভমানা হইয়েন। এই শ্রীরাধাকৃষ্ণ তত্ত্বই মূল স্ফোটতত্ত্ব-অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব। সকল শক্তি-প্রকাশাদি এই স্ফোটেরই প্রকাশ, শক্তি ও কার্য্য। রাসলীলার পরে চিদ্ভবময়ী যমুনার জল-ক্রীড়া স্বভাবতঃ হইয়া থাকে।

নন্দ-স্বরূপ আনন্দ, নির্ব্বাণমুক্তিরূপ সর্পগ্রস্ত হইলে, ভক্তরক্ষক শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার আপদ্ মোচন করেন। উপাসনা-

কার্য্যে বৈষ্ণবদিগের আনন্দবৃদ্ধি হইতে হইতে কোন সময় প্রলয় লক্ষণ-ভাবের উদয় হয়, তাহাতে কোন সময় সাযুজ্য-ভাব আসিয়া পড়ে। ঐ সাযুজ্য-ভাবটী নন্দভক্ষক সর্প বিশেষ; তাহা হইতে মুক্ত থাকিয়া সাধক সুবৈষ্ণব হইবেন। যশকে প্রধান করিয়া মানেন যিনি, তিনি যশোমূর্খা শঙ্খচূড়; তিনি ব্রজভূমিতে উৎপাত করিতে গিয়া বিনষ্ট হন। প্রতিষ্ঠাপরতা ও ভক্তিচ্ছলে ভোগ কামনা—ইহারা শঙ্খচূড়-নামা ঘোড়শ প্রতিবন্ধক। প্রতিষ্ঠাকে লক্ষ্য করিয়া যে সকল লোকেরা কোন কার্য্য করেন, তাঁহারাও একপ্রকার দান্তিক, অতএব বৈষ্ণবগণ সর্বদা তাহা হইতে সাবধান থাকিবেন। কংসবৈরী শ্রীকৃষ্ণ যৎকালে মথুরা-গমনে মানস করিলেন, তৎকালে রাজ্য-সদাসুর ঘোটকরূপী কেশী নিহত হইল। সাধকের যখন ভক্তি তেজ সমৃদ্ধি হয়, তখন স্বীয় উৎকর্ষজ্ঞানরূপ ঘোটকাত্মা কেশী-নামক অসুর ব্রজে আগমন করত বড়ই উৎপাত করে। ক্রমশঃ স্বীয় উৎকৃষ্টতা আলোচনা করিতে করিতে ভগবদবমাননা-ভাবের উদয় হইয়া বৈষ্ণবকে অধঃপাতিত করায়। অতএব তদ্রূপ দুষ্টভাব বৈষ্ণবহৃদয়ে না হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। ভক্তি সমৃদ্ধি হইলেও নম্রতাধর্ম্ম কখনই বৈষ্ণবচরিত্র ত্যাগ করিবে না। যদি করে, তবে কেশীবধের প্রয়োজন হইয়া উঠে। এই অষ্টাদশটী প্রতিবন্ধক। ষাঁহারা পবিত্র ব্রজভাব-গত হইয়া কৃষ্ণানন্দ সেবা করিবেন, তাঁহারা বিশেষ যত্নপূর্ব্বক প্রোক্ত অষ্টাদশটী প্রতিবন্ধক দূর করিবেন। ইহার মধ্যে কতকগুলি প্রতিবন্ধক জীব শুদ্ধভাবগত হইয়া স্বীয় চেষ্টাক্রমে

দূর করিবেন, কতকগুলি শ্রীকৃষ্ণকৃপাসহকারে দূর করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। যে সকল প্রতিবন্ধক জীব স্বয়ং দূর করিতে সক্ষম হইবেন, ঐ সকল ধর্মশ্রয় থাকায় ঐ সমাধি সবিকল্প-নাম প্রাপ্ত হয়। আত্মার প্রত্যক্ষ শ্রীভাগবতে বলদেব কর্তৃক দূরীকৃত হইয়া থাকার বর্ণন আছে। কিন্তু কৃষ্ণাশ্রয়ে যে সকল প্রতিবন্ধক দূর হয়, তাহা শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং দূর করিয়াছেন, এরূপ বর্ণিত আছে।

শ্রীমদ্র লীলা :—ঘটনীয় বিষয় সকলের ঘটক অক্রুর শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া গেলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া ভগবান্ প্রথমে মল্লদিগকে নষ্ট করিয়া পরে অন্ভুজসহিত কংসকে নিপাত করিলেন। নাস্তিক্যরূপ কংস বিগত হইলে তাহার জনক স্বাতন্ত্র্যরূপ উগ্রসেনকে শ্রীকৃষ্ণ রাজসিংহাসন অর্পণ করিলেন। অস্তি-প্রাপ্তি নামা কংসের দুই ভার্য্যা কর্ষকাম্বু-স্বরূপ জরাসন্ধকে আপন আপন বৈধব্যদশা নিবেদন করিলেন। তাহা শ্রবণে মগধরাজ সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক মথুরাপুরীতে সপ্তদশবার মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পরাজিত হইলেন। জরাসন্ধ পুনরায় মথুরা রোধ করিলে ভগবান্ স্বকীয়া দ্বারকাপুরীতে গমন করিলেন। মূল তাৎপর্য্য এই যে, নিষেকাদি শ্মশানান্ত দশকর্ষ, : বর্ণচতুষ্টয় ও আশ্রমচতুষ্টয় এই আঠারটী কর্ষ বিক্রম। তন্মধ্যে অষ্টাদশ বিক্রমরূপ চতুর্থাশ্রমদ্বারা জ্ঞান-পীঠ অধিকৃত হইলে মুক্তিস্পৃহাজনিত ভগবত্তিরোভার লক্ষিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ যৎকালে মথুরায় ছিলেন, তৎকালে গুরুকুলে বাস করত অনায়াসে সর্ব্বশাস্ত্র পাঠ করিলেন ও গুরুদেবকে

তন্মতপুত্রের জীবন দান করিলেন। স্বতঃসিদ্ধ কৃষ্ণের বিদ্যাভ্যাসের প্রয়োজন নাই, কিন্তু জ্ঞানপীঠরূপ মথুরাবস্থিতিকালে নরবুদ্ধির জ্ঞানভাবের ক্রমোন্নতি হয়। যাঁহারা কৰ্ম্মফল আত্মসাৎ করেন, তাঁহারা কামী, সেই কামীদিগের কৃষ্ণরতি মলযুক্ত, কিন্তু অনেক দিবস পর্য্যন্ত ঐ সকাম কৃষ্ণরতি আলোচনা করিতে করিতে সুনির্মল কৃষ্ণভক্তির উদয় হইয়া পড়ে। মথুরায় অবস্থিতিকালে কুজার সহিত সাধারণী রতিজনিত যে প্রণয় হয় তাহা কুজার অন্তঃকরণে সকাম ছিল, কিন্তু সকাম প্রীতির চরমফলরূপ শুদ্ধপ্রীতিও পরে উদ্ভিত হইয়াছিল। ব্রজভাব সর্বোপরি ভাব; তাহা শিক্ষা করিবার জন্য গোকুলে উদ্ধবকে প্রেরণ করিলেন। পাণ্ডবগণ ধৰ্ম্ম শাখা ও কৌরবগণ অধৰ্ম্ম শাখা, ইহা স্মৃতিতে কথিত আছে। অতএব শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদিগেরই বান্ধব ও কুল রক্ষক। ধৰ্ম্মের কুশলস্থাপন এবং পাপীদিগের ত্রাণ অভিপ্রায়ে ভগবান্ অক্রুরকে দূত করিয়া হস্তিনায় প্রেরণ করিলেন।

কৰ্ম্মের গতি দুই প্রকার অর্থাৎ স্বার্থপর ও পরমার্থপর। পরমার্থপর কৰ্ম্ম সকলকে কৰ্ম্মযোগ বলা যায়; কেননা জীবন-যাত্রায় ঐ সকল কৰ্ম্মের দ্বারা জ্ঞানের পুষ্টি এবং কৰ্ম্মজ্ঞান উভয়ের যোগক্রমে ভগবদ্ভতির পুষ্টি হইয়া থাকে। এই প্রকার কৰ্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির পরস্পর সংযোগকে কেহ কেহ কৰ্ম্মযোগ, কেহ কেহ জ্ঞানযোগ, কেহ কেহ ভক্তিযোগও সারগ্রাহী লোকেরা সমন্বয়যোগ করিয়া থাকেন। কিন্তু যে সকল কৰ্ম্ম স্বার্থপর তাহাদের নাম কৰ্ম্মকাণ্ড। কৰ্ম্মকাণ্ড

প্রায়ই ঈশ্বর বিষয়ে অস্তিত্বপ্রাপ্তিরূপ সংশয়কে উৎপন্ন করিয়া নাস্তিকতার সহিত তাহাদের উদ্বাহরূপ সংযোগ করিয়া থাকে। সেই কৰ্মকাণ্ডরূপ জরাসন্ধ ব্রহ্মজ্ঞান-স্বরূপিণী রম্য মথুরাপুরীকে রোধ করিল। ভক্তসমাজরূপ বান্ধবগণকে শ্রীকৃষ্ণ বৈধভক্তিয়োগরূপ দ্বারকাপুরীতে স্বেচ্ছাক্রমে লইয়া গেলেন। বর্ণাশ্রমরূপ সাংসারিক বিধিরাহিত্যকে যবন বলা যায়, অবৈধকার্য্যবশতঃ যবন-ধর্ম্ম স্লেচ্ছতাভাবাপন্ন, ঐ যবন কৰ্ম্মকাণ্ডের সাহায্যে জ্ঞানের বিরোধী ছিল, মুক্তিমার্গাধিকার-রূপ মুচুকুন্দ রাজাকে ঐ যবন পদাঘাত করায় তাঁহার তেজে ঐ ছুরাচার হত হইল।

দ্বারকা নীলা—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানময়ী দ্বারকাপুরীতে অবস্থিত হইয়া পরমৈশ্বর্য্যরূপিণী রুক্মিণী দেবীকে ভগবান্ বিবাহ করিলেন। কামরূপ প্রহ্মান্ন রুক্মিণীর গর্ভজাতমাত্রেই ছুরাআ মায়ায়ুগী শম্বর কর্তৃক হৃত হইলেন। পুরাকালে শুষ্ক বৈরাগ্যগত মহাদেব কর্তৃক কামদেবের শরীর ভস্মসাৎ হইয়াছিল, তৎকালে রতিদেবী বিষয়-ভোগরূপ অস্মুরীভাবাশ্রয় করিয়াছিলেন কিন্তু বৈধী ভক্তিমার্গ উদয় হইলে ভস্মীভূত কাম কৃষ্ণপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করত স্বপত্নী রতিদেবীকে অস্মুরী-ভাব হইতে উদ্ধার করিলেন। তাৎপর্য্য এই যে, যুক্তবৈরাগ্যে বৈধকাম ও রতির অস্বীকার নাই। স্বপত্নী রতিদেবীর শিক্ষায় অতি বলবান্ কামদেব, বিষয়ভোগরূপ শম্বরকে বধ করত দ্বারকা গমন করিলেন। মানময়ী রাধিকার কলাস্বরূপা সত্যভামাকে মণি উদ্ধার করত বিবাহ করিলেন। মাধুর্য্যগত

হ্লাদিনী শক্তির ঐশ্বর্য্যভাবে প্রতিফলিত রুক্মিণ্যাদি অষ্টমহিষী দ্বারকায় কৃষ্ণ-প্রিয়া হইয়াছিলেন। মাধুর্য্যগত ভগবদ্ভাব যেরূপ অখণ্ড, ঐশ্বর্য্যগত বৈধীভক্ত্যাশ্রয় দ্বারকানাথের ভাব সেরূপ নয়, যেহেতু ফলরূপে ঐ ভাবের সন্তানসন্ততিক্রমে বশং-বুদ্ধি হইয়াছিল।

হরধামরূপ কাশীতে অদ্বৈতমতবাদরূপ আসুরিক মতের উদয় হয়, যাহাতে আমি বাসুদেব বলিয়া এক ছুষ্ঠ ব্যক্তি ঐ মত প্রচার করেন। রমাপতি ভগবান্ তাহাকে বধ করিয়া ঐ মতের ছুষ্ঠ পীঠস্বরূপ কাশীধামকে দগ্ধ করেন। ভগবত্ত্বকে ভৌমবুদ্ধি করিয়া নরকাসুরের ভৌমনাম হয়। তাহাকে বধ করিয়া গরুড়াসন ভগবান্ অনেক রমণীবৃন্দকে উদ্ধার করত তাহাদিগকে বিবাহ করলেন। পৌত্তলিক মত নিতান্ত হেয় যেহেতু পরমতত্ত্বে সামান্য বুদ্ধি করা নিতান্ত নিৰ্বোধের কৰ্ম্ম, শ্রীমূর্ত্তিসেবন ও পৌত্তলিক মতে অনেক ভেদ আছে। পরমার্থতত্ত্বের নির্দেশক শ্রীমূর্ত্তিসেবন দ্বারা পরমার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু নিরাকারবাদরূপ ভৌতিক তত্ত্বের ব্যতিরেক ভাবকে পরব্রহ্ম বলিয়া নিশ্চয় করা অথবা মায়িক কোন বস্তু বা গঠনকে পরমেশ্বর বলিয়া জানাই পৌত্তলিকতা অর্থাৎ ভগবদিতর বস্তুতে ভগবন্নির্দেশ। এই মতের অনুগামী লোক সকলকে ভগবান্ উদ্ধার করত স্বয়ং স্বীকার করিলেন। ধৰ্ম্ম-ভ্রাতা ভীমের দ্বারা জরাসন্ধকে বধ করিয়া অনেকানেক রাজাদিগকে কৰ্ম্মপাশ হইতে উদ্ধার করিলেন। যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে অশেষ পূজা গ্রহণ করত আত্মবিদেষী অর্থাৎ ভগবৎ-

স্বরূপবিদেষী শিশুপালের শিরশ্চেদ করিলেন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে পৃথিবীর ভার অপনোদন করিয়া ভগবান্ ধর্মস্থাপন-পূর্বক সমাজ রক্ষা করিলেন। নারদমুনি দ্বারকায় আগমন করিয়া প্রতি মহিষীর গৃহে শ্রীকৃষ্ণকে একইকালে দর্শন করত ভগবত্তত্ত্বের গাঙ্গীর্য্যে বিশ্বয়াপন্ন হইলেন। সর্ব্বজীবে এবং সর্ব্বত্র ভগবান্ পূর্ণরূপে বিলাসবান্ হইয়া একই কালে অবস্থিত আছেন, ইহা একটা অপূর্ব্ব তত্ত্ব। সর্ব্বব্যাপী ভাবটি এই তত্ত্বের নিকট, নিতান্ত সামান্য বোধ হয়। অসভ্যতারূপ দস্ত-বক্র হত হইলেন। পুনশ্চ ধর্ম্মভ্রাতা অর্জুনের স্বীয় ভগিনী সুভদ্রা দেবীর পাণি প্রদান করিলেন। যেস্থলে ভোগ্যত্বরূপ জীবের জীৱ সম্পন্ন হয় নাই, সেস্থলে সখ্যভাবগত-হ্লাদিনী-শক্তি-সম্বন্ধ-স্থাপনার্থে ভগবদ্ভাবের সন্নিকৃষ্ট ভগিনীত্বপ্রাপ্ত কোন অচিন্ত্য ভক্তভাবে কল্পনা করা যায়। ঐ ভাব অর্জুনের গায় ভক্তিবিশেষের ভোগ্য হয়। ব্রজ-ভাবের গায় ঐ ভাব উৎকৃষ্ট নয়।

শাস্ত্রমায়া বিনাশ করিয়া ভগবান্ দ্বারকাপুরী রক্ষা করিলেন। বৈজ্ঞানিক শিল্প ভগবৎকার্য্যের নিকট কিছুই নয়। নৃগরাজ অনুচিতকর্ম্মফলে (নাম মাহাত্ম্যে বিশ্বাস না থাকায় জাগতিক শুভকার্য্য দানাদিকার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া নামাপরাধ মধ্যে গণ্য) কুকলাসত্ব ভোগ করিতেছিলেন, ভগবৎকৃপায় তাহা হইতে উদ্ধার পাইলেন। পাষণ্ডত্ব অতিশয় উপাদেয় দ্রব্যও ভগবদ্গ্রাহ্য নয়, কিন্তু প্রীতিদত্ত অতি সামান্য দ্রব্যও ভগবানের আদরনীয় হয়, ইহা সুদামা

ব্রাহ্মণের তগুলকণ ভক্ষণ করিয়া দেখাইলেন। এই সমস্ত লীলা ভক্তগণের হৃদ্যেশবর্তী, কিন্তু ভক্তগণের মর্ত্যদেহ পরিত্যাগ কালে, রঙ্গস্থিত নটের রঙ্গত্যাগের স্থায়, অদৃশ্য হয়। কালরূপা শ্রীকৃষ্ণেচ্ছাভাবরূপ যাদবদিগকে লীলারঙ্গ হইতে নিবৃত্ত করিয়া দ্বারকাধামকে বিশ্বত্বিসাগরের উন্মিছারা প্লাবিত করিলেন। ভগবানের ইচ্ছা সর্বদা পবিত্র। ইহাতে কিছুমাত্র অমঙ্গল নাই। ভক্তগণকে বৈকুণ্ঠাবস্থা প্রদান করিবার অভিপ্রায়ে মায়িক শরীর হইতে ভিন্ন করিয়া লন। সেই পরমানন্দদায়িনী কৃষ্ণেচ্ছা ভক্তদিগের জরাক্রান্ত কলেবর সকল ভগবজ্জ্ঞানরূপ প্রভাসক্ষেত্রে পরিত্যাগ করাইলেন। শরীরের অপটু অবস্থায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেহ কাহারও শাসনধীনে না থাকায় পরস্পর বিবাদ করে বিশেষতঃ দেহত্যাগকালে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অবশ হইয়া পড়ে, কিন্তু ভক্তদিগের চিন্তে ভগবত্ত্ব কখনই নিবৃত্ত হয় না। ভক্তহৃদয়ে যে ভগবদ্ভাব থাকে তাহা ভক্তকলেবর বিচ্ছিন্ন হইলে, ভক্তের শুদ্ধ আত্মার সহিত স্বীয় মহিমা প্রাপ্ত হইয়া বৈকুণ্ঠস্থ প্রদেশবিশেষ গোকুলে নিত্য বিরাজমান হইতে থাকে। উক্ত লীলা সকল ভগবৎ হৃদ্যেশস্থ ও ভক্ত হৃদ্যেশস্থ ভাব সকলকে উদ্বেলিত করিয়া লীলা পোষণোপযোগী করিয়া বিভিন্ন প্রকার ভাবে যথোপযুক্ত বিভাবিত করিয়া উভয়কে লীলারস আশ্বাদন করাইবার শক্তিই স্ফোট শক্তি।

চিংপ্রভাবগত পরা শক্তির সন্ধিনীভাবকৃত বকুণ্ঠ, ১।
মাধুর্য্যগত বিভাগ, ২। ঐশ্বর্য্যগত বিভাগ ও ৩। নির্বিশেষ

বিভাগরূপ বিভাগত্ৰয়ে বিভক্ত। নির্বিশেষ বিভাগটী বৈকুণ্ঠের আবরণ ভূমি। বহিঃপ্রকোষ্ঠের নাম নারায়ণধাম এবং অন্তঃপুরের নাম গোলোক। নির্বিশেষ উপাসকেরা নির্বিশেষ বিভাগ অর্থাৎ ব্রহ্মধামকে প্রাপ্ত হইয়া মায়াজনিত শোক হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত হয়। ঐশ্বর্য্যগত ভক্তবৃন্দ নারায়ণ ধাম প্রাপ্ত হইয়া অভয়লাভ করেন। মাধুর্য্যাস্বাদী ভক্তজন অন্তঃ-পুরস্থ হইয়া কৃষ্ণামৃত লাভ করেন। অশোক, অভয় ও অমৃত—এই তিনটী শ্রীকৃষ্ণের ত্রিপাদ বিভূতি নিত্য বৈকুণ্ঠগত। বিভূতিযোগে পরব্রহ্মের নাম বিভূত হইয়াছে। মায়িক জগৎটী শ্রীকৃষ্ণের চতুর্থ বিভূতি। আবির্ভাব হইতে অন্তর্দ্বান পর্য্যন্ত নানা-সম্বন্ধঘটিত-লীলা গোলোকধামে বর্তমান আছে। বন্ধজীবের যে গোলোকভাব প্রতিভাত আছে, তাহাতেও এই লীলা নিত্য, যেহেতু অধিকারভেদে কোন ভক্তহৃদয়ে এই মুহূর্ত্তে কৃষ্ণজন্ম হইতেছে, কোন ভক্তহৃদয়ে বস্ত্রহরণ, কোন হৃদয়ে মহারাস, কোন হৃদয়ে পূতনাবধ, কোন হৃদয়ে কংসবধ, কোন হৃদয়ে কুজাপ্রণয় এবং কোন হৃদয়ে ভক্তের জীবনত্যাগ সময়ে অন্তর্দ্বান হইতেছে। যেমত জীবসকল অনন্ত, তদ্রূপ জগৎসংখ্যাও অনন্ত, অতএব এক জগতে একলীলা ও অণু জগতে অণু লীলা, একরূপ শব্দৎ বর্তমান আছে। অতএব ভগবানের সমস্ত লীলাই নিত্য, কখনই লীলার বিরাম নাই, যেহেতু ভগবানের ফোট-শক্তি সর্ব্বদাই ক্রিয়াবতী। এই সমস্ত লীলাই স্বরূপ-ভাব-গত অর্থাৎ মায়িকবিকারগত নয়। যদিও মায়াবশতঃ

বদ্ধজীবে ঐ লীলা বিকৃতবৎ বোধ হয়, তথাপি তাহার নিগূঢ়-সত্ত্বা চিহ্নপর্বতিনী। সেই লীলা গোলোকধামে স্বরূপভাব-সম্পন্ন আছে, কিন্তু বদ্ধজীবসম্বন্ধে তাহা সাস্বক্ষিকী। বদ্ধ-জীবসকল দেশ, কাল ও পাত্রভেদ অবলম্বন পূর্বক ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব প্রাপ্ত হওয়ায় ঐ সকল লীলা দেশগত, কালগত ও পাত্রগতভেদ অবলম্বনপূর্বক ভিন্ন-ভিন্নাকাররূপে দৃষ্ট হয়। লীলা কখনই সমল হয় নাই, কিন্তু আলোচকদিগের মলযুক্ত বিচারে উহার ভিন্নতা পরিদৃশ্য হয়। চিহ্নগতের ক্রিয়াসকল বদ্ধজীবে স্বরূপভাবে স্পষ্ট পরিদৃশ্য হয় না, কেবল সমাধিদ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে অনুভূত হয়, তাহাও ঐ স্বরূপ ভাবের মায়িক প্রতিচ্ছায়াকে লক্ষ্য করিয়া সিদ্ধ হয়। এতদ্ব্যতীত ব্রজলীলাদিতে যে সকল দেশ-নিদর্শন, কাল-নিদর্শন ও ব্যক্তি-নিদর্শন লক্ষিত হয়, ঐ সকল নিদর্শন পাত্রবিচার ক্রমে দুইপ্রকার কার্য্য করে। কোমলশ্রদ্ধ পুরুষদিগের পক্ষে তাহারা সম্পূর্ণ বিশ্বাসের স্থল। সেরূপ স্থল নির্দেশ ব্যতীত তাঁহাদের ক্রমোন্নতির পন্থাস্তর নাই। উক্তমাধিকারীদিগের পক্ষে তাহারা চিদগত-বৈচিত্র্য-প্রদর্শকরূপে সম্যক্ আদৃত হইয়াছে। মায়িক সম্বন্ধ দূর হইলে জীবের পক্ষে স্বরূপ-লীলা প্রত্যক্ষ হইবে। বদ্ধজীবে ভগবল্লীলা স্বভাবতঃ সাস্বক্ষিকী। ঐ সাস্বক্ষিকী ভাব দুই-প্রকার—ব্যক্তিনিষ্ঠ ও সর্বনিষ্ঠ। বিশেষ বিশেষ ভক্তহৃদয়ে যে ভাবের উদয় হইয়া আসিয়াছে তাহা ব্যক্তিনিষ্ঠ। ঐ ব্যক্তিনিষ্ঠ ভাবকর্তৃক প্রহ্লাদ, ধ্রুব ইত্যাদি ভক্তগণের হৃদয়

অতি প্রাচীন কালেও ভগবল্লীলার পীঠস্বরূপ হইয়াছিল। যেমত কোন বিশেষ ব্যক্তির জ্ঞানোদয়ক্রমে ভগবদ্ভাবের উদয় হইয়া তাহার হৃদয় পবিত্র করে তদ্রূপ সমস্ত জনসমাজকে এক ব্যক্তি জ্ঞান করিয়া উহার বাল্য, যৌবন ও বৃদ্ধাবস্থা বিচার করিলে দেখা যায় যে, সাধারণ আলোচনাক্রমে কোন সময়ে ভগবদ্ভাব সামাজিক সম্পত্তি হইয়া উঠে এবং সমাজের জ্ঞানবৃদ্ধিক্রমে প্রথমে উহা কর্মবশ, পরে জ্ঞানপর এবং অবশেষে চিদনুশীলনরূপ পরম ধর্মের প্রবলতাক্রমে বিশুদ্ধ হইয়া উঠে। সেই সর্বনিষ্ঠ লীলাগত ভাব দ্বাপয়ুগে নারদ-বাসাদির চিন্তে উদিত হওয়াতে অপ্ৰাকৃত বৈষ্ণবধর্মের প্রচার হইয়াছে। সমাজ-জ্ঞানসমৃদ্ধিক্রমে যে কৃষ্ণলীলারূপ বৈষ্ণব-ধর্মের প্রকাশ হইল তাহা তিন ভাগে বিভাজ্য। তন্মধ্যে দ্বারকালীলা প্রথম ভাগ এবং ভগবান্ তাহাতে ঐশ্বর্যাত্মক বিধিপরায়ণ বিভূষরূপ উদিত হইয়াছেন। মধ্যলীলা মাথুর বিভাগে লক্ষিত হয়; তাহাতে ভগবানের ঐশ্বর্য্য ততদূর প্রস্ফুটিত নহে, অতএব অধিকতর মাধুর্য্য তাহাতে নিহিত আছে। কিন্তু তৃতীয় বিভাগে ব্রজলীলা সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হইয়াছে। যে লীলাতে যতদূর মাধুর্য্য, সেই লীলা ততদূর উৎকৃষ্ট ও স্বরূপসন্নির্কষ। অতএব ব্রজলীলয় শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্র পূর্ণতম।

ঐশ্বর্য্য যদিও বিভূতির অঙ্গবিশেষ, তথাপি কৃষ্ণতত্ত্বে তাহার প্রাবল্য সম্ভব হয় না; যেহেতু যেখানে ঐশ্বর্য্যের অধিক প্রভাব, সেইখানেই মাধুর্য্যের লোপ হয়। অতএব গো, গোপ,

গোপী, গোপবেশ, গোরসোদ্ভূত নবনীত, বন, কিশলয়, যমুনা, বংশী প্রভৃতি যে স্থানের সম্পত্তি, সেই স্থানই ব্রজগোকুল, অর্থাৎ বৃন্দাবন বলিয়া সমস্ত মাধুর্যের আস্পদ হইয়াছে। সেখানে ঐশ্বর্য্য কি করিবে। সেই ব্রজলীলায় দাস্ত্র, সখ্য, বাৎসল্য ও শৃঙ্গাররূপ চারিটি সম্বন্ধাশ্রিত পরম রস চিহ্নিলাসের উপকরণস্বরূপ সর্ব্বদা বিরাজমান হইতেছে। সেই সমস্ত রসের মধ্যে গোপীদিগের সহিত ভগবল্লীলারসই শ্রেষ্ঠ। তন্মধ্যে গোপীগণের শিরোমণি শ্রীমতী রাধিকার সহিত ভগবল্লীলা সর্ব্বোত্তম ভাবনা বলিয়া লক্ষিত হয়।

যাঁহারা এই রসরূপ চিদগতভাবে আশ্বাদনপর, তাঁহারা ই নিত্যধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন। কোন কোন মধ্যমাধিকারী পুরুষেরা যুক্তির সীমাতিক্রম আশঙ্কা করিয়া বলিয়া থাকেন যে, সামান্য ভাবসূচক বাক্যসংযোগদ্বারা এইরূপ তত্ত্ব ব্যাখ্যা কর, কৃষ্ণলীলাবর্ণনরূপ নিদর্শনের প্রয়োজন নাই। এরূপ মন্তব্য ভ্রমজনিত, যেহেতু সামান্য বাক্যযোগে বৈকুণ্ঠবৈচিত্র্য প্রদর্শিত হয় না। এক অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্ম আছেন তাঁহার উপাসনা কর, এরূপ কহিলে আত্মার চরমধর্ম্ম উত্তমরূপে ব্যাখ্যাত হয় না। সম্বন্ধযোজনা ব্যতীত উপাসনাকার্য্য সম্ভব হয় না। মায়া নিবৃত্তিপূর্ব্বক ব্রহ্মে অবস্থান করাকে উপাসনা বলা যায় না, যেহেতু ঐ কার্য্যে প্রতিষেধরূপ ব্যতিরেক-ভাব-ব্যতীত কোন অদ্বয় ভাবের বিধান হইল না। ব্রহ্মকে দর্শন কর, ব্রহ্মের চরণাশ্রয় গ্রহণ কর ইত্যাদি বাক্য-প্রয়োগের দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণ বিশেষ ধর্ম্মের স্বীকার করা

হইল। এস্থলে বিবেচনা করিতে হইবে যে, ঐ বিশেষে সম্পূর্ণ সন্তোষ না হওয়ায় তাঁহাকে প্রভু, পিতা ইত্যাদি সম্বোধন প্রয়োগ করা যায়, তদ্বারা মায়িক সম্বন্ধ দৃষ্টিপূর্বক কোন অনির্বচনীয় লক্ষ্য আছে। মায়িকসত্তা ও কার্য্যকে নিদর্শনরূপে স্বীকার করিতে হইলে, বৈকুণ্ঠগত সমস্ত সম্বন্ধ-ভাবের মায়িক প্রতিফলনকে নিদর্শনরূপে সংগ্রহ করত সার-গ্রহণ-প্রবৃত্তিদ্বারা বৈকুণ্ঠগত সত্তা ও কার্য্যসকলকে অন্বেষণ করিতে সারগ্রাহী লোক ভীত হইবেন না। বিদেশীয় পণ্ডিতগণ বুঝিতে না পারিয়া পাছে আমরাদিগকে পৌত্তলিক বলেন, এই অমার ভয়কে শিরোধার্য্য করিয়া আমরা কি পরমার্থ-রত্নকে বিসর্জন দিব? যাঁহারা নিন্দা করিবেন, তাঁহারা নিজ নিজ কৃত সিদ্ধান্তে কোমলশ্রদ্ধ। তাঁহাদিগ হইতে উচ্চাধিকারী হইয়া আমরা কি জ্ঞান তাঁহাদিগকে আশঙ্কা করিব? সামান্য বাক্যযোগে রসতত্ত্বের বিস্তৃতি হয় না, এজন্য ব্যাসাদি কবিগণ শ্রীকৃষ্ণ লীলাতত্ত্ব বিস্তাররূপে বর্ণন করিয়াছেন। ঐ অপূর্ব-লীলাবর্ণন কোমলশ্রদ্ধ ও উত্তমাধিকারী উভয়েরই পরম-শ্রদ্ধাম্পদ। প্রকৃষ্টরূপে সেবিত হইলে ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র যে পরিমাণে পরমানন্দ দান করেন, তাহা ধ্যানযোগে জীবাশ্মা-সহচর ঈশ্বর, জ্ঞানযোগে নির্বিশেষ ব্রহ্ম, কর্ম্মযোগে যজ্ঞেশ্বর উপাসিত হইয়া প্রদান করেন না। অতএব সর্ব-জীবের পক্ষে হয় কমলশ্রদ্ধরূপে অথবা পরমসৌভাগ্যক্রমে উত্তমাধিকারিরূপে কৃষ্ণসেবাই একমাত্র পরম ধর্ম্ম। সমস্ত সুবৈষ্ণ-বগণ স্ফোটতত্ত্বে বিভিন্ন প্রকাশরূপ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব অবগত হইবেন।

মথুরা ও দ্বারকাগত ভাবসকল সর্বোৎকৃষ্ট ব্রজভাবের পুষ্টিকর। যে ব্রজভাবে আসক্তি করিয়া জীব অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন, তাহা অদ্বয়ব্যতিরেকরূপে বিবেচিত হইবে। অদ্বয়-বিচারে শান্ত, দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পঞ্চ সম্বন্ধের আলোচনা হইয়া থাকে। কেহ কেহ ব্রজরাজের দাস্ত প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং শ্রীদাম-সুবলাদি ভক্তগণ সখ্যভাবে সেবা করেন। যশোদা, রোহিণী, নন্দ প্রভৃতি বাৎসল্য-ভাবের পাত্র এবং শ্রীরাধিকা প্রভৃতি গোপীগণ কান্ত্যভাব প্রাপ্ত হইয়া রাসমণ্ডলে বর্তমান আছেন। বৃন্দাবন বিনা অস্ত্র শুদ্ধসম্বন্ধভাব নাই। এতন্নিবন্ধন শুদ্ধ জীবদিগের বৃন্দাবন-ধামে স্বাভাবিকী রতি হইয়া থাকে। বৃন্দাবনস্থ কান্ত্যভাবই সর্ববিশুদ্ধসম্মত শ্রেষ্ঠ, যেহেতু জীবের ভোগ্যতা ও ভগবানের ভোক্ত্বরূপ নিত্যধর্ম ইহাতে বিশুদ্ধরূপে লক্ষিত হয়। নিত্য-ধর্মে অবস্থিত জীব ও কৃষ্ণের মধ্যে কোনপ্রকার কুণ্ঠতা নাই। অথও পরমানন্দ উহাতে প্রীতিরূপে নিত্য বর্তমান আছে। জীব ও কৃষ্ণের সন্তোগসুখই ব্রজরসের নিত্য প্রয়োজন। সেই সুখের পুষ্টি করিবার জন্ত বিপ্রলম্ব অর্থাৎ পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্র্য ও প্রবাস-রূপ বিরহভাব নিতান্ত প্রয়োজন। মথুরা ও দ্বারকা-চিন্তা দ্বারা তাহা সিদ্ধ হয়। অতএব মথুরা ও দ্বারকাদি-ভাব ব্রজভাবের পুষ্টিকর বলিয়া উক্ত হইয়াছে। প্রপঞ্চ বদ্ধ জীবের অধিকার-ক্রমানুসারে আদৌ বৈধ ভক্তির আশ্রয় থাকে, পরে রাগোদয় হইলে ব্রজভাবের উদগম হয়। জনসমাজে বৈধানুশীলন এবং স্বীয়ান্তঃকরণে কৃষ্ণরাগাশ্রয়

যৎকালে হইতে থাকে, সেই কালে শ্রীকৃষ্ণে পরকীয় রসের কল্পনা করা যায়। যেমত কোন স্ত্রী নিজ বিবাহিত স্বামীকে বাহাদর করত কোন পরপুরুষের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাতে গোপনে অনুরক্ত হয়, তদ্রূপ পূর্বাশ্রিত বৈধমার্গের বিধিসকল ও ঐ সকল বিধির নিয়ন্তা ও রক্ষক-সকলের প্রতি কেবল বাহু সম্মান করত ভিতরে ভিতরে রাগানুশীলন দ্বারা কৃষ্ণপ্রেমকারী পুরুষেরা পরকীয়রসাস্রয় করিয়া থাকেন। এই তত্ত্বটী শৃঙ্গার-রসের পক্ষে উপাদেয়, অতএব মধ্যমাধিকারীদিগের নিন্দা-ভয়ে উত্তমাধিকারীরা কখনই ত্যাগ করিতে পারেন না।

বৈধ বিধানের মূল তাৎপর্য্য এই যে, যৎকালে বদ্ধজীব-দিগের আত্মার নিত্যধর্ম্মরূপ রাগ নিদ্রিতপ্রায় থাকে অথবা বিকৃতভাবে বিষয়রাগরূপে পরিণত থাকে, তখন আত্মবিদ্বৈছগণ ঐ রোগ দূরীকরণ জন্ত যে সকল বিধান করেন, তাহাই বিধিমার্গ। সংসার ভ্রমণ করিতে করিতে যে মহাপুরুষ যে কার্য্যের দ্বারা স্বীয় সুপ্তপ্রায় রাগের উদয় করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তিনি জীবদিগের প্রতি স্বাভাবিক দয়াপূর্ব্বক ঐ কার্য্য বা ঘটনাটীকে পরমার্থ-সাধনের উপায়-স্বরূপ বর্ণন করিয়া একটী একটী বিধির ব্যবস্থা করিয়াছেন। ঐ সকল মহাপুরুষদিগের বিধিসকল, শাস্ত্রাজ্ঞারূপে কোমল-শ্রদ্ধ মহাশয়গণের নিতান্ত অবলম্বনীয়। বিধিকর্ত্তা ঋষিগণ উত্তমাধিকারী ও সারগ্রাহী ছিলেন। যে সকল লোকেরা স্বয়ং বিচার করিয়া রাগোৎপত্তির উপায় উদ্ভাবন করিতে না পারেন, তাঁহাদের পক্ষে বিধিমার্গ ব্যতীত আর গতি নাই।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রবণ-কীর্তনাদি নয়টি বিভাগে উক্ত বিধিসকল সংগৃহীত হইয়াছে। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থে ঐ সকল বিধির চতুঃষষ্টি অঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন করিয়া আলোচিত হইয়াছে। ফল কথা, যাঁহাদের স্বাভাবিক রাগ অনুদিতপ্রায় আছে, তাঁহারা বিধিমাগের অধিকারী, কিন্তু রাগতত্ত্বের ভাবোদয় হইলেই বিধিমার্গের অধিকার নিরস্ত হয়। যে কোন বিধির আশ্রয়ে কৃষ্ণানুশীলনদ্বারা যে পুরুষের রাগোদয় হয়, সেই বিধি সেই পুরুষকর্তৃক রাগাবির্ভাবের পরেও কৃতজ্ঞতাসহকারে ও অপর লোকে অনুকরণ করিয়া চরিতার্থ হইবে, এরূপ আশয়ে অনেকদিন পর্য্যন্ত সেবিত হয়। সারগ্রাহী মহাত্মারা সমস্ত বিধি অবলম্বন বা পরিত্যাগ করিতে অধিকার রাখেন। উপাসনাপর্বে রাগতত্ত্বকে অবস্থাক্রমে তিন ভাগে বিভাগ করা যায়, যথা,—শুদ্ধরাগ, বৈকুণ্ঠসত্তাগতভাবমিশ্রিত রাগ এবং বদ্ধর্জাবের পক্ষে নিদর্শনচেষ্টিগত ভাবমিশ্রিত রাগ। কৃষ্ণাঙ্করূপিণী রাধিকাসত্তাগত অতি শুদ্ধ রাগকে মহাভাব বলা যায়। রাগের তদবস্থা হইতে ভিন্ন, কিন্তু মহাভাবের অত্যন্ত সন্নিকটস্থ শুদ্ধসত্তাগত অষ্ট প্রকার ভাবসকল অষ্ট সখী। উপাসকের নিদর্শনচেষ্টিগত সখীভাবের সন্নিকর্ষ-ভাবসকল মঞ্জরী। উপাসক প্রথমে স্বীয়স্বভাবপ্রাপ্য মঞ্জরীর আশ্রয় করিয়া, পরে ঐ মঞ্জরীর সেব্য সখীর আশ্রয় করিবেন। সখীর কৃপা হইলে শ্রীরাধিকার পদাশ্রয় লাভ হইবে। মহা-রাসলীলাচক্রে উপাসক, মঞ্জরী, সখী ও শ্রীমতী রাধিকা—ইহারা জড়জগতের ধ্রুবচক্রের উপগ্রহ, গ্রহ, সূর্য্য ও ধ্রুব—

ইহাদের সহিত সৌসাদৃশ্য রাখেন। ভাববাহুল্যক্রমে মহাভাবত্বপ্রাপ্ত জীবদিগের সর্বানন্দ প্রদায়ক কৃষ্ণসন্তোগ সুলভ হইয়া পড়ে। এই চমৎকার ব্রজভাব সম্পন্ন হইবার প্রীতিদূষক অষ্টাদশটি প্রতিবন্ধক আছে। প্রতিবন্ধক বিচারের নাম ব্রজভাবের ব্যতিরেক বিচার। ইহা পূর্বের আলোচিত হইয়াছে। উক্ত বিষয়গুলি ফোটপ্রকাশের অঘয় ও ব্যতিরেক শক্তিদ্বারা সম্ভাবিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণগোপী :- শ্রীব্যাসদেব ব্রজলীলা বর্ণনে নিত্যতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। প্রপঞ্চ-জনিত বিষয়-জ্ঞান ঐ নিত্যতত্ত্বের স্বরূপকে উপলব্ধি করিতে পারে না। জীবের সিদ্ধসত্তায় ঐ পরমতত্ত্ব ভাসমান হয়। বদ্ধজীবের সম্বন্ধে দূরতারহিত বিশুদ্ধ নির্বিবকল্প-সমাধিতে ফোটের ঐ সিদ্ধসত্তা কার্যক্ষম হয়। সমাধি দুই প্রকার—সবিকল্প ও নির্বিবকল্প। জ্ঞানিগণের সম্প্রদায়ে সমাধির যে কিছু ব্যাখ্যা হইয়া থাকুক, সাত্ত্বতগণ অত্যন্ত সহজ সমাধিকে নির্বিবকল্প ও কূটসমাধিকে সবিকল্প সমাধি বলিয়া থাকেন। আত্মা চিদ্রস্তু, অতএব স্বপ্রকাশতা ও পরপ্রকাশতা উভয় ধর্মই তাহাতে সহজ। স্বপ্রকাশ-স্বভাব-দ্বারা আত্মা আপনাকে আপনি দেখিতে পায়। পরপ্রকাশ-ধর্ম দ্বারা আত্মের সকল বস্তুকে জ্ঞাত হইতে পারে। যখন এই ধর্ম আত্মার স্বধর্ম হইল, তখন নিতান্ত সহজ সমাধি যে নির্বিবকল্প, তাহাতে আর সন্দেহ কি। আত্মার বিষয়বোধ-কার্যে যন্ত্রান্তরের আশ্রয় লইতে হয় না, এজন্য ইহাতে বিকল্প নাই। কিন্তু অতন্নিরসনক্রমে যখন সাজ্জ্য-সমাধি অবলম্বন

করা যায়, তখন সমাধিকার্যে বিকল্প অর্থাৎ বিপরীত ধর্মাশ্রয় থাকায় ঐ সমাধি সবিকল্প নাম প্রাপ্ত হয়। আত্মার প্রত্যক্ষ কার্যকে সহজ সমাধি বলা যায়, ইহাতে মনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না। সহজ সমাধি অনায়াসসিদ্ধ, কোনমতে ক্লেশসাধ্য নহে। ঐ সমাধি আশ্রয় করিলে ফোটার নিত্যতত্ত্ব সহজে আত্মপ্রত্যক্ষ হইয়া পড়ে। সেই আত্মপ্রত্যক্ষ-রূপ সহজ সমাধি অবলম্বনপূর্ব্বক ব্রজলীলা লক্ষিত ও বর্ণিত হয়। তবে যে তদ্বর্ণনে মায়িকপ্রায় নাম, রূপ গুণ ও কৰ্ম লক্ষিত হয়, সে কেবল মায়াপ্রসূত বিশ্বের নিজ আদর্শ বৈকুণ্ঠের সহিত সমানতাপ্রযুক্ত বলিতে হইবে। বাস্তবিক আত্মায় যে সহজ সমাধি আছে তাহা চিচ্ছক্ত্যাবিকৃত কার্যাবিশেষ। তদ্বারা যাহা যাহা লক্ষিত হইতেছে, সে সমস্ত মায়িক জগতের আদর্শমাত্র—অনুকরণ নয়। এই কারণবশতঃ কৃষ্ণনাম-গুণাদিস্বরূপ ব্রজভাবসকলের সহিত জড়োদিত নাম, গুণ, রূপ, কৰ্ম প্রভৃতির সর্ব্বদা সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। ঐ আত্ম-প্রত্যক্ষ স্বপ্রকাশ-স্বভাব। পণ্ডিতেরা ইহাকে সমাধি বলেন। ইহা অতিশয় সূক্ষ্মস্বরূপ। কিঞ্চিন্মাত্র সংশয়ের উদয় হইলে লোপপ্রায় হইয়া যায়। আত্মার স্বসত্ত্বাতে বিশ্বাস, ইহার নিত্যত্ব ও ইহার সহিত পরব্রহ্মের সম্বন্ধ ইত্যাদি অনেকগুলি সত্য ঐ সহজ সমাধিদ্বারা জীবের উপলব্ধি হয়। যদি আমি আছি কিনা, মরণের পর আমার সত্ত্বা থাকিবে কি না এবং পরব্রহ্মের সহিত আমার কিছু সম্বন্ধ আছে কি না, একরূপ যুক্তিগত কোন সংশয়ের উদয় হয়, তাহা হইলে ঐ সকল সত্য-

সংস্কারাত্মক ভ্রমবিশেষ বলিয়া পরিচিত হইতে হইতে ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া যায়। সত্যের লোপ নাই, এজন্য তাহারা লুপ্তপ্রায় থাকে। আত্মার নিত্যত্ব ও ব্রহ্মের অস্তিত্ব প্রভৃতি সত্যসকল যুক্তিদ্বারা স্থাপিত হইতে পারে না, কেন না যুক্তির প্রপঞ্চগতীত বিষয়ে গতি নাই। আত্মপ্রত্যক্ষই ঐ সকল সত্যের একমাত্র স্থাপক। ঐ আত্মপ্রত্যক্ষ বা সহজ সমাধিদ্বারা জীবের নিত্যধাম বৈকুণ্ঠ ও নিত্যক্রিয়া কৃষ্ণদাস্ত্র সততই সাধুদিগের প্রতীত হয়। আত্মা যখন সহজ সমাধি অবলম্বন করেন, তখন প্রথমে আত্মবোধ, দ্বিতীয়ে আত্মার ক্ষুদ্রতাবোধ, তৃতীয়ে আশ্রয়বোধ, চতুর্থে আশ্রিত ও আশ্রয়ের সম্বন্ধবোধ, পঞ্চমে আশ্রয়ের গুণকর্মান্বক স্বরূপগত সৌন্দর্য্যবোধ, ষষ্ঠে আশ্রিতগণের পরস্পর সম্বন্ধবোধ, সপ্তমে আশ্রিতগণ ও আশ্রয়ের সংস্থানরূপ পীঠবোধ, অষ্টমে তদগত অবিকৃত কালবোধ, নবমে আশ্রিতগণের ভাবগত নানাত্ববোধ, দশমে আশ্রিত ও আশ্রয়ের নিত্যলীলাবোধ, একাদশে আশ্রয়ের শক্তিবোধ, দ্বাদশে আশ্রয়শক্তিদ্বারা আশ্রিতগণের উন্নতি ও অবনতিবোধ, ত্রয়োদশে অবনত আশ্রিতগণের স্বরূপভ্রমবোধ, চতুর্দশে তাহাদের পুনরুন্নতিকারণরূপ আশ্রয়ানুশীলনবোধ, পঞ্চদশে অবনত আশ্রিতজনের আশ্রয়ানুশীলনদ্বারা স্বস্বরূপ পুনঃপ্রাপ্তিবোধ ইত্যাদি অনেক অচিন্ত্যতত্ত্বের বোধোদয় হয়। যাঁহার সহজ সমাধিতে যতদূর বিষয়জ্ঞান মিশ্রিত আছে, তিনি ততই অল্পদূর পর্য্যন্ত দেখিতে পান। বিষয়জ্ঞানের মন্ত্রিস্বরূপ যুক্তিকে তাহার নিজাধিকারে আবদ্ধ রাখিয়া, যিনি

যতদূর সহজ সমাধির উন্নতি করিতে সক্ষম হন, তিনি ততদূর সত্যভাণ্ডার খুলিয়া ফোটের অনির্বচনীয় অপ্রাকৃত সত্যসকল সংগ্রহ করিতে পারেন। বৈকুণ্ঠের ফোটভাণ্ডার সর্বদা পরিপূর্ণ। নিত্য-প্রেমাস্পদ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ভাণ্ডারের দ্বার উদঘাটন করিয়া জীবদিগকে সততই ফোটের আকর্ষণী শক্তি প্রকাশ-পূর্বক আকর্ষণ ও আহ্বান করিতেছেন। যে সংশয় সমাধিকে খর্ব্ব করে তাহাকে দূর করিয়া বৈকুণ্ঠতত্ত্বের অন্তঃপুর বৃন্দাবনে সর্বোত্তম তত্ত্বস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণরূপ সৌভগ দর্শন হয়। সমাধি যদি বিষয়জ্ঞানদোষে দূষিত থাকে এবং যুক্তিবৃত্তি যদি বিষয়জ্ঞান ছাড়িয়া সমাধিকার্যে হস্তক্ষেপ করত অনধিকার-চর্চা করিতে পারে তাহা হইলে প্রথমেই চিদগততত্ত্বে বিশেষ ধর্ম্মকে স্বীকার না করিয়া নির্বিশেষ ব্রহ্মধাম পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়, আর অধিকদূর যাইতে পারা যায় না। কিন্তু বিষয়-জ্ঞান ও যুক্তি যদি কিয়ৎপরিমাণে নিবৃত্ত হইয়াও সমাধি-কার্যে কিছু হস্তক্ষেপ করিত, তাহা হইলে আত্মা ও পরমাত্মার নিত্যভেদমাত্র স্বীকার করিয়া বিশেষগত বৈচিত্র্যের অধিকতর উপলব্ধি করিতে অক্ষম হইত। কিন্তু সংশয়রূপ ছুষ্ট ভাবে একেবারে বিসর্জন দিলে আশ্রয়তত্ত্বের স্বরূপ-সৌন্দর্য্যের সম্পূর্ণ দর্শন পাওয়া যায়।

“সমাধিদৃষ্ট স্বরূপ-সৌন্দর্য্য”—সমস্ত চিত্তত্বপ্রতি-পোষক ভগবৎসৌন্দর্য্যটী নরভাবস্বরূপ। ভগবৎস্বরূপে শক্তি ও করণের ভিন্নতা নাই, তথাপি চিত্তপ্রভাবগত সন্ধিনী, বিশেষ ধর্ম্মের সাহায্যে, করণসকলকে একরূপ উপযুক্ত স্থানগত

করিয়াছে যে, তাহাতে একটী অপূর্ব্ব শোভা উৎপন্ন হইয়াছে। সমস্ত চিদচিজ্জগতে সে শোভার তুলনা নাই। ভগবত্ত্বয়ে দেশ ও কালের প্রভুতা না থাকায় ভগবৎস্বরূপের অণুত্ব বা বৃহত্ত্ব দ্বারা কিছু মাহাত্ম্য স্থাপিত হয় না, বরং প্রকৃতির অতীত ধর্ম্মরূপ মধ্যমাকারের সর্ব্বত্র সর্ব্বদা পূর্ণত্বরূপ কোন চমৎকার ভাব দৃষ্ট হয়। অতএব সমাধিযোগে সমস্ত মৌন্দর্য্যের আধারস্বরূপ ভগবানের কলেবরসত্তা দর্শন লাভ হয়। ভগবদ্রূপসত্তা আরও মধুর। সমাধিচক্ষু যত গাঢ়-রূপে রূপসত্তায় নিযুক্ত হয়, ততই কোন অনির্ব্বচনীয় স্নিগ্ধ শ্যামবর্ণ তাহাতে লক্ষিত হয়। বোধ হয় ঐ চিন্ময়রূপের প্রতিফলরূপ মায়িক ইন্দ্রনীলমণি মায়িক চক্ষুর শীতলতা সম্পন্ন করে অথবা মায়িক নবজলধরগণ উত্তাপপীড়িত মায়িক চক্ষু আনন্দ বর্দ্ধন করে। সন্ধিনী, সঙ্ঘিৎ, হ্লাদিনীরূপ ত্রিতত্ত্বের কোন অপূর্ব্ব ভঙ্গিমা অখণ্ডরূপে ভগবৎমৌন্দর্য্যে ত্রিভঙ্গ-রূপে গুস্ত রহিয়াছে। চিজ্জগতের 'অত্যন্ত প্রফুল্লতায়ুক্ত নয়নদ্বয় ঐ স্বরূপের শোভা বিস্তার করিতেছে। বোধ হয় জড়জগতে ঐ চক্ষুদ্বয়ের প্রতিফলনরূপ কমলের অবস্থান। ঐ স্বরূপের শিরোভাগে কোন অপূর্ব্ব বিচিত্রতা লক্ষিত হইতেছে। বোধ হয় শিখিপুচ্ছ জড়জগতে উহারই প্রতিফলন। কোন অনায়াসসিদ্ধ চিৎপুষ্পের মালা ঐ স্বরূপের গলদেশের শোভা বিস্তার করিতেছে। বোধ হয় স্বভাবকৃত বনফুলের শোভা জড়জগতে তাহার প্রতিফলন। চিৎসঙ্ঘিৎ-প্রকাশিত চিৎ-প্রভাবগত জ্ঞান ঐ স্বরূপের কটিদেশকে আচ্ছাদন

করিয়াকে। বোধ হয়, নবজলধরের অধোভাগগত সৌদামিনী জড়জগতে উহার প্রতিফলন হইবে। কৌস্তভাদি চিদগত রত্ন ও অলঙ্কারসকল ঐ স্বরূপের শোভা বিস্তার করিতেছে। চিদাকর্ষণাত্মক সুমিষ্ট আহ্বান যদ্বারা হইতেছে, ঐ চিদ্বস্তুরকে বংশীরূপে লক্ষিত হয়। প্রাপঞ্চিক রাগরাগিনী চালকরূপ বংশীাদ উহার প্রতিফলন হইয়া থাকিবে। চিদ্রবতারূপ ঘনুনাগুলিনে ও চিংপুলকরূপ কদম্বতলে ঐ অচিন্ত্যস্বরূপ পরিলক্ষিত হইতেছে। এই সমস্ত চিল্লক্ষণের দ্বারা চিদ্-চিজ্জৎপতি নন্দনয় শ্রীকৃষ্ণ সমাধিতত্ত্বে বৈষ্ণবগণকর্তৃক লক্ষিত হ'ন। এই সকল চিল্লক্ষণের প্রতিচ্ছায়ারূপ মায়িক পদার্থ আছে বলিয়া চিদ্বস্তুর অনাদর করা সারগ্রাহীর কার্য্য নয়। সমস্ত চিল্লক্ষণ যথাযোগ্য স্থান প্রাপ্ত হইয়া ভগবৎ-স্বরূপকে সর্ব্বচমৎকারকারী করিয়াকে। সমাধি যত গাঢ় হইবে ততই অধিক সূক্ষ্মদর্শন হইবে, সমাধি যত অল্প হইবে ততই ঐ স্বরূপতত্ত্বের বিশেষাভাব ও অবিলক্ষিতরূপ গুণাদির অদৃশ্যতা সিদ্ধ হইবে। দুর্ভাগ্যবশতঃ মায়িকজ্ঞানপীড়িত লোকেরা সমাধিদ্বারা বৈকুণ্ঠের প্রতি অক্ষিপাত করিয়াও চিংস্বরূপ ও চিদ্বিশেষ দর্শন করিতে সক্ষম হন না। এ কারণে তাঁহাদের চিদালোচনা স্বল্প ও প্রেমসম্পত্তি নিতান্ত ক্ষুদ্র হইয়া থাকে। সেই সমাধিলক্ষিত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ফোটাকর্ষণস্বরূপ বংশীগীতের দ্বারা চিদচিংজগৎকে উন্মত্ত করিয়া গোপীদিগের চিত্তহরণ করেন। জাত্যাদি মদবিক্রম যাহাদের হৃদয়কে ছুঁই করিয়াকে, তাহারা কিরূপে কৃষ্ণলাভ করিতে পারে?

প্রপঞ্চগত দৃষ্টমদ ছয় প্রকার ; অর্থাৎ জাতিমদ, রূপমদ, গুণমদ, জ্ঞানমদ, ঐশ্বর্য্যমদ ও ওজোমদ । এই সকল মদমত্ত পুরুষেরা ভক্তিভাব অবলম্বন করিতে পারে না । জ্ঞানমদদূষিত ব্যক্তিগণ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বকে সম্পূর্ণরূপে তুচ্ছ জ্ঞান করেন । তাঁহারা পারক্য-চিন্তায় ব্রহ্মানন্দকে ভক্তির অপেক্ষা অধিক সম্মান করেন । মদরহিত পুরুষেরা গোপ ও গোপীভাব প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণানন্দ লাভ করেন । কৃষ্ণতত্ত্বে গোপগোপীদিগেরই অধিকার, কেবল গোপীশব্দ ব্যবহৃত হইবার কারণ এই যে, এস্থলে কান্ত-ভাবাশ্রিত সর্ব্বোচ্চ রসের ব্যাখ্যা হইতেছে । শান্ত, দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্যগত পুরুষেরা ব্রজভাবাপন্ন, তাঁহারাও নিজ নিজ ভাবগত কৃষ্ণরস উপলব্ধি করেন । বাস্তবতত্ত্ব এই যে, সমস্ত জীবের ব্রজভাবে অধিকার আছে । মাধুর্য্যভাব হৃদয়স্থ হইলেই জীবের ব্রজধামপ্রাপ্তি সিদ্ধ হয় । ব্রজধামগত জীবের পূর্ব্বোক্ত পঞ্চরসের মধ্যে যে রস স্বভাবতঃ ভাল লাগে, তাইহা তাঁহার নিত্যসিদ্ধ ভাব । সেই ভাবগত হইয়া তিনি উপাসনা করিবেন, কিন্তু এস্থলে কেবল কান্তভাবগত জীবের চরমাবস্থা প্রদর্শিত হইল । গোপীভাবপ্রাপ্ত পুরুষদিগকে সিদ্ধ বলা যায় এবং ঐ ভাবের যাঁহারা অনুকরণ করেন তাঁহারা সাধক । অতএব পরমার্থবিৎ পণ্ডিতেরা সিদ্ধ ও সাধক এই দুই প্রকার সাধু আছেন বলিয়া স্বীকার করেন । গোপীভাবগত জীবের সাধনক্রম প্রদর্শিত হইতেছে । সংসারে ভ্রমণ করিতে করিতে যে সকল জীবের কর্ণে শ্রীকৃষ্ণের ফোটের প্রকাশ বেণুগীত প্রবেশ করে, তাঁহাদিগকে গীতমাধুর্য্য আকর্ষণ করিয়া উৎকৃষ্ট

অধিকারী করে। সংসারী লোকদিগের মায়াভোগরূপ পৌরুষই তাহাদের অনর্থ। অশ্রিততত্ত্বের আশ্রয়ত্যাগক্রমে মায়ার উপর পুরুষত্ব সিদ্ধ হয়। ঐ পুরুষভাব শীঘ্র দূর হইলে, পুনরায় কান্তরসাসক্ত পুরুষদিগের আশ্রিতভাব প্রাপ্তি হয় এবং সাধক আত্মায় ভগবদ্ব্যোগ্যতারূপ অপ্রাকৃত স্ত্রীত্ব উপস্থিত হয়। ক্রমশঃ পূর্ব্বরাগের এতদূর প্রাত্তর্ভাব হয় যে, জীব উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠে। যাহারা কৃষ্ণরূপ দর্শন করিয়াছেন, তাহাদের নিকট ঐ রূপ বর্ণন পুনঃপুনঃ শ্রবণ করিয়া এবং চিত্রপট দর্শন-পূর্ব্বক তাহার কৃষ্ণপ্রাপ্তিলালসা অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। জীবের সহজ জ্ঞানে ভগবদাকর্ষণের উপলব্ধির নাম কৃষ্ণগীত-শ্রবণ। কৃষ্ণরূপদর্শকেরা শাস্ত্রে যাহা যাহা বর্ণন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া কৃষ্ণোপলব্ধির নাম কৃষ্ণগুণ-শ্রবণ। শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বকৌশল দর্শনের নাম চিত্রপট-দর্শন। মায়িক বিশ্বটী চিহ্নিশ্বের প্রতিভাত ছবি, ইহা যাহার বোধগম্য হইল, তিনি চিত্রপট দর্শন করিয়াছেন বলা যায়। অথবা সহজ জ্ঞানে ভগদর্শন, শাস্ত্রালোচনাদ্বারা ভগত্বপলব্ধি এবং বিশ্বকৌশলে ভগবদ্ভার দর্শন এই প্রকার ত্রিবিধ উপায়ে প্রথমে বৈষ্ণবতা সংগৃহীত হয়, ইহা বলিলেও হইতে পারে। ব্রজভাবের আশ্রয়রূপ শ্রীকৃষ্ণে বিমল-শ্রদ্ধাই পূর্ব্বরাগ অর্থাৎ প্রাগ্ভাব। সেই শ্রদ্ধার উদয় হইলে ব্রজবাসী সাধুদিগের সঙ্গ হয়। সাধুসঙ্গই কৃষ্ণলাভের হেতু। ফোঁটবাহক সাধুকৃপাদ্বারা ফোঁটশক্তি প্রাপ্ত এইরূপ ভাগ্যবান পুরুষদিগের ক্রমশঃ কৃষ্ণাভিমুখ অভিসার হইতে হইতে চিদ্রুবতারূপ যমুনার

তটে পরম কান্তের সহিত শুভ মিলন হয়। তখন কৃষ্ণসঙ্ক্রমে ব্রহ্মানন্দতুচ্ছকারী পরানন্দ স্বভাবতঃ প্রবৃত্ত হয়। সুতরাং পূর্বাশ্রিত মায়িক গার্হাস্থ্য তৎক্ষণাৎ প্রেমসমুদ্রের নিকট গোপ্পদের তুল্য হইয়া পড়ে। তাহার পর, প্রতিদিন সমস্ত আত্মার আত্মস্বরূপ নিত্য নূতন বিগ্রহে পরমানন্দ অসীম হইয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ভগবদ্বিগ্রহ সর্বক্ষণ রসরসান্তরের আশ্রয় হইয়া অপূর্ব নূতনতা অবলম্বন করে, অর্থাৎ অশ্রিতজনের রসপিপাসা বৃদ্ধি হয়, কখনও তৃপ্ত হয় না। চিজ্জগতে শান্তাদি পাঁচটি সাক্ষাৎ রস ও বীর-করণাদি সাতটি গৌণরস সমাধিগত পুরুষেরা দর্শন করিয়াছেন। যখন বৈকুণ্ঠতত্ত্বের প্রতিচ্ছায়ারূপ মায়িক জগৎ পরিলক্ষিত হইয়াছে, তখন মায়িক জগৎস্থ সকল রসেরই আদর্শ বৈকুণ্ঠে বিশুদ্ধভাবে আছে, তাহাতে সন্দেহ কি? পূর্বাশ্রিত রতির মূলতত্ত্ব গাঢ়রূপে পুনরায় বিচারিত হইতেছে। —সান্দ্রানন্দরূপ প্রীতির বীজস্বরূপ রতিই ভজনক্রিয়ার মূলতত্ত্ব। চিদানন্দ জীবের সচ্চিদানন্দ ভগবত্তত্ত্বের প্রতি যে স্বতঃসিদ্ধা আনুরক্তি, তাহাই রতি। চিদস্তর পরস্পর আকর্ষণ ও অনু-রাগরূপ স্বভাবসিদ্ধ প্রবৃত্তি জীব ও কৃষ্ণের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল। তাহাই পারমহংস অলঙ্কার-শাস্ত্রের উদ্দেশ্য স্থায়ীভাব। সেই রতি, রসতত্ত্বের অতি সূক্ষ্মমূল। সংখ্যাগণনায় এক যেরূপ মূলস্বরূপ হইয়া তদ্বর্ক সমস্ত সংখ্যায় ব্যাপ্ত আছে, প্রীতির পুষ্টি অবস্থায় প্রেম, স্নেহ, মান, রাগ প্রভৃতি দশাতেও রতি তদ্রূপ মূলরূপে লক্ষিত হয়। প্রীতির সমস্ত ক্রিয়াতে রতিকে মূলরূপে

লক্ষ্য করা যায় এবং ভাব ও সামগ্রীসকলকে স্বক্ৰমশাখা বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। অতএব রতি রসকে আশ্রয় করত রসরূপী হইয়া বর্ধমানা হয়েন। রস মুখ্য ও গৌণভেদে দ্বাদশ প্রকার। শান্ত, দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পঞ্চবিধ মুখ্যরস সম্বন্ধভাবরূপী। বীর, করুণ, রৌদ্ৰ, হাস্য, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুত—এই সাতটি গৌণরস। ইহারা সম্বন্ধ হইতে উৎথিত হয়। আদৌ রতির বেদনাসত্তা থাকিলেও যে পর্য্যন্ত সম্বন্ধভাবের আশ্রয় না পায়, সে পর্য্যন্ত উহার কৈবল্যাবস্থায় ব্যক্তির সম্ভাবনা নাই। সম্বন্ধাশ্রয়ে রতির ব্যক্তি হয়। সেই ব্যক্তিগত বিশেষ ভাবসকলই গৌণরস। রসরূপ স্বীকার করত ঐ রতি আর চারিটি সামগ্রীসহযোগে সম্যক্ দীপ্তিপ্রাপ্ত হয়। রসাশ্রয়ে ব্যক্তি সিদ্ধ হইলেও সামগ্রী ব্যতীত রতি প্রকাশ পায় না। সামগ্রী চারি প্রকার অর্থাৎ বিভাব, অনুভাব সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী। বিভাব দুই প্রকার—আলম্বন ও উদ্দীপন। আলম্বন দুই প্রকার—কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্ত। তাঁহাদের গুণ ও স্বভাব প্রভৃতি রতির উদ্দীপনরূপ বিভাব। অনুভাব তিন প্রকার—অলঙ্কার, উদ্ভাস্বর ও বাচিক। ভাব, হাব প্রভৃতি বিংশতি প্রকার অলঙ্কার অঙ্গজ, অযত্নজ ও স্বভাবজ এই তিন-ভাবে বিভক্ত হইয়াছে। জুস্তা, নৃত্য, লুপ্তন প্রভৃতি শারীরিক ক্রিয়াগুলিকে উদ্ভাস্বর বলে। আলাপ, বিলাপ প্রভৃতি দ্বাদশটি বাচিক অনুভাব। স্তম্ভ, স্বেদ প্রভৃতি আটপ্রকার সাত্ত্বিক বিকার। নির্বেদ প্রভৃতি তেত্রিশটি ব্যভিচারী ভাব আছে। রতির মহাভাব পর্য্যন্ত পুষ্টিকার্য্যে রস ও সামগ্রীসকলের নিত্য

প্রয়োজন আছে। এই কৃষ্ণরতি স্থায়িত্ব ভক্তিরস। বদ্ধজীবে প্রপঞ্চ-সম্বন্ধবশতঃ ভক্তিস্বরূপে ইহার প্রতীতি। মুক্তজীবে শ্রীতিতত্ত্বরূপে বৈকুণ্ঠাবস্থায় নিত্য বর্তমান। রতির মহাভাব পর্য্যন্ত ক্রম, তাহার মুখ্য ও গৌণ রসাত্মক ও সামগ্রী-সাহায্যে বিচিত্রপুষ্টিপ্রাপ্তিরূপ রসসমুদ্রের অনন্ত মাধুর্য্য মুক্ত-জীবগণের নিত্য ধন। বদ্ধ জীবদিগের তাহাই সাধ্য। যদি বল, আত্মার চিন্ময় আনন্দ-রস নিত্য হইলে সাধনের প্রয়োজন কি? তবে বলি, জীবের রতি জড়গতা হইয়া বিকৃত হইয়াছে। হৃদয়ে শুদ্ধরতির প্রাকট্য করাই ইহার সাধন। সহজ-সমাধি-যোগে ব্যাস প্রভৃতি বিদ্বজ্জনগণ দেখিয়াছেন যে, জীবের সিদ্ধ-সত্তায় রতিতত্ত্বই সর্বোপাদেয়। আদর্শের ধর্ম্ম কিয়ৎপরিমাণে বিস্থিতসত্তায় প্রতিভাত হইয়া থাকে। এতন্নিবন্ধন প্রাকৃত রতিসত্তাও সমস্ত প্রাকৃতসত্তা অপেক্ষা রমণীয় হইয়াছে। কিন্তু প্রাকৃত স্ত্রীপুরুষ-গত রতি, অপ্রাকৃত রতির নিকট অতিশয় তুচ্ছ ও জুগুপ্সিত। যথা রাসপঞ্চাধ্যায়ে—“বিক্রীড়িতং ব্রজবধু-ভিরিদঞ্চ বিষ্ণেঃ শ্রদ্ধাষ্মিতোহনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্যঃ। ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥” নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণের সহিত নিত্যসিদ্ধ জীবগণের মহা-ভাবাবধি ভাব ও মহারাসাবধি ক্রিয়া বর্ণিত হইল। জড়জন্তু বাক্যের এই পর্য্যন্ত শেষ গতি। ইহার অতিরিক্ত যাহা আছে, তাহা সমাধিদ্বারা স্ফোটশক্তির প্রকাশে লক্ষিত হইবে।

ব্রজভাবগত কৃষ্ণভক্তদিগের প্রতি স্ফোটের প্রক্রিয়া—শ্রীকৃষ্ণে যাঁহাদের রাগ উদিত

হইয়াছে, অথবা পূর্বরাগরূপ শ্রদ্ধার উদয় হইয়াছে, তাঁহাদের আচরণ সর্বত্র বিশুদ্ধরূপে লক্ষিত হয়। এস্থলে রাগতত্ত্বের স্বরূপ বিচার করা প্রয়োজন। চিত্ত ও বিষয়ের বন্ধনসূত্রের নাম প্রীতি। সেই বন্ধনসূত্র বিষয়ের যে অংশ অবলম্বন করিয়া থাকে তাহার নাম রঞ্জকতা ধর্ম। চিত্তের যে অংশ অবলম্বন করিয়া থাকে তাহার নাম রাগ। চিত্ত ও বিষয়ের বিচারটী বিশুদ্ধ আত্মগত রাগ ও অশুদ্ধ মনোগত রাগ উভয়েরই সামান্য লক্ষণ। রাগ যখন প্রথমে ক্রিয়ৎ পরিমাণে আত্মপরিচয় দেয়, তখন তাহার নাম শ্রদ্ধা শ্রদ্ধাবান্ ও অনুরক্ত উভয়বিধ পুরুষের চরিত্র সর্বত্র নির্মল কারণ, জীবের রাগতত্ত্ব এক। বিষয়রাগ ও ব্রহ্মরাগে সত্তার ভিন্নতা নাই, কেবল বিষয়ের ভিন্নতা মাত্র। ঐ রাগ যখন বৈকুণ্ঠাভিমুখ হয়, তখন প্রপঞ্চ বিষয়ে রাগ থাকে না, কেবল আবশ্যিক মত প্রপঞ্চ স্বীকার ঘটিয়া থাকে। স্বীকৃত বিষয় সকলও তখন বৈকুণ্ঠভাবাপন্ন হয়, অতএব সমস্ত রাগই অপ্রাকৃত হইয়া পড়ে। রাগাভাব হইলে আসক্তি অবশ্যই খর্ব হয় এবং অশুদ্ধরূপে বিষয়স্বীকারে একপ্রকার অশ্রদ্ধা স্বভাবতঃ লক্ষিত হয়। অতএব ভক্তজনের পাপকার্য্য প্রায়ই অসম্ভব; যদিও কদাচিত্ অশুদ্ধাচার হইয়া পড়ে, তজ্জন্মও তাঁহাদের প্রায়শ্চিত্ত নাই। ইহার মূল তাৎপর্য্য এই যে,—পাপ—কার্য্যরূপী ও বাসনারূপী। কার্য্যরূপী পাপকে পাপ বলা যায় এবং বাসনারূপী পাপকে পাপবীজ বলা যায়। কার্য্যরূপী পাপে স্বরূপ-সিদ্ধাবস্থা নাই, যেহেতু বাসনা-অনুসারে একই কার্য্য কখন

পাপ, কখন নিষ্পাপ হইয়া উঠে। বাসনা অর্থাৎ পাপবীজের মূলানুসন্ধান করিলে শুদ্ধ আত্মার দেহাত্মাভিমানরূপ স্বরূপভ্রমই সমস্ত পাপবাসনার একমাত্র মূলহেতু বলিয়া নির্দিষ্ট হয়। সেই দেহাত্মাভিমানরূপ স্বরূপ ভ্রম বা অবিद्या হইতে পাপ ও পুণ্য উভয়েরই উৎপত্তি। অতএব পাপ-পুণ্য উভয়ই সাস্বক্ষিক, আত্মার স্বরূপগত নয়। যে কৰ্ম্ম বা বাসনা সাস্বক্ষিকরূপে আত্মার স্বরূপ প্রাপ্তির সাহায্য করিলেও করিতে পারে, তাহাই পুণ্য। যদ্বারা সে সাহায্যের সম্ভাবনা নাই তাহাই পাপ। কৃষ্ণভক্তি যখন আত্মার স্বরূপ ও স্বধৰ্ম্মালোচনারূপ কার্য্য-বিশেষ হইয়াছে, তখন যে আধারে তাহা লক্ষিত হয়, সে আধারে সমস্ত পাপপুণ্যরূপ সাস্বক্ষিক অবস্থার মূলস্বরূপ অবিद्या ক্রমশঃ ভর্জিত হইয়া সম্পূর্ণ লোপ পাইতেছে। মাঝে মাঝে যদিও ভর্জিত 'কই' মৎস্যের ত্রায় হঠাৎ পাপ-বাসনা বা পাপ উদগত হয়, তাহা সহসা ক্রিয়াবতী ভক্তির দ্বারা প্রশমিত হইয়া পড়ে। সে স্থলে প্রায়শ্চিত্ত-চেষ্টা বিফল। প্রায়শ্চিত্ত তিন প্রকার—কৰ্ম্মপ্রায়শ্চিত্ত, জ্ঞান-প্রায়শ্চিত্ত ও ভক্তিপ্রায়শ্চিত্ত। কৃষ্ণানুস্মরণ-কার্য্যই ভক্তি-প্রায়শ্চিত্ত। অতএব ভক্তিই ভক্তিপ্রায়শ্চিত্ত। ভক্তদিগের প্রায়শ্চিত্তপ্রয়াসে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। অনুতাপকার্য্য-দ্বারা জ্ঞানপ্রায়শ্চিত্ত হয়। জ্ঞানপ্রায়শ্চিত্তক্রমে পাপ ও পাপবীজ অর্থাৎ বাসনার নাশ হয়, কিন্তু ভক্তিব্যতীত অবিद्याর নাশ হয় না। চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি কৰ্ম্মপ্রায়শ্চিত্তদ্বারা পাপ প্রশমিত হয়, কিন্তু পাপবীজ বাসনা এবং পাপ ও তদ্বাসনা-

মূল অবিছা পূর্ববৎ থাকে। অতি সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা-এই প্রায়-শ্চিত্ত বুদ্ধিতে হইবে।

কোন বিদেশীয় বাৎসল্যরসাপ্রিত ভক্তিতত্ত্বে অনুতাপের বিধান দেখা যায়, কিন্তু ঐ বাৎসল্যভাব—জ্ঞানমিশ্র ও ঐশ্বর্য্যগত থাকায় সেরূপ বিধান অযুক্ত নয়। কিন্তু মাধুর্য্যগতা অহৈতুকী কৃষ্ণভক্তিকে ভয়, অনুতাপ ও মুমুক্কারূপ বৈরস্ব্য অপকারী হইয়া পড়ে। প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধরূপ পূর্বপাপ নির্মূলকরণ ও আত্মার স্বরূপাবস্থান সাধন—এই দুইটী ভক্তির অবান্তর ফল, সুতরাং ভক্তসম্বন্ধে অনায়াসসিদ্ধ। জ্ঞানীদিগের পক্ষে ব্যতিরেকচিন্তারূপ অনুতাপক্রমে অপ্রারব্ধ পাপ নাশ হয়, কিন্তু পারব্ধ পাপ জীবনযাত্রায় ভুক্ত হয়। কৰ্মীদের সম্বন্ধে পাপের দণ্ডরূপ ফলভোগক্রমেই পাপক্ষয় হয়। প্রায়-শ্চিত্ততত্ত্বে অধিকারবিচার নিতান্ত প্রয়োজন। পশুস্বভাব হইতে নরস্বভাব এবং সামান্য বৈধ স্বভাব হইতে স্বাধীন রাগাত্মক স্বভাব পর্য্যন্ত অনেক অধিকার লক্ষিত হয়। যাহার অধিকারে যাহা কর্তব্য, তাহাই তাহার পক্ষে গুণ এবং যাহার অধিকারে যাহা অকর্তব্য, তাহাই তাহার পক্ষে দোষ। এই বিধি অনুসারে সমস্ত কার্য্য বিচারিত হইলে স্বতন্ত্ররূপে গুণদোষের সংখ্যা করিবার প্রয়োজন কি? অধিকারবিচারে যাহা এক ব্যক্তির পুণ্য তাহা অন্য ব্যক্তির পাপ। শৃগাল-কুক্কুবের পক্ষে চৌর্য্য ও ছাগের পক্ষে অবৈধ মৈথুন পাপ হইতে পারে না। মানবের পক্ষে অবশ্য তাহা পাপ বলিয়া গণ্য হয়। বিষয়-পুরুষের পক্ষে বিবাহিত স্ত্রীসঙ্গ কর্তব্য। কিন্তু যাহার সংসার-

রাগাক্রান্ত রাগ পূর্ণরূপে পরমেশ্বরে অর্পিত হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে একপত্নী-প্রেমও নিষিদ্ধাচার কেন না বহুভাগ্যোদয়ে যে পরম-প্রীতির উদয় হইয়াছে, তাহাকে বিষয়প্রীতিরূপে পর্য্যবসান করা অবনতির কার্য্য বলিতে হইবে। পক্ষান্তর, অত্যন্ত পশুভাবাপন্ন পুরুষের পক্ষে এক বিবাহ দূরে থাকুক, বিবাহবিধিদ্বারা স্ত্রীসংসর্গ স্বীকার করাই পুণ্য। অপিচ উপাসনাপর্বে প্রথম ঈশ্বরসাম্মুখ্য হইতে আরম্ভ হইয়া ব্রজ-ভাবের উদয় পর্য্যন্ত তমোগুণ হইতে সত্ত্বগুণাবধি সগুণ ও তদনন্তর নিগুণ; এইরূপ সাধকের স্বভাব, জ্ঞানোন্নতি ও বৈকুণ্ঠপ্রবৃত্তির কৈবল্য-অনুসারে অসংখ্য অধিকার লক্ষিত হয়। ঐ সকল ভিন্নভিন্নাধিকারে কর্ম্ম ও জ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখা যায়। বিচারক স্বয়ং এ সকল স্থির করিয়া লইতে পারেন। পাপ-পুণ্য, ধর্ম্ম-অধর্ম্ম, নিবৃত্তি-প্রবৃত্তি স্বর্গ-নরক; বিছা ও অজ্ঞান ইত্যাদি যত প্রকার দ্বন্দ্বভাব আছে, এ সমুদয়ই বিকৃত-রাগ পুরুষদিগের বাদ মাত্র; বাস্তবিক স্বরূপতঃ ইহারা কেহ দোষ গুণ নয়। সাম্বন্ধিকভাবে ইহাদিগকে গুণদোষ বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয়। স্বতন্ত্ররূপে বিচার করিলে স্বরূপতঃ আত্ম-রাগের বিকারই দোষ ও আত্মরাগের স্বরূপাবস্থিতিই গুণ। যে কার্য্য যখন গুণের পোষক হয়, তখন তাহাই গুণ ও যে কার্য্য যখন দোষের পোষক হয়, তখন তাহাই দোষ বলিয়া সারগ্রাহি-গণ স্থির করেন। তাঁহারা অনাত্মক শুষ্ক তর্কে ও পক্ষাশ্রিত বাদসকলে সম্মত হন না। প্রীতির পুষ্টিই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। ইহা জ্ঞাত হইয়া কৃষ্ণভক্তগণ সম্প্রদায়বিবাদে ও

বাহুলিঙ্গ সকলে আসক্ত হন না, অথবা বিদেষণ করেন না, যেহেতু তাঁহারা সামান্য পক্ষপাত কার্যে নিতান্ত উদাসীন।

হরিভক্ত পণ্ডিতগণ অবগত আছেন যে, তাহাকেই কৰ্ম বলা যায় যদ্বারা ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র তুষ্ট হন এবং তাহাকেই বিদ্যা বলা যায় যাহাদ্বারা কৃষ্ণে মতি হয়। এইটী স্মরণ করত তাঁহারা সমস্ত প্রয়োজনসাধক কৰ্ম করেন এবং সমস্ত পরমার্থপোষিকা বিদ্যার অর্জন করেন। তদিতর সমস্ত কৰ্ম ও জ্ঞানকেই তাহারা ফল্য বলিয়া জানেন। তাঁহারা স্বভাবতঃ স্থিতপ্রজ্ঞ, নম্রস্বভাব ও সর্বভূতের হিতসাধনে তৎপর। তাঁহাদের বুদ্ধি এত স্থির যে, জীবনকালে বা জীবনাত্যয়ে নানাবিধ প্রপঞ্চ-যন্ত্রণা ঘাটিলেও পরামার্থতত্ত্ব হইতে বিচলিত হন না। রাগের প্রাচুর্ভাবে মন ও দেহের স্বভাবতঃ ভিন্নতাপ্রাপ্তিবশতই হউক অথবা রাগতত্ত্বকে উপলব্ধি করিবার জন্ত স্বরূপ জ্ঞানালোচনা-দ্বারাই হউক, ব্রজভাবগত কৃষ্ণভক্তদিগের একটী সিদ্ধান্ত স্বাভাবিক হইয়া উঠে। সিদ্ধান্ত এই যে, জীবাত্মা স্বভাবতঃ শুদ্ধও কেবল অর্থাৎ মায়িকগুণের কোন অপেক্ষা করেন না। আপাততঃ যাহাকে আমরা মন বলি, তাহার নিজ সত্তা নাই, আত্মার জ্ঞানবৃত্তির প্রপঞ্চসম্বন্ধবিকারমাত্র। আত্মার সিদ্ধ-বৃত্তিসকল সাম্বন্ধিক-অবস্থায় মনোবৃত্তিস্বরূপে লক্ষিত হয়। বৈকুণ্ঠগত আত্মার স্ববৃত্তিদ্বারা কার্য্য হয়, তথায় এই মন থাকে না। আত্মার প্রপঞ্চসম্বন্ধে শুদ্ধ জ্ঞান সুপ্তপ্রায় হইলে বিকৃত জ্ঞানকেই জ্ঞান বলিয়া স্বীকার করে। এই জ্ঞান মনের কার্য্য ও জড় জানিত। ইহাকেই বিষয়জ্ঞান বলা যায়। আমাদের

বর্তমান দেহ প্রাপঞ্চিক, ইহার সহিত আত্মার বন্ধকালাবধি সম্বন্ধ মাত্র। এই স্থূল ও লিঙ্গদেহের সহিত বিশুদ্ধ আত্মার সংযোগপ্রণালী কেবল পরমেশ্বরই জানেন, মানবগণের জানিবার অধিকার নাই। যে পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র ইচ্ছা বর্তমান থাকে, সে পর্য্যন্ত ভক্তিয়োগে ভক্তদিগের শরীরযাত্রা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। জীব স্বয়ং চিত্ত্ব, স্বভাবতঃ ভগবদ্ভাস এবং প্রীতিই তাঁহার একমাত্র ধর্ম। আদৌ হৃদয়নিষ্ঠানুসারে জীবের পতনকালে কৃষ্ণেচ্ছাক্রমে এই অনির্দেশ্য বন্ধনব্যাপার সিদ্ধ হওয়ায় মঙ্গলাকাজক্ষী জীবের পক্ষে ভক্তিয়োগই একমাত্র শ্রেয়ঃ। ভক্তিয়োগদ্বারা ভগবৎকৃপার উদয় হইলে, অনায়াসে চিজ্জড়ের সংযোগ দূর হইবে। নিজচেষ্টি দ্বারা অর্থাৎ দেহপাত বা কর্মত্যাগরূপ নিশ্চেষ্টতা অথবা ভগবদ্বিদ্রোহতা-সহকারে ইহা কখনই সিদ্ধ হইবে না, সমাধিদ্বারা এই পরম সত্যটি প্রাপ্ত হওয়া যায়। কর্মজ্ঞানাত্মক মানবজীবন যখন ভক্তির অনুরূপ হয়, তখনই ভক্তিয়োগের উদয় হয়। ইহা অবগত হওত, ব্রজভাবাঢ্য পুরুষগণ বৈকুণ্ঠস্থ হইয়া সমাধিয়োগে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করেন। আত্মার চিৎসত্তায় যখন প্রেমের বাহুল্য হইয়া উঠে, তখন মনোময় লিঙ্গদেহে পবিত্র প্রীতি উচ্ছলিতা হইয়া মিশ্রভাবগত হয়। ঐ অবস্থায় মনন, স্মরণ, ধ্যান, ধারণা ও ভূতশুদ্ধির চিন্তা ইত্যাদি মানস-পূজার নানাবিধ ভাবের উদয় হয়। মানসপূজাকার্যে মিশ্রভাব আছে বলিয়া তাহা পরিহার্য্য নয়; যেহেতু লিঙ্গভঙ্গপর্য্যন্ত উহা নিসর্গসিদ্ধ থাকে। জড় হইতে আদৌ যে সকল মানসক্রিয়া

সংগৃহীত হইয়া থাকে, ঐ সকলই প্রপঞ্চজনিত পৌত্তলিকভাব ; কিন্তু সমাধিগত আত্মচেষ্টা হইতে যে সকল ভাব উচ্ছলিত হইয়া মানসযন্ত্রে ও ক্রমশঃ দেহে ব্যাপ্ত হয়, সে সকল চিৎপ্রতিফলন-স্বরূপ সত্যগর্ভ । অতএব বদ্ধজীবে প্রীতির কার্য্যসকল মানসিক কার্য্য বলিয়া লক্ষিত হয় ; ঐ সকল মানসগত চিৎপ্রতিফলন পুনরায় অধিকতর উচ্ছলিত হইয়া দেহগত হয় । জিহ্বাগ্রে আসিয়া চিৎপ্রতিফলিত ভগবনামগুণাদি কীর্ত্তন করে । কর্ণ-সন্নিকটস্থ হইয়া ভগবনামগুণাদি শ্রবণ-স্বরূপ প্রাপ্ত হয় । চক্ষুগত হইয়া জড় জগতে প্রেমময় সচ্চিদানন্দপ্রতিফলিত ভগবন্মূর্ত্তি দর্শন করে । আত্মগত শুদ্ধসাত্ত্বিক ভাবসকল দেহে উচ্ছলিত হইয়া পুলক, অশ্রু, শ্বেদ, কম্প, নৃত্য, দণ্ডবনতি, লুপ্তন, প্রেমালিঙ্গন, ভগবত্তীর্থপর্য্যটন প্রভৃতি কার্য্যসকল উদ্ভিত করে । আত্মগত ভাবসকল আত্মাতেই সক্রিয়রূপে অবস্থান করিতে পারিত, কিন্তু আত্মার স্বরূপাবস্থানসম্বন্ধে ভগবৎকুপাই প্রাকৃত জগতে চিন্তাবের উচ্ছলন-কার্য্যে প্রধান উদ্যোগী । বিষয়রাগকে ভগবদ্ভাগরূপে উন্নত করিবার আশয়ে প্রবৃত্তির পরাগ্গতি পরিত্যাগ ও প্রত্যগ্গতি সাধনের জন্ত ভগবদ্ভাবসকল বিষয়ে বিমিশ্রিত হইয়াছে । মনোযন্ত্রের দ্বারা ইন্দ্রিয়দ্বার অতিক্রম করত আত্মা যে বিষয়াভিমুখে ধাবমান হন, তাহার নাম আত্মার পরাগ্গতি । ঐ প্রবৃত্তিশ্রোত পুনরায় স্বধামে ফিরিয়া যাইবার নাম প্রত্যগ্গতি । সুখাঙ্ক-লালসার প্রত্যঙ্কস্ম-সাধনার্থে মহাপ্রসাদ-সেবন ব্যবস্থাপিত হইয়াছে । শ্রীমূর্ত্তি ও তার্থাদি দর্শনদ্বারা দর্শনবৃত্তির প্রত্যগ্গমন

সাধিত হয়। হরিলীলা ও ভক্তিশূচক গীতাদি শ্রবণদ্বারা শ্রবণ-প্রবৃত্তির প্রত্যগ্গতি সম্ভব। ভগবদর্পিত তুলসী-চন্দনাদি সুগন্ধি গ্রহণদ্বারা গন্ধপ্রবৃত্তির বৈকুণ্ঠগতি সনকাদির চরিত্রে সিদ্ধ হইয়াছে।

বৈষ্ণব-সংসার-সমৃদ্ধিমূলক বিবাহিত ভগবৎপর পত্নী বা পতিসঙ্গমদ্বারা স্ত্রী বা পক্ষান্তরে পুরুষসংযোগপ্রবৃত্তির প্রত্যগ্গতি মনু, জনক, জয়দেব, পিপাজি প্রভৃতি বৈষ্ণবচরিত্রে লক্ষিত হয়। উৎসবপ্রবৃত্তির প্রত্যগ্গতি সাধনের জন্ম হরিলীলাসংবাদির অনুষ্ঠান দৃষ্ট হয়। এই সকল প্রত্যগ্গভাবান্বিত নরচরিত্র সর্বদা সারগ্রাহীদিগের পবিত্র জীবনে লক্ষিত হয়। তবে কি সারগ্রাহী মহোদয়গণ কেবল চিৎপর হইয়া জড় কার্য্য-সকলকে অশ্রদ্ধা করেন? তাহা নয়। আত্মায় যৌষিষ্ঠ্যব প্রাপ্ত হইয়া সারগ্রাহী মহোদয়গণ কৃষ্ণভজন করেন, তথাপি সর্বদাই বাহুদেহে শারীর কৰ্ম্মসকল বীরভাবে নিৰ্ব্বাহ করিয়া থাকেন। আহার, বিহার, ব্যায়াম, শিল্পকার্য্য, বায়ুসেবন, নিদ্রা, যানারোহন, শরীররক্ষা, সমাজরক্ষা, দেশভ্রমণ প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই তাঁহাদের চরিত্রে যথাযোগ্য সময়ে লক্ষিত হয়। সারগ্রাহী বৈষ্ণব পুরুষদিগের মধ্যে বীরভাবে অবস্থিতি ও কার্য্য করেন। স্ত্রী জাতির আশ্রয় পুরুষ হইয়া যৌষিষ্ঠ্যের নিকটে পূজনীয় হন। সমাজসকলে অবস্থিত হইয়া সামাজিক কার্য্যসমুদয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। বালক-বালিকা-গণকে অর্থবিদ্যা শিক্ষা দিয়া প্রধান-শিক্ষক-মধ্যে পরিগণিত হন। শারীরিক ও মানসিক যত প্রকার বিজ্ঞান-শাস্ত্র আছে

এবং শিল্পশাস্ত্র ও ভাষাবিজ্ঞান, ব্যাকরণ, অলঙ্কারাদি শাস্ত্র প্রভৃতি সকলেই অর্থশাস্ত্র। ঐ সকল শাস্ত্রদ্বারা কোন না কোন শারীরিক, মানসিক, সাংসারিক বা সামাজিক উপকার উৎপন্ন হয়; ঐ উপকারের নাম অর্থ। ইহার উদাহরণ এই যে, চিকিৎসাশাস্ত্রদ্বারা আরোগ্যরূপ অর্থ পাওয়া যায়। গীতশাস্ত্রদ্বারা কর্ণও মনঃসুখরূপ অর্থ পাওয়া যায়। প্রাকৃত তত্ত্ববিজ্ঞানদ্বারা অনেকানেক অদ্ভুত যন্ত্র নিশ্চিত হয়। জ্যোতিষশাস্ত্রদ্বারা কালাদিনির্ণয়রূপ অর্থ সংগ্রহ হয়। এই প্রকার অর্থশাস্ত্র যাঁহারা অনুশীলন করেন, তাঁহারা অর্থবিৎ পণ্ডিত। বর্ণাশ্রমাত্মক ধর্মব্যবস্থাপক স্মৃতিশাস্ত্রকেও অর্থশাস্ত্র বলা যায় এবং স্মার্ত পণ্ডিতগণকে অর্থবিৎ পণ্ডিত বলা যায়, যে হেতু সমাজরক্ষারূপ অর্থই তাঁহাদের ধর্মের একমাত্র সাক্ষাৎ উদ্দেশ্য। কিন্তু পারমাণ্বিক পণ্ডিতেরা ঐ অর্থ হইতে সাক্ষাৎ রূপে পরমার্থ সাধন করেন। সারগ্রাহী বৈষ্ণবগণ অর্থশাস্ত্রের যথোচিত আদর করত তাহার সম্যক আলোচনা করিতে কখনই বিরত হন না। ঐ সমস্ত অর্থশাস্ত্রের চরমগতিরূপ পরমার্থ অনুসন্ধান করত তিনি সকল অর্থবিৎ পণ্ডিতের মধ্যে বিশিষ্টরূপে পূজিত হয়েন। পরমার্থনির্ণয়ে অর্থবিৎ পণ্ডিতগণ তাঁহার সহকারিত্বে পরিশ্রম করিতেছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে শান্তিসংস্থাপকরূপে সারগ্রাহী বৈষ্ণব বিরাজ করেন। নানাবিধ পাপীদিগকে ঘৃণা করিয়া তিনি পরিত্যাগ করেন না। কখন গোপনীয় উপদেশ; কখন প্রকাশ্য বক্তৃতা করত, কখন বন্ধুভাবে, কখন বিরোধভাবে, কখন স্বীয় চরিত্র দেখাইয়া, কখন বা পাপের দণ্ডবিধান করত

সারগ্রাহী বৈষ্ণবগণ পাপীদিগের চিত্তশোধনে বিশেষ তৎপর থাকেন।

সারগ্রাহী বৈষ্ণবদিগের চরিত্র সর্বদাই অদ্ভুত, কেন না পূর্বোক্ত প্রবৃত্তি-কার্যে যেমত তাঁহাদের আচরণে দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ কখন প্রেমসম্পত্তির অতি বাহুল্যবশতঃ নিবৃত্তিলক্ষণও দেখা যায়। সর্বজনপ্রিয় সারগ্রাহী বৈষ্ণব নির্জ্জনস্থ হইয়া, কখন কখন অন্তরঙ্গ পরম রহস্য ভজনা করেন। ব্রজমাহাত্ম্য বর্ণন করিতে করিতে অত্যন্ত বলবতী প্রেমলালসার উদয় হওয়ায় কখন কখন বলেন যে, “আমার সৌভাগ্য কোন্ দিবস হইবে, যখন যমুনাতটস্থ শ্রীবৃন্দারণ্যে সারগ্রাহি-বৈষ্ণবজনসঙ্গে সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরের ভজনা করিব। যে সারগ্রাহী বৈষ্ণবের কৃপামাত্রে কৰ্ম্মজড় ও জ্ঞানদগ্ধ পুরুষেরাও সারগ্রাহি-বৈষ্ণবতা লাভ করেন, সেই ভবান্বিতের কর্ণধারস্বরূপ সারগ্রাহি-বৈষ্ণব জনপদাশ্রয় আমার নিত্যকৰ্ম্ম হউক।” বৈষ্ণব ত্রিবিধ—কোমলশ্রদ্ধ, মধ্যমাধিকারী ও উত্তমাধিকারী। কৰ্ম্মকাণ্ড ও তদন্ত ফলকে নিত্যজ্ঞান করিয়া পরমার্থবিরত পুরুষেরা কৰ্ম্মজড়। কেবল যুক্তিযোগে নির্বিশেষব্রহ্মনির্বাণসংস্থাপক পুরুষেরা নিত্য-বিশেষ-জ্ঞানাভাবে জ্ঞানদগ্ধ অর্থাৎ নিতান্ত শুদ্ধ ও নীরস। আত্মার চরমাবস্থায় নিত্য-বিশেষগত বৈচিত্র্যস্বাকার-পূর্বক যাহারা আত্মা হইতে নিত্য ভিন্ন সর্বানন্দধাম পরমেশ্বর্য্য ও পরমমাধুর্য্যসম্পন্ন করুণাময় ভগবানের উপাসনাকার্য্যকে জীবের নিত্যধৰ্ম্ম বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন, তাঁহারা ভক্ত বা বৈষ্ণব। কৰ্ম্মজড় ও জ্ঞানদগ্ধ পুরুষেরা সৌভাগ্যক্রমে ও সাধুসঙ্গ-প্রভাবে বৈষ্ণবপদবী প্রাপ্ত হইয়া শুদ্ধ নরস্বভাবে অবস্থিতি

করেন। কোমলশ্রদ্ধ ও মধ্যমাধিকারী বৈষ্ণবগণের যে মল লক্ষিত হয়, তাহা প্রবলরূপে কৰ্মজড় ও জ্ঞানদগ্ধ পুরুষে লক্ষিত হয়। বস্তুতঃ কৰ্মজড় ও জ্ঞানদগ্ধ পুরুষদিগের বৈষ্ণবপদবী প্রাপ্ত হইলেও পূর্বাবস্থা হইতে জড়তা ও কুতর্কের যে অবশিষ্টাংশ অভ্যাসক্রমে থাকে, তাহাই কোমলশ্রদ্ধ ও মধ্যমাধিকারী বৈষ্ণবদিগের হেয়াংশ। যাহা হউক, ঐ হেয়াংশ কেবল অজ্ঞান ও কুসংস্কারের ফল, ইহাতে সন্দেহ নাই। ত্রিবিধ বৈষ্ণবদিগের মধ্যে উত্তমাধিকারী পুরুষের কুসংস্কার ও জড়তা থাকে না। অনেক-বিষয়-সম্বন্ধে জ্ঞানাভাব থাকিতে পারে, কিন্তু সারগ্রাহি-বৃত্তি প্রবলরূপে সমস্ত কুসংস্কারকে একেবারে দূর করে। মধ্য-মাধিকারী বৈষ্ণব ভারবাহী হইতে ইচ্ছা করেন না; কিন্তু সার-গ্রাহিপ্রবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে বলবতী না থাকায় তাঁহাদের হৃদয়ে পূর্ব কুসংস্কারজনিত কিছু কিছু সংশয় বলবান থাকে। ইহারা চিদ্গতবিশেষত্ব ও সহজ সমাধি স্বীকার করিয়াও যুক্তির মুখাপেক্ষায় বৈকুণ্ঠতত্ত্বকে সমাগুরূপে দর্শন করিতে পারেন না। কোমলশ্রদ্ধ পুরুষেরা বৈষ্ণবপদবী প্রাপ্ত হইয়াও কুসংস্কারের নিতান্ত বশবর্তী থাকেন। ইহারা কৰ্মসঙ্গী ও বৈধ শাসনের অধীন। যদিও ইহারা স্ফোটকুপা লাভের সাক্ষাৎ অধিকারী নহেন, তথাপি উত্তমাধিকারীর সাহায্যে আলোচনা করিয়া উত্তমাধিকারিত্ব লাভ করিতে পারিবেন। অতএব ত্রিবিধ বৈষ্ণবেরাই শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির সংবর্দ্ধনার্থ স্ফোটতত্ত্ব আলোচনায় পরমানন্দ লাভ করিতে পারিবেন।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, যাহারা অপ্ৰাকৃত বৈকুণ্ঠে

ভাব প্রথমে বর্ণন করেন, তাঁহারা জড়ভাবসকলকে চিন্ত্তে আরোপ করিয়া পরে কুসংস্কার দ্বারা তাহাতে মুক্ত হন। পরে ঐ সকল সংস্কারকে কুটযুক্তি দ্বারা উক্ত প্রকারে স্থাপন করিয়াছেন। বাস্তবিক বৈকুণ্ঠ ও ভগবদ্বিলাস-বর্ণন সমস্তই প্রাকৃত, এইরূপ সিদ্ধান্ত কেবল তত্ত্বজ্ঞানাভাববশতঃই হয়। যাহারা ফোর্ট-শক্তিলভ করিয়া গাঢ়রূপে চিন্ত্তের আলোচনা করেন নাই, তাঁহারা কাজে কাজেই এরূপ তর্ক করিবেন। বস্তুতঃ যে সকল বিচিত্রতা জড়জগতে পরিদৃশ্য হয়, সে সকল চিজ্জগতের প্রতিফলন মাত্র। চিজ্জগৎ ও জড়জগতে বিভিন্নতা এই যে, চিজ্জগতে সমস্তই আনন্দময় ও নির্দোষ এবং জড়জগতে সমস্তই ক্ষণিক সুখ-দুঃখময় ও দেশকালনির্মিত হেয়ত্বে পরিপূর্ণ। অতএব চিজ্জগৎ সম্বন্ধে বর্ণনসকল জড়ের অনুকৃত নয়, কিন্তু ইহার অতি বাঞ্ছনীয় আদর্শ। বিশেষ ধর্মকর্তৃক নিত্যধামের যে বৈচিত্র্য স্থাপন হইয়াছে, তাহা নিত্য হইলেও সমস্ত বৈকুণ্ঠ-তত্ত্বটী অখণ্ড সচ্চিদানন্দস্বরূপ, যেহেতু তাহা প্রকৃতির পর তত্ত্ব অর্থাৎ দেশ-কাল-ভাবদ্বারা প্রাকৃত তত্ত্বসকল খণ্ড খণ্ড হইয়াছে, পরতত্ত্বে সেরূপ সদোষ খণ্ডভাব নাই। নিত্যসিদ্ধ ও সিদ্ধীভূত জীবদিগের সম্বন্ধে নিত্য শ্রীকৃষ্ণদাস্তই নিত্যসুখ। চিদাত্মার বিমলানন্দবিলাস বর্ণনে জড়াসরস্বতী অশক্তা, যে বাক্যসকল দ্বারা বর্ণিত হইবে ঐ সকল বাক্য জড় হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। যদিও বাক্যদ্বারা স্পষ্ট বর্ণনে অশক্ত, তথাপি “সারজুট-বৃত্তি দ্বারা সমাধি অবলম্বনপূর্ব্বক” ভগবদ্বার্ত্তা যথাসাধ্য বর্ণিত হইতে পারে। বাক্যসকলে সামান্য অর্থ করিতে গেলে বর্ণিত

বিষয় উত্তমরূপে উপলব্ধ হইবে না; এতদ্ব্যতীত সমাধি অবলম্বন-পূর্বক এতৎতত্ত্বের উপলব্ধি করিতে হইবে। অরুদ্ধতী-সন্দর্শন-প্রায় স্থূলবাক্য হইতে তৎসন্নির্কর্ষ সূক্ষ্মতত্ত্বের সংগ্রহ করা কর্তব্য। যুক্তি প্রবৃত্তি ইহাতে অক্ষম, যেহেতু অপ্রাকৃত বিষয়ে তাহার গতি নাই, কিন্তু আত্মার সাক্ষাদর্শনরূপ আর একটী সূক্ষ্মবৃত্তি সহজসমাধি-নামে লক্ষিত হয়, সেই বৃত্তি অবলম্বনপূর্বক বর্ণন ও শ্রবণ দ্বারা তত্ত্বোপলব্ধি করিতে হইবে। যে সকল উত্তমাধিকারিগণের ব্রজবিলাসী শ্রীকৃষ্ণে প্রীতি উদয় হইয়াছে; তাঁহারা ই স্বভাবতঃ আত্মসমাধিতে বৈকুণ্ঠ দর্শন করেন। সেই সকল উত্তমাধিকারী বৈষ্ণবের শ্রীচরণাশ্রয় করিলে তাঁহারা কৃপাপূর্বক স্ফোটশক্তির স্ফুরণ দ্বারা তাদাত্মাসম্পন্ন করিলে তবে আত্মসমাধি লাভে অপ্রাকৃততত্ত্বে অধিকার লাভ হয়।

অচিন্ত্য-অনন্ত-শক্তিশালী পরতত্ত্বের শক্তিসমূহ ও শক্তিপরিণত বস্তু সমূহের যাহা পুরুষের যুক্তিতর্ক-গম্য নহে তাহা একমাত্র যে শব্দশক্তির দ্বারা প্রকাশিত ও চিদেন্দ্রিয়ের গোচরীভূত ও ক্রিয়াশীল হয় তাহাই স্ফোটশক্তি। সেই অপ্রাকৃত বিষয় উপনিষদে, ব্রহ্মসূত্রে ও তাহার অকৃত্রিমভাষ্য-ভূত শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীগীতা ও শ্রীবিষ্ণুপুরাণাদি শব্দপ্রমাণের মধ্যে সেই সর্বতন্ত্র-সিদ্ধান্ত গ্রাথিত আছে। তাহাই শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত ও গোঁড়ীয়-গোষামিগণের প্রকাশিত দার্শনিক-সিদ্ধান্ত। শ্রীচৈতন্যদেব নীলাচলে, রামানন্দসংবাদে, শ্রীকৃষ্ণ-সনাতন-শিক্ষায় সেই স্ফোটশক্তির প্রকাশ ও বর্ণনমুখে শক্তিসংস্কারে উপলব্ধি করাইয়াছিলেন। তাহাই শ্রীল সনাতন-

গোস্বামিপাদ শ্রীবৃহত্তাগবতামৃতে ও শ্রীবৈষ্ণবভোগশীতে, শ্রীল
 রূপগোস্বামিপাদ শ্রীলঘুভাগবতামৃত ও ভক্তিরসামৃতসিন্ধু
 প্রভৃতি গ্রন্থাদিতে, শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ ষট্‌সন্দর্ভে ও সর্ব-
 সন্থাদিনীতে বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। সেই অমূল্যরত্ন
 শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণন
 করিয়াছেন। ‘শ্রুতেস্ত শব্দমূলত্বাৎ’ (ত্রঃ সূঃ ২।১।২৭) শ্লোকের
 ব্যাখ্যায় বিভিন্ন আচার্য্যগণ উক্ত ফোটবাদেরই ব্যাখ্যা করিয়া-
 ছেন। “ব্রহ্ম—শব্দমূলক, শব্দ প্রমাণক ; ব্রহ্ম,—ইন্দ্রিয়াদি
 প্রত্যক্ষ প্রমাণক নহেন। সেই জন্ত ব্রহ্মের স্বরূপ—‘যথাশব্দ’
 অর্থাৎ শব্দ প্রমাণানুরূপ। মণি, মন্ত্র, ঔষধ-প্রভৃতির শক্তি
 বিভিন্ন দেশ-কালাদি-মিনিত্ত বশতঃ বিচিত্র ও বহু বিরুদ্ধ কার্য্য
 উৎপন্ন করে। ‘এই বস্তুর এই শক্তি, এই সহায়, এই বিষয়, এই
 প্রয়োজন,—এই-সকল শক্তি বিনা উপদেশে, কেবলমাত্র তর্কে
 জানা যায় না (শঙ্কর ভাষ্য)। পৌরাণিকগণ বলেন—“যে সকল
 বস্তু অচিন্ত্যনীয়, তাহা তর্কের দ্বারা মীমাংসা করা যাইতে পারে
 না। যাহা প্রকৃতির অতীত অর্থাৎ অপ্রাকৃত, তাহাই অচিন্ত্যের
 লক্ষণ। অতএব অতীন্দ্রিয় বস্তুর স্বরূপাববোধ শব্দ মূলক।”

পরতত্ত্ব শব্দমূলক, তাঁহার শব্দ ও শব্দীতে ভেদ না থাকায়
 তাঁহার শক্তিও শব্দও তাঁহা হইতে অভিন্ন। তাঁহার সর্ববিধ
 প্রকাশ ও বিক্রম শব্দদ্বারাই প্রকাশিত হয়। শব্দ হইতেই সর্ব-
 শক্তি প্রকাশিত হয়। চিহ্নজগতের বিভিন্ন উপাদান, ভাব, রস ও
 লীলাদি সেই শব্দ হইতেই প্রকাশিত হয়। জীব ও জড়জগতের
 সম্বন্ধেও সেই শব্দই মূল এবং প্রমাণস্বরূপ। শব্দই সকল বস্তু,

ভাব, রস ও লীলাদি প্রকট করিয়া প্রকাশ করেন, তাহাই প্রমাণ-
স্বরূপে গ্রাহ্য হয়। সর্ব শক্তি ও প্রকাশাদি—“যস্য দেবে পরা-
ভক্তির্থথা দেবে তথা গুরৌ। তস্মৈতে কথিতা হৃথ্যাঃ প্রকাশন্তে
মহাত্মনঃ” ॥ বিচারে প্রকাশিত হয়। সেই স্ফোটই বিস্ফারিত
হইয়া মহাশক্তি প্রকাশ করে। তাহার বিকৃত প্রতিফলনেই
জগৎ ধ্বংস করে, মণি-মন্ত্ৰ-ঔষধিরূপে বিভিন্ন মহাশক্তি
প্রকাশ করে। মন্ত্ৰ প্রভাবে ধনুর্ঝানা দিতে মহাশক্তির
প্রকাশ করে। গীতবাগাদিতে রাগ-রাগিনীরূপধারণ ও মহা
আকর্ষণীশক্তির প্রকাশ করে। অগ্নি-বিষাদির মহাশক্তিকেও
স্তম্বীভূত করে। ক্ষুদ্র জীবশক্তির প্রতিও বিন্দুর মধ্যে সিন্দুর
আবাহন করাইয়া সর্বকার্যক শ্রীভগবান্কেও আকর্ষণ করিতে
সক্ষম হয়। স্বরূপ শক্তিতেও বিভিন্ন সেবোপকরণ অপ্ৰাকৃত
দ্রব্যের প্রভূত অচিন্ত্যশক্তি প্রকট করাইয়া শ্রীভগবানের
লীলারস পোষণ করে। সর্বস্থানে, সর্বকালে, সর্বপাত্রে সর্ব-
শক্তিপরিপূর্ণ ভাব প্রকাশ করিতে পারে। কেহ কোন
প্রকারে সে শক্তিকে প্রতিহত করিতে পারে না।

পঞ্চমক্রম।

শ্রীচৈতন্যদেব ও স্ফোটবাদ—সর্বাবতারীর ও
অবতারী সর্বসিদ্ধান্তের শুদ্ধত্ব সমঞ্জসকারী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর
শিক্ষাক্ষক—স্ফোটবিচারেরই পরিস্ফুট বিজ্ঞান। শ্রীমন্নহাপ্রভু
অতি অল্পাক্ষরে স্ফোটের বিচার বলিয়াছেন, “কীর্তনীয়ঃ সদা
হরিঃ।” বিদ্বদ্রাঢ়ি-বৃত্তিতে প্রত্যেক শব্দ বিষ্ণু-বাচক—পরব্রহ্ম

বাচক। প্রত্যেক শব্দে ফোটধর্ম হইতে বিদ্বদ্রুটি প্রকাশিত। মহাস্ত গুরুর দ্বারা বর্ণবেধ সংস্কার হইলে—দিব্যজ্ঞান লাভ হইলে ফোটধর্মগত বিদ্বদ্রুটি প্রকাশিত হয়। রুটিবৃত্তি শ্রীমূর্তি প্রকাশ করে। শ্রীমন্মহাপ্রভু গয়া হইতে আসিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়া রুটিবৃত্তিতে ফোটবাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি আন্তরফোটে জগৎ কৃষ্ণময় দর্শন করিতে লাগিলেন ও বহিঃ-ফোট প্রকাশে “অহর্নিশ শ্রবণে শুনয়ে কৃষ্ণনাম। বদনে বোলয়ে “কৃষ্ণচন্দ্র” অবিরাম। পড়াইতে বৈসে গিয়া ত্রিজগৎ-রায়। কৃষ্ণ-বিনু কিছু আর না আইসে জিহ্বায় ॥” “এবে যত বাখানেন নিসাপ্রিঃ-পণ্ডিত। শব্দ-সনে বাখানেন কৃষ্ণ-সমীহিত। গয়া হৈতে যাবৎ আসিয়াছেন ঘরে। তদবধি কৃষ্ণ বই ব্যাখ্যা নাহি ফুরে ॥ সর্বদা বলেন ‘কৃষ্ণ’—পুলকিত অঙ্গ। ক্ষণে হাস্য, হৃষ্কার, করয়ে বহু রঙ্গ ॥ প্রতি-শব্দে ধাতু-সূত্র একত্র করিয়া। প্রতিদিন কৃষ্ণ-ব্যাখ্যা করেন বসিয়া ॥”

“সিদ্ধ বর্ণসম্মায় ?” বলে শিষ্যগণ। প্রভু বলে,— “সর্ব-বর্ণে সিদ্ধ নারায়ণ।” শিষ্য বলে,—“বর্ণ সিদ্ধ হইল কেমনে ?” প্রভু বলে,—“কৃষ্ণ-দৃষ্টিপাতের কারণে ॥” শিষ্য বলে,—“পণ্ডিত, উচিত ব্যাখ্যা কর”। প্রভু বলে,—“সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ ॥ কৃষ্ণের ভজন কহি—সম্যক্ আন্মায়। আদি-মধ্য-অন্তে কৃষ্ণ ভজন বুঝায় ॥” কলাপ বা কাতন্ত্র-ব্যাকরণের প্রথম সূত্র—সিদ্ধো বর্ণসম্মায়ঃ” অর্থাৎ স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের পাঠক্রম— চির-প্রসিদ্ধ। ছাত্রগণ বলিতে লাগিলেন যে, বর্ণপাঠ-রীতি ত’ সুপ্রসিদ্ধ ? তত্বতরে প্রভু বলিলেন যে, ফোট বিচারে সকল

বর্ণ নিত্য-শুদ্ধ-পূর্ণ-মুক্ত-চিন্ময়ী পরমুখ্যা বিদ্বদ্ভক্তি-বৃত্তিতে নারায়ণকেই প্রতিপাদন করেন। আরোহ-পন্থী বা অধিরোহ-বাদী বর্ণের অজ্ঞরূঢ়ি-বৃত্তির সাহায্যে শব্দশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, কিন্তু প্রভু অবতার-বিচার অবলম্বন করিয়া প্রত্যেক-বর্ণকেই ভগবদ্বাচক বলিয়া জানাইলেন। প্রত্যেক বর্ণকে অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তির সাহায্যে মাপিতে গেলে বদ্ধজীব নারায়ণের ইন্দ্রিয়গ্রাহ বিষয়ের উদ্দেশ্য লাভ করে, কিন্তু বর্ণের বিদ্বদ্ভক্তি-বৃত্তি, প্রত্যেক বর্ণই যে সাক্ষাৎ মূর্ত্তবর্ণবিগ্রহ নারায়ণ,—ইহাই প্রতিপাদন করে। অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তি আধ্যাত্মিক-জ্ঞানীকে প্রজন্মী করিয়া তুলে, আর সাক্ষাৎ স্বপ্রকাশ বাচ্যবস্তু শ্রীনারায়ণ বর্ণদ্বারা আপনাকে প্রকটিত করিয়া জীবকে হরিকীর্তনকারী করান। মহাপ্রভু বর্ণসিদ্ধির কারণ নির্ণয় করিলেন,—বাচ্য-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের নিরীক্ষণহেতু অর্থাৎ কৃষ্ণের অভিন্ন পূর্ণ-শুদ্ধ-নিত্য-মুক্তবাচক, ব্যঞ্জক বা সূচক অথবা ছোটক হওয়ায় প্রত্যেক বর্ণই ফোটেবিচারে নিত্যসিদ্ধ। ফোটেবিচারে প্রত্যেক শাস্ত্রার্থ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ স্মৃতিউৎপাদক শব্দব্রহ্ম। শ্রীকৃষ্ণভজন-প্রণালী ও ফোটেবিচার সম্যক্ আন্মায় পারম্পর্য্যে আগত হয়। যথা সম্যক্ আন্মায়,—“আমনতি উপদিশতি বিষ্ণোঃ পরমং পদম্; আন্মায়তে সমাগভ্যশ্রুতে মুনিভিরসৌ, আন্মায়তে উপদিশতে পরধর্ম্মোহনেতি আন্মায়ঃ ‘বেদঃ’; সমান্নায়। ভাঃ ১০।৪৭।৩৩ শ্লোকে ‘সমান্নায়’-শব্দে শ্রীধরস্বামিপাদ-কৃত টীকায়—“সমান্নায়ো বেদঃ”। (গীতায় ১৫।১৫ শ্লোকে অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণোক্তি)—“সর্ব্বশ্চ চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতি-

জ্ঞানমপোহনঞ্চ। বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেত্তো বেদান্তকুদেদবিদেব চাহম্ ॥” অর্থাৎ ‘আমিই সর্বজীবের হৃদয়ে ঈশ্বররূপে অবস্থিত; আমা-হইতেই জীবের কর্মফলানুসারে স্মৃতিজ্ঞান ও স্মৃতিজ্ঞানের ভ্রংশ ঘটে; আমিই সর্ববেদবেত্তা ভগবান, সমস্ত বেদান্ত-কর্তা এবং বেদান্ত-বিৎ।’ ভাঃ ১২।১৩।১—‘ব্রহ্মা, বরুণ, ইন্দ্র, রুদ্র ও মরুদগণ দিব্যস্তবে যাঁহাকে স্তব করেন, অঙ্গ পদক্রম ও উপনিষদের সহিত বেদসকল যাঁহার গান করিয়া থাকেন, সমাধি-অবস্থায় তদগত-চিত্ত হইয়া যোগিগণ যাঁহাকে হৃদয়ে দর্শন করেন এবং সুরাসুরগণ যাঁহার অন্ত জানেন না, সেই পরম-দেব শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি।’ ভাঃ ১১।২১।৪২—৪৩ শ্লোকে অর্থাৎ ‘কর্মকাণ্ডে বিধিবাক্যসমূহদ্বারা ঋতি কাহাকে বিধান করেন, দেবতাকাণ্ডে মন্ত্রবাক্যসমূহদ্বারা ঋতি কাহাকে প্রকাশ করেন এবং পরিণামে নিষেধ করিবার উদ্দেশে কোন্ বিষয়েরই বা প্রস্তাব করেন?—ইত্যাদি বেদবাণীর তাৎপর্য আমি-ব্যতীত আর অন্য কেহই জানে না। এ বিষয় অত্যন্ত নিগূঢ় হইলেও এক্ষণে তোমার প্রতি কৃপা করিয়া বলিতেছি যে, সেই বেদবাণী কর্মকাণ্ডে যজ্ঞরূপে আমাকেই বিধান করে, দেবতাকাণ্ডে তত্তদ্দেবতা-রূপে আমাকেই প্রকাশ করে, আর আকাশাদি প্রপঞ্চের উল্লেখপূর্বক পুনরায় যে উহা নিরাকরণ করেন, তাহাও আমি ব্যতীত পৃথক্-সত্ত্বাক নহে,—ইহাই সকল-বেদের তাৎপর্য; অর্থাৎ স্ফোটের শব্দ প্রকাশক শাস্ত্ররূপ বেদ পরমার্থভূত বাস্তব-বস্তু আমাকেই আশ্রয়পূর্বক জড়ভেদকে মায়ামাত্ররূপে প্রস্তাব করিয়া পরিশেষে উহার নিষেধানন্তর চিন্মাত্র-ব্রহ্মজ্ঞানকে

অতিক্রমপূর্বক চিদ-বিলাসবৈকুণ্ঠবৈচিত্র্য-বর্ণনে পর্য্যবসিত হইয়াই প্রসন্ন হন।' হরিবংশে"—“বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা। আদাবস্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্বত্র গীয়তে ॥” অর্থাৎ ‘বেদে, রামায়ণে, মহাভারতে, পুরাণের আদিতে, মধ্যে এবং অস্তে,—সর্বত্র একমাত্র শ্রীহরিই কীর্তিত হন। ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি। ফোটির পরমযোগিক-বৃত্তির সাহায্যে প্রত্যেক-শব্দের ধাতু অর্থাৎ ক্রিয়াবাচক প্রকৃতি ও তত্ত্ব-শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয়-সাধকসূত্র সংযোগ করিয়া তাহার কৃষ্ণতাৎপর্য্যপর ব্যাখ্যা করিলেন। “প্রভুর না ক্ষুরে কৃষ্ণ-ব্যতিরেকে আন। শব্দ মাত্রে কৃষ্ণভক্তি কররে ব্যাখ্যান ॥ পড়ুয়া সকলে বলে,—“ধাতু-সংজ্ঞা কার্ ?” প্রভু বলে—“শ্রীকৃষ্ণের শক্তি নাম যার ॥” শ্রীগৌরমুন্দর পূর্ণ-শুদ্ধ-নিত্য-মুক্ত চিন্ময়ী পরম-মুখ্যা ফোটির বিদ্বদ্ভাটি-বৃত্তিতে প্রত্যেক শব্দেরই কৃষ্ণভক্তিপরা ব্যাখ্যা করিতেন। কৃষ্ণ-ব্যতীত অন্য দ্বিতীয় বস্তুর অভিনিবেশক্রমে কোন শব্দার্থ তাহার কৃষ্ণ-কীর্তনরত জিহ্বায় ব্যাখ্যাত হয় নাই। ‘ধাতু’-শব্দে -বাচ্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের পরা, অন্তরঙ্গ বা স্বরূপশক্তি যেমন শ্রীকৃষ্ণের ঔদার্য্য, মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্যাত্মক চিহ্নিলাস প্রকাশ করে বলিয়া সেই শক্তি ও শক্তিমান্ পরস্পর অভিন্নরূপে সংযুক্ত, তদ্রূপ ফোটির যোগবৃত্তিতে প্রত্যেক বাচক-শব্দের প্রকৃতি বা ধাতুও তাহার অভ্যন্তরে অচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত থাকিয়া তাহার অর্থ বা শক্তি প্রকাশ করে। তাঃ ১০।১৪।৫০-৫৭ শ্লোকে—“সকল প্রাণীর আত্মাই ‘পরম-প্রিয়’; অপত্য-বিত্তাদি অল্প-বস্তু আত্মার প্রিয়

বলিয়াই 'প্রিয়তর' হইয়া থাকে। এই কারণেই দেহিগণের স্ব-স্ব-অহঙ্কারাম্পদ দেহে যেরূপ স্নেহ হয়, মমতাবলম্বন পুত্র-বিন্দু-গৃহাদিতে তদ্রূপ হয় না। যে-সকল পুরুষ দেহাত্মবাদী, তাহাদের দেহ যেরূপ 'প্রিয়তর,' দেহ-সম্পর্কিত পুত্রাদি তদ্রূপ 'প্রিয়' নহে। কিন্তু যद्यপি দেহ মমতা ভাজন, তথাপি তাহা আত্মবৎ প্রিয় হইতে পারে না; যেহেতু দেহ জীর্ণ হইয়া মৃত্যু আসন্ন হইলেও জীবিতাশা বলবতী থাকে। অতএব সকল-দেহীর আত্মাই প্রিয়তর, আত্মার নিমিত্তই চরাচর সকল জগৎ প্রিয় হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণই সকল দেহীর আত্মা; তিনি জগতের হিতার্থ স্বরূপ-শক্তি চিন্ময়ী মায়া-দ্বারা এখানে দেহীর শ্রায় প্রকাশ পাইতেছেন। বস্তুতঃ, যে-সকল পুরুষ সর্ব-জগতের কারণরূপে শ্রীকৃষ্ণকে জানেন তাহাদের সমক্ষে স্থাবর-জঙ্গম সমুদয় জগৎ ভগবদ্রূপে প্রকাশ পায়; তাঁহারা নিশ্চয় জানেন যে, তদ্ব্যতীত অণুকোন বস্তুই নাই। যাবতীব বস্তুর পরম অর্থ তাহাদের কারণেই অবস্থিত; ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই সমস্ত কারণেরও কারণ। অতএব শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অণুবস্তু কি, তাহা নিরূপণ কর।" কৃষ্ণের অণু সমস্ত সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ প্রজল ও রসাভাষাদি পরিত্যাগপূর্বক সর্বক্ষণ নিষ্কপট সেবোন্মুখ-জিহ্বায় কৃষ্ণনাম উচ্চারণ কর। বাহ্যজগতের বস্তুসমূহকে ভোক্তৃ-অভিমাণে ভোগ্যজ্ঞানে ভোগ করিবার পরিবর্তে আপনাকে কৃষ্ণের নিত্য সেবোপকরণ জানিয়া সর্বক্ষণ কৃষ্ণের শুদ্ধ নাম-কীর্তনানুকূল সেবানুষ্ঠানাদি-সম্পাদনে নিযুক্ত থাক। নিষ্কপট সেবোন্মুখ-কর্ণ-দ্বারা ভোগপর অনিত্য অচিৎ

শব্দ-কোলাহল-শ্রবণের মূলে যে আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণেচ্ছা, তাহা পরিহার করিয়া কৃষ্ণাভিন্ন শব্দব্রহ্ম কৃষ্ণনাম-কথা শ্রবণ কর। ইন্দ্রিয়জ্ঞানে অনিত্য সুখলাভের আশা বিসর্জন করিয়া নিরন্তর সেবোন্মুখ শুদ্ধচিত্তে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম স্মরণ কর।

ভাঃ ১।২।১৪—অতএব ভক্তিপ্রধান ধর্মই অনুষ্ঠেয় হওয়ায় একাগ্রমনে ভক্তবৎসল বাসুদেবেরই শ্রবণ, কীর্তন, মনন এবং অর্চন কর্তব্য।’ ভাঃ ২।১।৫—অতএব, যে ব্যক্তি অভয়পদ মোক্ষের আকাঙ্ক্ষা করে, তাহার পক্ষে সর্বাঙ্গা ভগবান্ পরমেশ্বর শ্রীহরিরই শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ অবশ্য কর্তব্য।’ ভাঃ ২।২।৩৬—‘অতএব সর্বাঙ্গ-দ্বারা সর্বত্র সর্বদা ভগবান্ শ্রীহরিরই শ্রবণ কীর্তন এবং স্মরণ কর্তব্য।’

ভাঃ ৬।১।১৯—যে-সকল ব্যক্তি কৃষ্ণপাদপদ্মে তদ্-গুণানু-রক্ত চিত্ত একবারমাত্র নিবেশ করেন, তাঁহাদের তৎক্ষণাৎ পূর্বপাপরাশির প্রায়শ্চিত্ত কৃত হওয়ায়, যম ও পাশধারী যম-দূতগণ স্বপ্নেও তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হন না। ইত্যাদি।

“এইমত পবিত্র পূজ্য যে কৃষ্ণের শক্তি। হেন কৃষ্ণে, ভাই-সব! কর’ দৃঢ় ভক্তি ॥ বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, শুন কৃষ্ণনাম। অহর্নিশ শ্রীকৃষ্ণচরণ কর’ ধ্যান ॥ যাঁহার চরণে ছুর্বা-জল দিলে মাত্র। কতু নহে যমের সে অধিকার-প্রাত্ন ॥ অঘ-বক পুতনারে যে কৈলা মোচন। ভজ ভজ সেই নন্দনন্দন-চরণ ॥ পুত্রবুদ্ধি ছাড়ি’ অজামিল সে স্মরণে। চলিলা বৈকুণ্ঠ, ভজ সে কৃষ্ণচরণে ॥ যাঁহার চরণ সেবি’ শিব—দিগম্বর। যে-চরণ সেবিবারে লক্ষ্মার আদর ॥ অনন্ত যে

চরণ-মহিমা-গুণ গায় । দন্তে তৃণ করি' ভঙ্গ হেন কৃষ্ণ-পা'য় ॥
 যাবৎ আছে প্রাণ, দেহে আছে শক্তি । তাবৎ করহ কৃষ্ণ-
 পাদপদ্মে ভক্তি ॥ কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ প্রাণ ধন ।
 চরণে ধরিয়া বলি,—‘কৃষ্ণে দেহ' মন' ॥” “প্রভু বলে,—“ধাতু-
 সূত্র রাখানিহুঁ কেন ?” পড়ুয়া-সকল বলে,—‘সত্য অর্থ
 যেন ॥ যে-শব্দে যে-অর্থ তুমি করিলা বাখান । কার্ বাপে
 তাহা করিবারে পারে আন ? যতেক বাখান' তুমি,—সব
 সত্য হয় । সবে যে উদ্দেশে পড়ি,—তার অর্থ নয় ॥”
 “সূত্ররূপে কোন্ বৃত্তি করিয়ে বাখান ?” শিষ্যবর্গ বলে,—
 “সবে এক হরিণাম ॥ সূত্র-বৃত্তি-টীকায় বাখান' কৃষ্ণ মাত্র ।
 বুদ্ধিতে তোমার ব্যাখ্যা কেবা আছে পাত্র ?” “দশদিন ধরি'
 কর' যতেক ব্যাখ্যান । সর্ব-শাস্ত্রে-শব্দে—কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণনাম ॥”
 “শব্দের অশেষ অর্থ—তোমার গোচর । যে বাখান' হাসি'
 তাহা কে দিবে উত্তর ?” পড়ুয়া-সকল বলে,—“বাখান উচিত ।
 সত্য 'কৃষ্ণ'—সকল শাস্ত্রের সমীহিত ॥ অধ্যয়ন এই সে—সকল-
 শাস্ত্র-সার । তবে যেনা লই'—দোষ আমা সবা'কার ॥ মূলে
 যে বাখান' তুমি, জ্ঞাতব্য সে-ই সে । তাহাতে না লয় চিত্ত
 নিজ-কর্মদোষে ॥”

আপনি স্ফোটের বিদ্বদ্রুটি-বৃত্তির সাহায্যে শব্দের যে
 অর্থ করেন ও করিয়াছেন, তাহাই একমাত্র বাস্তব নিত্য-সত্য ।
 আমরা অজ্ঞরুটিবৃত্তির সাহায্যে শব্দের যে উপদেশ বা তাৎপর্য
 ব্যাখ্যা করি, তাহা তাৎকালিক অর্থপ্রতিম হইলেও যথার্থ বা
 প্রকৃত সত্যার্থ নহে, পরন্তু কদর্থমাত্র । আপনিই শব্দ-শাস্ত্রে

পরম সর্বোত্তম ও বিশারদ; শব্দের যোগ, রুঢ়ি, যোগরুঢ়ি, গৌণী, মুখ্যা, লক্ষণা ও অভিধা প্রভৃতি নানা-বৃত্তিদ্বারা অর্থ ব্যাখ্যা বা প্রকাশ করিতে আপনিই অভিজ্ঞতম। এইরূপ কৃষ্ণপর অধ্যয়নই সর্বশাস্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য, অভিপ্রায় বা তাৎপর্য, তথাপি আমরা যে আপনার কৃত কৃষ্ণপর সত্যার্থ গ্রহণ করি না, তাহাতে আমাদেরই অপরাধ। আসল কথা,—আপনি যেরূপ অর্থ ব্যাখ্যা করেন বা করিলেন, তাহা উপলব্ধি করাই আমাদের একমাত্র প্রয়োজন; কিন্তু ছুরদৃষ্ট-দোষে আমাদের চিত্ত আপনার কৃত সর্বশাস্ত্রসার সত্যার্থের গ্রহণে অসক্ত হইতেছে। “পরং-ব্রহ্ম বিশ্বস্তুর শব্দ-মূর্ত্তিময়। যে-শব্দে যে বাখানেন সে-ই সত্য হয় ॥

শ্রীশচীমাতাকে লক্ষ্য : করিয়াও শ্রীমদ্মহাপ্রভু স্ফোটের-বিদ্বদ্‌রুঢ়িগত সকল কৃষ্ণ ভজনের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন।

“প্রভু বলে,—“ভাই সব! কহিলা সুসত্য। আমার এ-সব কথা—অগ্ৰত্ৰ অকথ্য ॥ কৃষ্ণবর্ণ এক-শিশু মুরলী বাজায়। সবে দেখি,—তাই ভাই! বলি সর্বথায় ॥ যত শুনি শ্রবণে, সকল—কৃষ্ণনাম। সকল ভুবন দেখি গোবিন্দের ধাম ॥” “কৃষ্ণ-বিহু আর বাক্য না স্কুরে আমার। সত্য আমি কহিলা ও চিত্ত আপনার ॥” “আশীবাদ করে প্রভু শ্রীশচীনন্দন ॥ “দিবসেকো আমি যদি হই কৃষ্ণদাস। তবে সিদ্ধ হউ তোমা’ সবার অভিলাষ ॥ তোমরা—সকলে লহ কৃষ্ণের শরণ। কৃষ্ণনামে পূর্ণ হউ সবার বদন ॥ নিরবধি শ্রবণে শুনহ কৃষ্ণনাম। কৃষ্ণ হউ তোমা’ সবাকার ধন প্রাণ। যে পড়িলা,

সেই ভাল, আর কার্য্য নাই। সবে মেলি 'কৃষ্ণ' বলিবাও এক ঠাই ॥ কৃষ্ণের কৃপায় শাস্ত্র স্কুরুক সবার।" "এই মতে পরিপূর্ণ বিচার বিলাস। সংকীৰ্ত্তন আরম্ভের হইল প্রকাশ ॥" "পড়িলাও শুনিলাও যতদিন ধরি'। কৃষ্ণের কীৰ্ত্তন কর' পরিপূর্ণ করি ॥"

পরবিজ্ঞা-বধুজীবন সাক্ষাৎ শুক্লসরস্বতী-পতি মূৰ্ত্ত-শব্দ-বিগ্রহ শ্রীগৌরমুন্দরের পরবিদ্যা-বিলাসে আশীৰ্ব্বাদরূপে ফোটের স্কুরণ হওয়ায় শিষ্যবর্গ ফোটের কৃপা লাভ করিয়া তাদাত্ম্য হইয়া পূর্ণ-প্রকাশে যোগদান করিলেন। প্রভুর কৃষ্ণ-সঙ্কীৰ্ত্তনের আরম্ভমুখেই তাঁহার বিদ্যা-বিলাসের পরিপূর্ণতা প্রকাশিত হইয়াছিল। 'সংকীৰ্ত্তন'-শব্দে বহুলোক মিলিয়া যে শ্রীহরির নাম, রূপ, গুণ পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলার কীৰ্ত্তন, এবং তাদৃশ কীৰ্ত্তনকালে সেবোন্মুখ-জনগণের তত্ত্বদ্ বিষয়ের 'শ্রবণ'কেও লক্ষ্য করে। ইহাই সঙ্কীৰ্ত্তনের বৈশিষ্ট্য। কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা সম্যগ্ভাবে অর্থাৎ নিরপরাধে কীৰ্ত্তিত না হইলে অনাদিবহিস্মুখ কৃষ্ণবিস্মৃত জীবের প্রাপঞ্চিক-বিষয়ে অভিনিবেশত্যাগের আর আদৌ কোন সম্ভাবনা থাকে না। যদি পরলোকের অর্থাৎ পরব্যোম বা পূর্ণ-চেতন-রাজ্যের চিন্ময়ী কৃষ্ণকথা ইন্দ্রিয়তর্পণপর মানবগণের নিকট ফোটের স্কুরণে উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে মনঃ-কল্পিত বিবিধ ইন্দ্রিয়-তর্পণপর প্রাচেষ্টাই ধর্ম্মের নামে প্রচলিত হইয়া জগজ্জঞ্জাল উপস্থাপিত করিবে। অমনোদয়-দয়া-সিন্ধু মহাবদান্ত শ্রীকৃষ্ণচেতন্তদেব অমনোদয়-দয়ার ও অহৈতুকী

কৃপার বশবর্তী হইয়া সমগ্র অচৈতন্য জগদ্বাসীকে তাহাদের অবিদ্যা-জনিত জড়াভিনিবেশ হইতে রক্ষা করিবার মানসে স্ফোটের শুদ্ধ-চৈতন্যময়ী কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি উদয় করাইবার জন্ত তদ্বৃতি কৃষ্ণসেবা-পরাকাষ্ঠা-লাভই যে কৃষ্ণসেবানুগা পরবিদ্যার চরম ফল, তাহা প্রচার করিয়াছেন।

প্রভু বলিলেন,—আমি যে এতকাল যাবৎ শব্দ-শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন ও শ্রবণ করিয়াছি, সেই পঠন-পাঠনের, অধ্যয়ন-অধ্যাপনের ফল-স্বরূপ কৃষ্ণকীর্তনই একমাত্র সার বলিয়া বুঝিয়াছি। উহাই বেদের একমাত্র প্রতিপাদ্য অভিধেয়। অতএব হে ছাত্রগণ, তোমাদের বিদ্যানুশীলনের চরম-ফল-স্বরূপ অনুক্ষণ চিন্তদর্পণ-মাজ্জান, ভবমহাদাবাগ্নি-নির্বাণ, শ্রেয়ঃকুমুদজ্যোৎস্না-বিতরণ, পরবিদ্যাবধু-জীবন কৃষ্ণকীর্তন অনুশীলন করিতে থাক। ইহাই স্ফোটবিচারেরই পারিস্ফুট বিজ্ঞান।

ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ও বিষ্ণুভক্তিজিজ্ঞাসু ছাত্রগণের প্রশ্নে কৃষ্ণসকীর্তনের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া স্বয়ং শুদ্ধ-সরস্বতীপতি শ্রীবিষ্ণুস্বর ছাত্রগণকে শ্রৌতপথ শিক্ষা দিলেন। তাহার শিক্ষায় তর্কপথ আদৃত না হওয়ায় অধিরোহবাদের অকর্ষণ্যতাই প্রদর্শিত হইয়াছে। “জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্ত” এবং “প্রায়েণ বেদ তদিদং”—এই ভাগবত-কথিত শ্লোকদ্বয়-প্রতিপাদিত নিফল অধিরোহ-পথে যে নির্ভেদজ্ঞান ও অনিত্য-কর্মের কুচেষ্ঠা, উহার নিষেধোপলক্ষণেই বিষ্ণুমন্ত্র প্রদত্ত হয়। কিন্তু আধুনিক মনোধর্ম-জীবী শ্রৌতপথবিরোধী হরি-গুরু-বৈষ্ণববিদেষী

বৈষ্ণব-ক্রবের কীর্তিত কোন কল্পিত কৃত্রিম ছড়া প্রভু বা তদীয় নিষ্কপট মুক্তসেবক জগদগুরু আচার্য্য বা প্রচারকগণ কখনও কাহাকেও উপদেশ দেন নাই, পরন্তু গুরুপরম্পরা-প্রাপ্ত মন্ত্রের এবং সম্বোধনাত্মক শ্রীনামেরই উপদেশ দিয়াছেন। প্রভু এই মন্ত্র ও নাম আনায় বা গুরু-পারম্পর্য্য-ক্রমে প্রাপ্ত হইবার লীলা প্রদর্শন করিয়া তাহারই উপদেশ দিয়াছিলেন। প্রভু শিক্ষা দিলেন “(হরে) হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥” এস্থলে প্রথমে হরি ও যাদব-নামদ্বয়ের সহিত কীর্তনেচ্ছু ব্যক্তির শরণাগতি বা আত্মসম্প্রদানাত্মক চতুর্থ-বিভক্তি যুক্ত হইয়াছে; অর্থাৎ কৃষ্ণ-নাম-গ্রহণেচ্ছু জন সর্ব্বাণ্ড্রে কৃষ্ণনাম-কীর্তনৈকব্রত শ্রীসদগুরুর সমীপে আত্মসম্প্রদানমুখে দিব্যজ্ঞান লাভপূর্ব্বক শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের শ্রীমুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম-কথা শ্রবণ করিতে করিতে সম্বোধনপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে নিরন্তর নিরপরাধে কৃষ্ণনাম-কীর্তন অনুশীলন করিবেন। ভগবন্নামের সহিত চতুর্থান্ত-পূর্ব্বক আত্ম-নিবেদন দ্বারা তাঁহার নিষ্কপট ভজন করিতে ইচ্ছা হইলে মন্ত্র-লাভ হয়, আর ভগবন্নামের সম্বোধন দ্বারা ভগবন্নামেরই ভজন অল্পস্থিত হয়। চতুর্থান্ত-পদে শরণাগতি লক্ষিতা হয়। সম্বোধনাত্মক-পদে কীর্তনকারীর নিত্য সেবাকাজ্জ্জ্বাই লক্ষিতা। মন্ত্রজপ-ফলে লব্ধদীক্ষ ব্যক্তির সংসার-বন্ধন-মুক্তি এবং মুক্ত-পুরুষের নাম-সম্বোধন পদ—নিত্যভজন-তাৎপর্য্যপর। কৃষ্ণ-মন্ত্রকে সাধন এবং কৃষ্ণনামকে সাধন ও সাধ্য জানিয়া সাধ্যও সাধন, পরম্পরের অদ্বয়জ্ঞানই অব্যবহিতা ভক্তির পর্য্যায়

স্বীকৃত হইয়াছে। মন্ত্র ও নাম, উভয়েই বাচ্যবিগ্রহ বিষ্ণুরই অভিন্ন বাচক। সম্বন্ধজ্ঞান-লাভের প্রয়াসার্থই মন্ত্রের সাধন এবং মন্ত্রসিদ্ধিতে মুক্ত-পুরুষের ভজনরস্তু। (চৈঃ চঃ আঃ ৭ম পঃ ৭৩ -)” কৃষ্ণ মন্ত্র হৈতে হবে সংসার-মোচন। কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ ॥”

“আপনে কীর্তন-নাথ করেন কীর্তন। চৌদিকে বেড়িয়া গায় সব-শিষ্যগণ ॥ আবিষ্ট হইয়া প্রভু নিজ নাম-রসে। গড়াগড়ি যায় প্রভু ধুলায় আবেশে ॥”

এস্থলে যিনি কীর্তন করিতেছেন, তিনি স্বয়ংই সেই কীর্তনেরই উদ্দিষ্ট বস্তু। নাম ও নামী অভিন্ন, গৌর ও কৃষ্ণ অভিন্ন, সুতরাং প্রভুর কীর্তনে নিজাভিন্ন গোলোকপতি কৃষ্ণের মাধুর্য্য ও বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণের ঐশ্বর্য্যরস প্রকটিত। সেই নাম-রসের আশ্বাদক-সূত্রে কৃষ্ণের মায়ার প্রতি অভিনিবেশ বর্জনপূর্ব্বক কৃষ্ণাভিনিবিষ্ট হইবার লীলা প্রদর্শন করিলেন।

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী গোরাবতার ও কীর্তন-মহিমা বর্ণন করিয়াছেন—“পরম-দয়ালু শ্রীচৈতন্যদেব ইহ-জগতে অকস্মাৎ অবতীর্ণ হইলে যোগ, ধ্যান, জপ, তপ, ত্যাগ, নিয়ম, বেদাধ্যয়ন, সদাচার এই সকল কিছুই ছিল না; এমন কি, যাহার পাপাদি-কর্মে নিবৃত্তিও নাই, সেইরূপ ব্যক্তিও পরম-হর্ষে পুরুষার্থ-শিরোনি পরমপ্রেম লুণ্ঠন করিয়াছিল। আশ্চর্য্য্য-বিভবশালী শ্রীচৈতন্যদেব ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইলে, কস্মিকুলের মন মহাকর্ষ্ম-প্রবাহে নিপতিত থাকিলেও, প্রেম লাভ করিয়া স্থৈর্য্য্যপ্রাপ্ত হইল এবং মহাপাষণ

হইতেও অতিশয় কঠিন মনও ভক্তিরসে দ্রবতা প্রাপ্ত হইল। মহাযোগাদি-সাধনে চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণেরও মন যোগাদি অনিত্যসাধন হইতে বিরত হইয়া উর্দ্ধে নৃত্য অর্থাৎ অধোক্ষজ চিহ্নি-লাসরাজ্যে প্রেম আশ্বাদন করিয়াছিল। শ্রীচৈতন্যচন্দ্র পরভক্তিযোগ-পদবী আবিষ্কার করিলে প্রাকৃত বিষয়-রসমগ্ন ব্যক্তিগণ স্ত্রী-পুত্রাদির কথা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, পণ্ডিতগণ শাস্ত্রসম্বন্ধী বাদ-বিসম্বাদ ত্যাগ করিয়াছিলেন, যোগিশ্রেষ্ঠগণ প্রাণবায়ু-নিরোধার্থ সাধন-ক্লেশ সর্বতোভাবে বর্জন করিয়াছিলেন, তপস্বিগণ তাঁহাদের তপস্যা ত্যাগ করিয়াছিলেন, জ্ঞান-সন্ন্যাসিগণ নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; তখন ভক্তিরস ব্যতীত অণু কোনপ্রকার রস আর জগতে দৃষ্ট হয় নাই। শ্রীগৌরসুন্দর জগতে অবতীর্ণ হইলে গৃহে গৃহে তুমুল হরিসংকীর্ণনের রোল উখিত হইয়াছিল, দেহে দেহে পরিপুষ্ট পুলকাক্ষ-কদম্ব শোভা পাইয়াছিল, প্রেমভক্তির গাঢ়ত্বের উত্তরোত্তর উৎকর্ষে শ্রুতির অগোচর পরমমধুর শ্রেষ্ঠা পদবীও প্রকাশিত হইয়াছিল। সর্বচিত্তাকর্ষক স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মনোহর কনক-কান্তি ধারণ-পূর্বক অবতীর্ণ হইলে মহা-প্রেম-বারিধির রসবন্যায় এই নিখিলজগৎ অকস্মাৎ সর্বতোভাবে প্লাবিত এবং অদৃষ্টপূর্বক ও অশ্রুত-চর প্রেমবিকার দ্বারা অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়াছিল। কোন কোন ব্যক্তি দুর্নিবার গর্বে গর্বিত হইয়া সমগ্রশাস্ত্র সর্বতোভাবে সংগ্রহ করিতেন, অর্থাৎ 'আমি সর্বশাস্ত্রবিৎ, আমা-অপেক্ষা শ্রেষ্ঠব্যক্তি কেহ নাই' - এইরূপ মনে করিতেন। কেহ কেহ বা নিজেই

নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেন, সেই সকল কৃতার্থস্বল্প এবং স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত নিত্য-নৈমিত্তিক-কর্ম, তথা তপস্যা, সাংখ্য-যোগাদিমার্গে উচ্চনীচভাবে অবস্থিত ব্যক্তিগণের কেহ কেহ ছুই তিনবার-মাত্র-হরির নামবলী জপ করিতেন, তথাপি তাঁহাদের চিত্ত কৈতবপূর্ণই ছিল। পূর্বের অবস্থা এইপ্রকার, কিন্তু এখন গৌরচন্দ্র অবতীর্ণ হইলে 'প্রেম'ও সাধারণ হইয়া পড়িল অর্থাৎ আপামর সর্বসাধারণেই এই প্রেম প্রাপ্ত হইল। সুরগণ যাঁহার পাদ-পদ্ম-সেবা বঞ্জা করেন, সেই লীলাময়-পুরুষ শ্রীচৈতন্যদেব প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া বিশ্ববাপিনী সুমধুর প্রেমপীযুষ-লহরী (সর্বত্র) প্রকৃষ্টরূপে বিস্তার করিলে, কি বৃদ্ধ, কি স্ত্রী, কি জড়মতি, কি বালক, কি শোচনীয় নীচব্যক্তি—এই সংসারে সকলেরই ভক্তিলাভে যোগ্যতা এবং শ্রীহরির চরণে কোনও এক অপূর্ব চমৎকারময়-অদ্বয়জ্ঞানরস উদিত হইয়াছিল। প্রেমরস-রসিক-শিরোমণি স্বয়ং ভগবান্ গৌরচন্দ্র ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইলে, শঙ্কর-নারদাদি সকলেই (অদ্বৈত, শ্রীবাস প্রভৃতি ভক্ত-রূপে) আগমন করিয়াছিলেন। স্বয়ং লক্ষ্মাণ (শ্রীলক্ষ্মী প্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-রূপে) আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। স্বয়ং-ভগবান্ হইতে অভিন্ন তদীয় প্রকাশ-স্বরূপ বলদেব (পাষণ্ড-দলনবান্ নিত্যানন্দরায়-রূপে) বিরাজ করিতেছিলেন। যাদবগণও (শচী, জগন্নাথ প্রভৃতিতে) প্রকাশিত হইয়াছিলেন, আর অধিক কি বলিব, নন্দাদি ব্রজবাসিগণ, সুবলাদি-প্রমুখ, সখাগণ, গোপী-প্রমুখ শক্তিগণ, রক্তক, চিত্রক প্রভৃতি দাসগণ,

অর্থাৎ কৃষ্ণলীলার নিত্যসিদ্ধ পার্শ্বদ সকলেই গৌরলীলায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তৎপূর্বে কখনো গৌরসুন্দর পৃথিবীতে স্বীয় অলৌকিক প্রেম বিতরণ করিলে, দাস, সখা ও ঐশ্বর্যজ্ঞানহীন কেবল মধুর-রসের নিত্যসিদ্ধ সেবিকা প্রয়সীবর্গ,—ইহারা সকলেই গৌর পাদপদ্ম-সন্নিধানে অবতীর্ণ হইয়া পূর্বের (কৃষ্ণলীলার) প্রেমাশ্রয়ন অপেক্ষাও মহা-প্রেমামৃত-সম্পত্তি লাভ করিয়াছেন। অতি অলৌকিক পরম-মহিমাযুক্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলে কুলবধুগণও লজ্জা পরিত্যাগপূর্বক কৃষ্ণপ্রেমে অতি উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিত, ইন্দ্রিয়তর্পণপর কুবিষয়-পাষণ-নির্মিত কঠিনহৃদয়ও সর্বতোভাবে দ্রবীভূত হইয়াছিল, তত্ত্বজ্ঞানহীন অজ্ঞ ব্যক্তিগণও চৈতন্য-কৃপায় তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া সকল শাস্ত্রজ্ঞ-সমাজকেও ধিক্কার করিয়াছিল। চৈতন্যবিভাবের পূর্বে এই প্রপঞ্চে সর্বশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতাভিমাত্রী-দিগেরও কৃষ্ণসেবারূপ চেতনবৃত্তি আচ্ছাদিত প্রায় হইয়াছিল। ইহারা সর্বপুরুষার্থ-শিরোমণি কৃষ্ণপ্রেম লক্ষ্য করেন নাই, যেহেতু ইহাদের বুদ্ধিবৃত্তি অতি সামান্য ও সন্দেহ প্রবণা; কিন্তু সম্প্রতি গৌরচন্দ্র কৃপাপূর্বক জগতে উদিত হওয়ায় সুদূর্বোধ, পরমচমৎকার বিভাব-অনুভাবাদি সামগ্রীপুষ্ঠা উন্নতোজ্জ্বল মধুর-রসময়ী প্রেমভক্তিতে কাহাদেরই বা প্রবেশ না হইয়াছে ?

সর্বজ্ঞ মুনিশ্রেষ্ঠগণ তাঁহাদের নিজ-নিজ-মত যুক্তিতর্ক দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে বিস্তৃত করিলেও কোন ব্যক্তিই পূর্বে সেই সকল পক্ষপাতিনী যুক্তিতে সুদৃঢ়-বিশ্বাসী ছিলেন না। সম্প্রতি

অপ্রতিম-প্রভাবশালী শ্রীগৌরচন্দ্র উদিত হইলে পুনরায় একমাত্র হরিভক্তিই যে বেদ-প্রতিপাদ্য পরমাখ', তাহা কেই বা নিশ্চয় না করিয়াছে? বিশেষ সদাচারী ও পরমধার্মিক প্রাচীন-মহাপুরুষগণের দ্বারা কোন কোন ব্যক্তি বৈকুণ্ঠাদি-লোক প্রাপ্ত হইয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্যচন্দ্র যেরূপ সমগ্র বিশ্বকে প্রেম-সমুদ্রে নিমজ্জিত করিয়াছিলেন, পূর্বে আর কেহই এরূপ করেন নাই। ধর্মবিষয়িণী অতুলনীয় নিষ্ঠা এবং শ্রেষ্ঠ-ভক্তি সাম্যরূপে আশ্রয় করিয়াও লোকে লৌহের ন্যায় সুকুঠিন হৃদয় ধারণপূর্বক পৃথিবীতে অবস্থান করে; (কিন্তু শ্রীগৌরহরির কৃপায়) অহো! গোঘাতী অপেক্ষাও পাপীয়ান্ ব্যক্তি (পাপপ্রবৃত্তি হইতে সর্বতো-ভাবে মুক্ত হইয়া) অশ্রু প্রবাহের দ্বারা বিশ্ব প্লাবিত করিয়াছে। অহো! কে-ই বা কাঞ্চনকাণ্ডি শ্রীগৌরঙ্গ-সুন্দরের দুর্বিগাহ রঙ্গ জনিতে পারে! বিপুল-দুরবগাহ-প্রভাবে শ্রীগৌরসুন্দর সমগ্র বিশ্বকে বিস্ময়াবিষ্ট করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণাবেশ-হেতু কখনও বালকৃষ্ণলীলা প্রকাশ করিয়া, জ্ঞানু দ্বারা চণ্ডক্রমণ করিতেছেন, কখনও বা গো-পালকের চরিত্র প্রকাশ করিয়া, কখনও বা বহুভঙ্গী অভিনয় করিয়া নৃত্য করিতেছেন, আবার কখনও শ্রীকৃষ্ণবিরহে শ্রীরাধার ভাবে আধিষ্ট হইয়া 'হরি'! 'হরি'!! 'হরি'!!!—এইরূপ বিরহপীড়াজনিত আর্তিসহকারে রোদন করিতেন। নিজপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া শ্রীগৌরসুন্দর পৃথিবীতে উদ্ভঙ-নৃত্য আরম্ভ করিলে দেবগণ ছন্দুভি বাদন করিয়াছিলেন, প্রধান প্রধান গন্ধর্বগণ সঙ্কীর্ণন

আরম্ভ করিয়াছিলেন, সিদ্ধগণ নিরন্তর পুষ্পবৃষ্টিদ্বারা ভূমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়াছিলেন। মনোহর স্তোত্রপাঠ-কুশল মহর্ষিবৃন্দ প্রীতির সহিত স্তব করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরহরি মহাভাবামৃত রসে মগ্ন হইয়া কখনও হাস্য করিতেন, কখনও রোদন করিতেন, কখনও মূচ্ছিত হইতেন, কখনও ভূমিতে লুপ্তিত হইতেন, কখনও দ্রুত গমন করিতেন, আবার কখনও দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেন, কখনও বা 'হা হা' এইরূপ মহৎ শব্দ করিতেন; —এইরূপ নানাভাবে প্রপঞ্চে বিহার করিয়াছিলেন।”

শ্রীলপ্রবোধানন্দসরস্বতীপাদের উক্ত বর্ণনায় ফোটেবাদের বিভিন্ন প্রকার প্রকাশের কথা ব্যক্ত হইয়াছে। অল্প-ব্যতিরেক-ভাবে ফোটেবাদের প্রকাশ, সর্বত্র, সর্বদা, সর্বপাত্রে, সর্বকালে, সর্বগোভাবে, পরিপূর্ণতম ভাবে শ্রীগৌরহরির কৃপা ও প্রকাশ দ্বারা ফোটেবাদের সর্বপ্রকার বৈচিত্র্য অদ্ভুতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

চতুর্থ ক্রম

ফোটেবাদের আনন্দনামসম্বল—শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ শ্রীশ্রীবৃহদবৈষ্ণবতোষনীতে (ভাঃ ১০।৮৭।১৭) ব্যাখ্যা করিয়াছেন—“অল্পময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়—এই পঞ্চবিধ আত্মার মধ্যে যাহা চরম, সেই আনন্দময় আত্মাই আপনিই হ'ন। ইহাদের মধ্যে প্রথম তিনটিতে আত্মার অধ্যাস হেতুই (অর্থাৎ আত্মত্বের আরোপ হয় বলিয়াই)

ইহাদিগকে এস্থলে আত্মা বলা হইয়াছে। সেই আনন্দময় আপনি কিরূপ? এই অন্নময় প্রভৃতির মধ্যে জীবগণের উপকারের জন্ম অন্নয় (অনুপ্রবিষ্ট); কারণ, পরমানন্দস্বরূপ আপনাত্মা হইতেই জীবগণের প্রাণাদি ব্যাপার উদ্ভূত হয়, ইহা শ্রুতিপ্রসিদ্ধ। এইরূপে আপনি জীবগণের উপকারী। তন্মধ্যে ‘অন্নময়’ আত্মা এই স্থূল দেহই। ‘প্রাণময়’ আত্মা—পঞ্চবিধ বৃত্তিবিশিষ্ট প্রাণ, যাহা অন্নময় অপেক্ষা অন্তরঙ্গ এবং যাহার নির্গমনে জীবের মৃত্যু বলা যায়। এই প্রাণরূপী জড় আত্মা অপেক্ষাও ‘মনোময়’ আত্মা অন্তরঙ্গ; কারণ, চিৎসম্বন্ধহেতু ইহার জ্ঞান-সামর্থ্য বিদ্যমান। এই মনোময় আত্মা ইন্দ্রিয়রূপী। ইহা অপেক্ষা ‘বিজ্ঞানময়’ আত্মা অর্থাৎ ‘জীব’ অন্তরঙ্গ; যেহেতু বাহ্য ভোগাদিবিষয়ে কৰ্ত্তৃত্বহেতু পূর্ববর্ত্তিগণের অপেক্ষা ইহার শ্রেষ্ঠত্ব রহিয়াছে। পুনরায় বলিতেছেন—আপনি ‘পুরুষবিধ’ অর্থাৎ অন্নময়াদি পুরুষগণের ন্যায় আপনারও শিরঃ, পক্ষ প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। অথবা, যাহা হইতে অন্নময়াদি চতুর্বিধ পুরুষের ‘বিধা’ অর্থাৎ রচনা হইয়াছে, সেই আনন্দময় পঞ্চম আত্মা আপনিই হ’ন। ‘আনন্দময়োহভ্যাসাৎ’ (ত্রঃ সূঃ ১।১।১২) এই ব্রহ্মসূত্রে এইরূপই নির্ণীত হইয়াছে। এইরূপে সর্ব্বতোভাবে প্রকৃতির সম্বন্ধরহিত ও পরিচ্ছেদাতীত পরমানন্দবস্তুই বিবক্ষিত হ’ন। ‘আনন্দময়’—আনন্দ-প্রচুর; প্রাচুর্য্যার্থে ‘ময়ট্’ প্রত্যয় হইয়াছে। ‘সূর্য্য—প্রকাশ-প্রচুর’ এইরূপ বলিলে যেরূপ সূর্য্যে প্রকাশ-বিরোধী অপ্রকাশ-ভাবের সম্পর্ক প্রতীত হয় না, সেইরূপ ‘আনন্দময়’

অর্থাৎ আনন্দ প্রচুর—এইরূপ বলিলেও তাহাতে আনন্দ-বিরোধী ছুঃখভাবের যৎকিঞ্চিৎ সম্পর্কও আশঙ্কিত হইতে পারে না। সুতরাং তাহার আনন্দৈকস্বরূপত্বের কোন হানি হয় না। অথবা, এ স্থলে ঋতিতে ব্রহ্ম, মোদ, প্রমোদ, ইত্যাদিরূপে আনন্দের যে সকল বিশেষ প্রকাশ উক্ত হইয়াছে, তদপেক্ষা আনন্দরূপ প্রকাশেরই প্রাচুর্য্যাহেতু ‘আনন্দময়’ পদে প্রাচুর্য্যার্থে ‘ময়ট্’ প্রত্যয় সুসমঙ্গতই হয়। অথবা, ‘আনন্দময়’ পদে স্বরূপার্থে ‘ময়ট্’ (অর্থাৎ তিনি আনন্দ-স্বরূপ)। তিনি জীবন্মুক্ত, সেবক, গুরুজন, বয়স্য ও প্রেয়সী-রূপ পঞ্চবিধ উপাসকগণের সম্বন্ধে যথাক্রমে ব্রহ্ম, মোদ, প্রমোদ, প্রিয় ও আনন্দস্বরূপে প্রকাশমান; আর, ঐ পঞ্চবিধ স্বরূপ যথাক্রমে তাঁহার পুচ্ছ, দক্ষিণপক্ষ, বামপক্ষ, শিরঃ ও আত্মরূপে নিরূপিত হন। এই স্থলে অন্তময় প্রভৃতি পূর্ব্ব-পদার্থ চতুষ্টয়ের উক্তি ‘শাখাচন্দ্র-ন্যায়’ অনুসারে (অর্থাৎ প্রথমতঃ স্কুলকে অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ সূক্ষ্মতত্ত্বে শিষ্যের বুদ্ধিকে উপনীত করিবার অভিপ্রায়েই) উক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠত্বজ্ঞানে আর্থিক ক্রমানুসারে এইরূপ ব্যাখ্যা হয়—জীবন্মুক্ত দ্বিবিধ। তন্মধ্যে এক শ্রেণীর জীবন্মুক্তগণ ভক্তিশূন্য, নিজস্বরূপৈকনিষ্ঠ ও আত্মারাম। অপর জীবন্মুক্তগণ ‘শান্ত ভক্ত’; তাঁহারা আত্মারামতা-সুখভোগী এবং ভগবৎকৃপায় শান্তরতির অধিকারী বলিয়া ভক্তগণের মধ্যে বিশেষ আদৃত নহেন। উক্ত দ্বিবিধ উপাসক-গণের মধ্যে প্রায়শঃ তাঁহাদিগের আত্মার অভিন্নরূপে (অদ্বৈত-

ভাবে) ভগবানের যে প্রাকটা, তাদৃশ প্রকাশই ব্রহ্ম। তন্মধ্যে অদ্বৈতকনিষ্ঠ প্রথম উপাসকগণের সম্বন্ধে নিজ স্বরূপের নির্বিশেষভাবে চিদ্রূপ ব্রহ্মই প্রকাশিত হ'ন; পরন্তু দ্বিতীয় উপাসকগণের সম্বন্ধে চিদ্ব্যনস্বরূপ মূর্ত্তিমান পরব্রহ্মই প্রকাশিত হ'ন; কিন্তু ঘন বা অঘনভাবের বিশেষ বিবেক অর্থাৎ নির্দ্বারণ থাকে না। এই দ্বিবিধ স্বরূপই চিদ্রূপে এক বলিয়াই এস্থলে অভিন্নরূপে এক 'ব্রহ্ম' পদেই উল্লিখিত হইয়াছেন; আর, নির্বিশেষত্ব-নিবন্ধন স্বাদবিশেষের অভাবহেতু, অনুভবম অঙ্গ বলিয়া তাঁহাকে 'পুচ্ছ' বলা হইয়াছে। এই ব্রহ্মই পুচ্ছরূপে প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ মোদ প্রভৃতির আধার। যদিও আনন্দময়ই সকলের প্রতিষ্ঠাস্বরূপ, তথাপি সেই নির্বিশেষ ও সবিশেষ তত্ত্বের বস্তুগত ঐক্যাভিপ্রায়েই ব্রহ্মত্বকে প্রতিষ্ঠা বলা হইল। অনন্তর ন্যূন, অধিক ও সাধারণরূপে ত্রিবিধ ভাব বলা হইতেছে। তন্মধ্যে যাঁহার নিজেকে অতি নিকৃষ্ট এবং ভগবান্কে সর্বোৎকর্ষভাগী সর্ব্বাধিকরূপে অবগত হইয়া তাঁহার উপাসনা করেন, ভয় ও গৌরব জ্ঞানাদিবশতঃ নম্রভাবাপন্ন সেই উপাসকগণ উত্তরোত্তর রুচিজনক ও স্মৃতিশীল এবং প্রীতিরতির সম্বন্ধীয় পরমাত্মীষ্ট প্রকৃষ্ট প্রেমের আশ্বাদনরত হইলে তৎকালে তাঁহাদের তাদৃশ চমৎকারকারী আনন্দরূপে শ্রীভগবানের প্রকাশবিশেষই মোদ নামে অভিহিত হইত। পুচ্ছরূপী ব্রহ্ম অপেক্ষা তাঁহার বৈশিষ্ট্যহেতু তাঁহাকে দক্ষিণপক্ষ বলা হইল। যাঁহার নিজেকে লালক ও পালক প্রভৃতিরূপে ভগবান্ অপেক্ষা অধিক এবং

ভগবান্কে নিজের লাল্য ও অনুগ্রাহ প্রভৃতিরূপে নিজ অপেক্ষা নূন্য জ্ঞান করিয়া তাঁহার উপাসনা করেন, পুত্রাদিভাবের উপাসক সেই শ্রীযশোদা প্রভৃতি বাৎসল্যরসাস্রিত ভক্তগণ বাৎসল্য-রসের প্রকর্ষভূত প্রেমবিশেষ অনুভব করেন ; আর তাঁহাদিগের নিকটে তাদৃশ পরমানন্দরূপে ভগবানের যে প্রকাশ-বিশেষ, উহাই—প্রমোদ । পূর্ব্বাপেক্ষা ইহার শ্রেষ্ঠতা হেতুই ‘প্র’-শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে । যাঁহারা একত্র উপবেশন, শয়ন, ক্রীড়া, জয় ও পরাজয় প্রভৃতি ব্যাপারে ভগবানের সহিত অবিশেষভাবেই নিজের সাম্য এবং নিজের সহিত শ্রীভগবান্কে অনূন ও অনধিক জ্ঞান করিয়া উপাসনা করেন, শ্রীদাম প্রভৃতি বয়স্গণই তাদৃশ ভক্ত । তাঁহারা ভয়, গৌরব বা অনুগ্রহাদি বুদ্ধিরহিত । তাঁহারা পরম স্বাছুতম মৈত্রী-ভাবাদিপূর্ণ পরম-প্রণয়হেতু প্রাচুর্ভূত সখ্যতির প্রকর্য্যস্বরূপ উত্তম প্রেম অনুভব করিলে তাদৃশ ভাবানুসারে পরম প্রেমাঙ্গদরূপে ভগবানের যে প্রকাশ বিশেষ, তাহাই প্রিয় শব্দদ্বারা নির্দিষ্ট হইয়াছে । পূর্ব্বতত্ত্ব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব-হেতু ইহাকে শিরঃ বলা হইয়াছে । এইরূপে চতুর্বিধ উপাসকের নিরূপন হইয়াছে । সম্প্রতিপঞ্চম শ্রেণীর উপাসক-গণের নিরূপণ হইতেছে । যাঁহারা :শ্রীভগবান্কে পরমকান্ত, কন্দর্পকোটিরমণীয় এবং নিজ কোটি আত্মার ন্যায় প্রিয়-জ্ঞানে উপাসনা করেন, শ্রীব্রজদেবী-প্রমুখ প্রেয়সীগণই সেই পঞ্চম শ্রেণীর উপাসক । তাঁহারা নিরন্তর অসমোদ্ধ মাধুরীপরিপূর্ণ অনুরাগরাশি সর্ব্বদা আশ্বাদন করিলে তাদৃশ মহাভাবের

অনুকূল পরম-প্রেষ্ঠরূপে শ্রীভগবানের যে প্রকাশবিশেষ, তাহাই আনন্দ-নামে উক্ত হইয়াছে। 'মোদ' প্রভৃতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্বহেতু এই আনন্দ এস্থলে আত্মা বলিয়া বর্ণিত হইতেছে। এইরূপ সিদ্ধান্তপক্ষে প্রথমতঃ 'সৎ' ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মত্ব ব্যাখ্যা, হইয়াছে। 'এষু'—এই পঞ্চ প্রকাশের মধ্যেও সেইরূপ আপনি সৎ ও অসৎ অপেক্ষা 'পর'। 'সৎ'—অন্নময়াদি স্থূলত্রয়। 'অসৎ'—বিজ্ঞানময় জীবরূপ সূক্ষ্মতত্ত্ব। (আপনি) এই উভয়ের 'পর' অর্থাৎ ব্রহ্ম। এইরূপে পঞ্চবিধ তত্ত্বমধ্যে ব্রহ্মত্ব নির্দ্ধারিত হইলে যাহা 'অবশেষ' অর্থাৎ অবশিষ্ট মোদ প্রভৃতি চারিটি তত্ত্ব, তাহাও আপনিই হ'ন। তন্মধ্যে সূর্য্যস্থানীয় ঘনানন্দমূর্ত্তির রশ্মিস্থানীয় ব্রহ্ম অমূর্ত্ত, আর উক্ত ঘনানন্দ-মূর্ত্তির প্রকাশ-স্বরূপ পরব্রহ্ম এবং মোদ প্রভৃতি চতুষ্টিয়—মূর্ত্ত পদার্থ। এইরূপে শান্ত, শ্রীত, বৎসল, প্রিয় ও উজ্জ্বল এই পঞ্চবিধ মুখ্যরসের বিষয়ীভূত শ্রীভগবান্ এক হইয়াও উপাসকগণের বৈচিত্র্য হেতু ব্রহ্ম, মোদ, প্রমোদ, প্রিয় ও আনন্দ—এই পঞ্চ প্রকারে উক্ত হইয়াছেন ; কিন্তু অতুলনীয় পরমঘন আনন্দরূপে অনুভবহেতু উক্তস্বরূপ এই 'রস'ই ভগবান্। আনন্দময়াধিকরণে শ্রুতিও (তৈ ২।৩।১) এইরূপ—'তিনি রসস্বরূপই হ'ন আর তাঁহাকে রসরূপে অনুভব করিয়াই এই জীব আনন্দযুক্ত হ'ন।' উক্ত বিষয়টিকে যৎকিঞ্চিৎ বিশেষার্থযুক্তরূপে অনুকীৰ্ত্তন করিয়াই উপসংহারে বলিতেছেন—'স্বতম্' ইত্যাদি। শ্রুত্যানুপ্রতিষ্ঠা-স্থানীয় এই যে আনন্দময়, তিনিই 'স্বত' অর্থাৎ মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত

সর্ববিধ প্রকাশস্বরূপ বলিয়া সকলের প্রতিষ্ঠা-স্বরূপ। গীতা-শাস্ত্রেও (১৪।২৬) “স গুণান্” ইত্যাদি বাক্যের পর বলিয়াছেন “ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্” (গীতা ১৪।২৭) ইত্যাদি। ইহার অর্থ—তিনি ব্রহ্মজ্ঞগণ-কর্তৃক নিজ হইতে অভিন্ন জ্ঞানে ও শান্তভক্তগণ-কর্তৃক ঘনীভূত ব্রহ্মজ্ঞানে উপাস্ত্র এবং শ্রুতি-কর্তৃক পুচ্ছরূপে বর্ণিত, সেই ব্রহ্ম অর্থাৎ সর্বব্যাপক বস্তুর প্রতিষ্ঠা (আশ্রয়)-রূপে শ্যামোজ্জল নিখিলানন্দমূর্ত্তি আমিই বিরাজমান। ব্রহ্মসংহিতায় (৫।৫১) আদিপুরুষ-রহস্যস্তবেও বলিয়াছেন—“যস্য প্রভা প্রভাবতঃ” ইত্যাদি। এইরূপ ভক্তগণ কর্তৃক পরমাতীষ্ট দৈবতরূপে পরম আরাধ্য যে শাস্ত্রত ধর্ম—যাহা প্রীতিভক্তিরূপে খ্যাত, আমি তাহারও প্রতিষ্ঠা। এইরূপ ‘মোদ’ অর্থাৎ মদীয় প্রকাশ বিশেষের আমিই প্রতিষ্ঠা। অর্থাৎ এই মোদ-রূপে আমি সেবকগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হই। এইরূপ, গুরুজন কর্তৃক প্রগাঢ় বাৎসল্যের বিষয়রূপে, অনুশীলিত ‘অমৃত অব্যয়’ বস্তুর অর্থাৎ সর্বদা একরূপে বর্তমান মাধ্যমের সারস্বরূপ ‘প্রমোদ’ নামক মদীয় প্রকাশবিশেষের আমিই প্রতিষ্ঠা। অর্থাৎ পরম অচিন্ত্য সর্ববিধ ঐশ্বর্য্যাতিশয় দ্বারা পরিপূর্ণতা হেতু জগতের অনুগ্রাহক হইয়াও পূজ্যগণের নিকট পরম অনুগ্রাহ্য প্রমোদ-রূপেই প্রতিষ্ঠিত হই। পূর্বেক্ত ব্যাখ্যাক্রমানুসারে সেবকগণের অনন্তর এই বৎসল ভক্তগণের নির্দেশ উচিত হইলেও গীতা-শাস্ত্রে শান্তভক্তগণের পশ্চাতে ইহাদের নির্দেশের কারণ এই যে—শান্ত ও বৎসল এই উভয় রসের আশ্রয়গণই পূজ্যরূপে সমান। আর, পরম-

প্রিয়গণ ও পরম প্রেয়সীগণ যাঁহার অনুশীলন করেন, সেই ঐকান্তিক সুখের অর্থাৎ ঐকান্তিক প্রিয় ও আনন্দ শব্দদ্বারা নির্দেশ্য পরম আত্যন্তিক সুখস্বরূপ মদীয় সর্বোত্তম প্রকাশ বিশেষেরও আমিই প্রতিষ্ঠা। অর্থাৎ পরমপ্রেষ্ঠবর্গ ও পরম-প্রেয়সীবর্গের মধ্যে আমি সর্বোৎকৃষ্ট প্রেষ্ঠরূপে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছি। এই পঞ্চম তত্ত্ব অতি রহস্য বলিয়া এবং এস্থলে অর্জুন উপদেশের পাত্র বলিয়া উভয় তত্ত্বকেই অপৃথগরূপে যুগপৎ সূচনা করা হইয়াছে। কাহারও মতে মহাবৈকুণ্ঠাধিপতি পুরুষোত্তমই ‘আনন্দময়’ শব্দবাচ্য এবং তাঁহারই চতুর্ভূহ, প্রিয় মোদ, প্রমোদ ও আনন্দ শব্দ দ্বারা নির্দেশ্য হন। তাঁহার অমূর্ত স্বরূপই ‘ব্রহ্ম’। (শ্রীলসনাতনগোস্বামিপ্রভুকৃত শ্রীশ্রীবৃহদ্বেদবৈষ্ণবতোষণীর-(১০।৮৭।১৭) অনুবাদ।

স্ফোটের প্রকাশ তারতম্য—মুক্তিঃ—শ্রীলসনাতন-গোস্বামিপাদ-শ্রীবৃহদ্রাগবতামৃতে বর্ণনা করিয়াছেন—“আরোগ্য রোগরূপ দুঃখের অভাবকেই যেরূপ সুখ, অথবা তমোময়ী সুষুপ্তিদশায় সুখের অনুভবের অভাবেও যেরূপ আমি ‘সুখে ঘুমাইয়াছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই’—এইরূপ নানামনোরথ-স্বপ্নাদি-মনোবৈকল্যরূপ দুঃখাভাবকেই সুখ বলিয়া কল্পনা করা হয়, সেইরূপ সর্ববশৃঙ্খতারূপ জন্মমরণাদি-সংসার-দুঃখের অভাবই—মোক্ষও সুখ বলিয়া কল্পিত হয়। বস্তুতঃ, তাহাতে বাস্তব সুখ নাই, কেবল অনভিজ্ঞগণকেই ঐরূপ মোক্ষ প্ররোচিত করা হয়। কারণ, মোক্ষকে অজ্ঞানই বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ, মোক্ষের কোন সত্যতা নাই। শ্রীমদ্রাগবতের দশম-

স্কন্ধে শ্রীব্রহ্মা বলিয়াছেন যে সংসার-বন্ধন ও মোক্ষ—এই দুইটি অজ্ঞান-পদবাচ্য, সুতরাং সত্যজ্ঞান হইতে ভিন্ন। ভগব-
 দ্বক্তগণের অনায়াসে ও আনুষ্ঙ্গিকভাবেই মোক্ষ সিদ্ধ হয়।
 শ্রীভগবানের শ্রীনামের সেবা দূরে থাকুক, ভগবানের নামের-
 আভাসেই প্রতিবিশ্ববৎ আনুকরণিক শব্দের দ্বারা নামের
 সামান্য ও কোনপ্রকারে একবারমাত্র জিহ্বাগ্রে উচ্চারণ-
 মাত্রেই অনায়াসে মোক্ষ লাভ হয়। ইহার সাক্ষ্য—শ্রীমদ্ভাগ-
 বতে শ্রীঅজামিল ও বরাহপুরাণোক্ত নরখাদক ব্যাঘ্র
 এক ব্রাহ্মণ জলমগ্ন হইয়া ভগবানের নাম জপ করিতেছিলেন,
 এমন সময় একটি ব্যাঘ্র সেই ব্রাহ্মণকে আক্রমণ করে।
 দৈবযোগে সেই ব্যাঘ্র একটি ব্যাধের শরনিক্ষেপে মরণোন্মুখ
 হইলে উক্ত ব্রাহ্মণের কণ্ঠনিঃসৃত নামশ্রবণফলে সেই ব্যাঘ্র মুক্তি
 লাভ করিয়াছিল। (শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত ২।২।১৭২-৭৩) ॥ শ্রীল
 সনাতন-গোস্বামিপাদ বিভিন্ন মতবাদিগণের দুঃখধ্বংসরূপ-
 মোক্ষের সম্বন্ধে এইরূপ বিচার করিয়াছেন,—একবিংশতি
 প্রকার দুঃখের লোপই—মোক্ষ, ইহা নৈয়ায়িকগণের মত।
 অতএব নৈয়ায়িকগণ বলিয়াছেন, আত্যন্তিকী দুঃখ-নিবৃত্তির
 নাম মুক্তি ইত্যাদি। কোন কোন বৈদান্তিক সম্প্রদায়ের
 মতে অবিচার ও কর্মের ক্ষয়ই হইল মোক্ষ। বৈশেষিক,
 মীমাংসা ও সংখ্যাदिशास्त्रের মত উত্থাপিত হইল না। কারণ,
 তাঁহাদের দ্বারা মোক্ষের যে স্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে, তাহাতেই
 তাঁহাদের কল্পিত মোক্ষের অতি তুচ্ছতা স্বতঃই প্রকাশিত
 হইয়াছে। মায়াবৃত্ত অন্যথা রূপের—সংসার-দশার, অথবা

ভেদজ্ঞানের त्याগ হইতেই আত্মরূপ ব্রহ্মের যে অনুভব, তাহাই—মোক্ষ ; ইহাই নিবর্তবাদি-বৈদান্তিকগণের মুখ্য মত । তাঁহাদের মতের দ্বারাই জানা যায় যে, মোক্ষের দুঃখের অভাব ও দুঃখের কারণভাব মাত্রই বিদ্যমান । ইহার দ্বারা বাস্তব সুখ-প্রাপ্তি নাই, ইহাই সিদ্ধ হইতেছে । নিবিশেষবাদিগণ অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মের অনুভব করেন । সুতরাং তাঁহাদের অনুভূত সুখও অপরিচ্ছিন্ন হইবে না কেন ? ইহার উত্তর এই, তাঁহাদের ব্রহ্ম নিঃশূন্য অর্থাৎ করুণা প্রভৃতি গুণহীন ; তাঁহাদের ব্রহ্ম নিঃসঙ্গ, সুতরাং ভক্তজনের সঙ্গাদি-রহিত ; তাঁহাদের ব্রহ্ম নিবিকার, সুতরাং তাঁহার চিত্তের আদ্র্তারূপ বিক্রিয়া নাই অথবা তিনি বিচিত্র শ্রীমুক্তি-বৈভবাদি-পরিমাণ-রহিত ; তাঁহাদের ব্রহ্ম নিরীহিত অর্থাৎ বিচিত্র মধুর লীলাহীন । অতএব যে তত্ত্বে ভগবত্তার অভাব ও সচ্চিদানন্দঘনত্বের অভাব, সেই তত্ত্বের অনুভবের দ্বারা সুখও সেইরূপই হইবে । মুমুক্শুগণ জন্মমরণাদি দুঃখের দ্বারা, সংসার-যাতনার দ্বারা এবং সর্বদাই নানাবিধ উদ্বিগ্নের দ্বারা সতত ব্যাকুলান্তঃকরণ বলিয়া তাঁহাদের চিত্তের আদ্র তা ও কোমলতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে । তাঁহাদের চিত্তে প্রীতি-হীনতা, শুষ্কতা ও কাঠিন্য-ভাবই প্রবল । সংসারের উগ্রতাপে তাঁহাদের চিত্ত দগ্ধ হওয়ায় তাঁহারা কেবল দুঃখনিবৃত্তির জগ্গই ব্যাকুল । তাঁহাদের রস-গ্রহণের সামর্থ্য নাই । মুমুক্শুগণ সংসার-যাতনা হইতে উদ্ধার লাভ করিবার জন্য—সংসারজ্বালা নিবারণ করিবার জন্য, মোক্ষের শরণাপন্ন এবং মোক্ষকেই

সুখের পরাকাষ্ঠী বলিয়া স্তুতি করেন। বস্তুতঃ, সংসারদুঃখ-নিবারণরূপ মোক্ষেরূপ কোন বাস্তব সুখ নাই। যেমন স্বর্গকামিগণ পতন-ভয়, স্পর্ধা, নশ্বরাদি-দোষ থাকা সত্ত্বেও স্বর্গকেই চরম সুখ বলিয়া থাকেন, তেমনি মুমুক্শুগণও সুখবৈচিত্রীর একান্ত অভাব থাকা সত্ত্বেও দুঃখমাত্র-নিবারক মোক্ষকেই পরম পুরুষার্থ বলেন। অপর দিকে, ভক্তিসুখ—ভগবৎপ্রেমবিলাসরূপা স্বরূপশক্তির বৃত্তি বলিয়া পরম মহৎ হইলেও ক্ষণে ক্ষণে নূতন হইতেও নূতনরূপে, মধুর হইতেও সুমধুররূপে এবং অধিক হইতেও অধিকতররূপে ভক্তের দ্বারা অনুভূত হয়। মুক্তিতে যে ব্রহ্মসুখ, তাহা এইরূপ নহে। কেন না তাহা সীমায়ুক্ত; তাহাতে বিচিত্রতা নাই—বিলাস নাই—পরতত্ত্বের সুখানুসন্ধানবৈচিত্রী নাই। (বৃঃ ভাঃ ২।২।১৭১-৭৭, ১৯০, ১৯৩)

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণযুগল—সুখস্বরূপ ও সুখের আশ্রয়, উভয়ই; যেরূপ মিছরির পিণ্ড একাধারে মিছরি (মিষ্ট দ্রব্য) ও মিছরির (মিষ্ট বস্তুর) আধার। কিন্তু ব্রহ্ম—কেবল সুখ-স্বরূপ, সুখের আধার নহেন; যদি আধার বলা যায়, তাহা হইলে ব্রহ্মে ভেদ-ভাব অর্থাৎ আধার-আধেয় ভাব উপস্থিত হয়, সুখের বৈচিত্রী, তরঙ্গাদিও থাকে। কিন্তু ব্রহ্ম তাহা নহেন। অত্য়দিকে, কোটী-সমুদ্ভগস্তীর, পরমাশ্চর্য্যমহিমাম্বিত শ্রীভগবানে অচিন্ত্য ভেদাভেদাদিরূপ বিচিত্র বিরোধের প্রবাহ নিত্য বর্তমান। এজন্য শ্রীভগবান্ পরমানন্দ-স্বরূপ হইয়াও পরমানন্দের আধার। (বৃঃ ভাঃ ২।৮।১৮১)।

গো, ব্রাহ্মণ, যজ্ঞ ও বেদাদির বিনাশক দৈত্যগণকে মুক্তি-
কামিগণও নিন্দা করেন। সেই গো, বিপ্র, যজ্ঞাদি-ঘাতী কংসা-
সুরাদি দৈত্যগণকেও যখন মুক্তিলাভ করিতে দেখা যায়, তখন
দুঃখনিবৃত্তিরূপ মুক্তি কিরূপে প্রশংসনীয় হইতে পারে?—দৃষ্ট
ব্যক্তিগণের প্রাপ্য বস্তু শিষ্ট ব্যক্তিগণের গ্রহণীয় হইতে পারে
না। ব্রহ্মানুভবকারী, আত্মারাম, জীবনমুক্ত সিদ্ধগণেরও
দুঃখাভাব-মাত্রই লাভ হয়, আর শ্রীভগবদ্ভক্তগণ বৈকুণ্ঠে গমন
না করিয়াও এই জগতে পাঞ্চভৌতিক দেহে থাকাকালেও
শ্রীভগবানের কৃপায় সর্বক্ষণ সান্দ্রসুখবিশেষ অনুভব করেন।
(ঐ ২।২।২০০, ২০৩)। অগ্নিদি রন্ধন করিবার নিমিত্ত যে অগ্নি
প্রজ্জ্বলিত করা হয়, খাওয়া রন্ধন কার্য্যই সেই অগ্নির প্রকৃত
উদ্দেশ্য ; কিন্তু উহার দ্বারা অনুষঙ্গিকভাবেই গৃহের অন্ধকার ও
শীত নাশ হয়—এই দুইটিই অবাস্তুর ফল। তদ্রূপ, ভক্তির মুখ্য
উদ্দেশ্য—শ্রীভগবানের প্রীতি অর্থাৎ ভগবৎসুখানুসন্ধান, মুক্তিরূপ
দুঃখনিবৃত্তি নহে। ভক্তের নিকট মুক্তি, আত্মারামতা, যোগসিদ্ধি
ও জ্ঞানাদি অবাস্তুর ফলসমূহ আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে,
কিন্তু ভক্ত ঐ সকল গ্রহণ করেন না। কারণ ভক্তির মুখ্যফল
যে ভগবৎপ্রীতি, ঐগুলি তাহার বিরোধী। (ঐ ২।২।২০৯)

মুক্তি-সুখ সর্বদাই একরূপ, আর শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য-
বিশেষের প্রভাবে ভক্তিসুখ সর্বদাই অদ্ভুত অর্থাৎ পরম অনি-
র্বচনীয় ও বিচিত্রতাপূর্ণ। অতএব সাযুজ্যরূপা মুক্তি হইতে
ভক্তি-সুখ সর্বতোভাবে বিপরীত। মুক্তি-সুখ—শেষসীমাপ্রাপ্ত
একরূপ, পরিপূর্ণ ও তৃপ্তিজনক। কিন্তু ভক্তি-সুখ—অনেকরূপ,

অপরিচ্ছিন্ন এবং তৃপ্তিনিবারক অর্থাৎ যতই অনুভব করা যায়, ততই পরমেশ্বরের সুখানুসন্ধানের জন্ম—তাঁহাতে শ্রীতি করিবার জন্ম, সহজ লালসারই উদয় হয়। ভক্তিসুখ প্রতিক্ষণে নূতন হইতে নূতন—মধুর হইতে মধুর বিচিত্ররূপে বর্দ্ধমান। ‘যিনি তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ, তিনি তাহা জানেন,—এই গ্ৰায়ে ভক্তি-বিলাস-মাধুর্যাতিশয়ায়ক যে সুখ, তাহা অনুভবকারী ব্যতীত অপরে বুঝিতে পারে না। সুতরাং দুঃখানুভূতিহীনতারূপস্বয়ং-মুক্ত্যাগ্নক মুক্তি হইতে পরমমনোহর মহান্ভক্তিবিলাসবৈভব-মাধুর্যাতিশয়রূপ পরমধনাত্মক বাস্তব ভক্তিসুখবৈচিত্রী সর্ব্বতোভাবে বিলক্ষণ। (ঐ ২।২।২১৭)। মোক্ষ লম্পট ব্যক্তির স্থায়। লম্পটকে যেমন বাধা দিলেও সে ধুঁষ্টতা করিয়া গৃহে প্রবেশ করিতে চায়, সেইরূপ ভগবন্তের সঙ্গপ্রভাবে জীবনমুক্ত ভক্তগণ অতি তুচ্ছবোধে মুক্তিকে পরিত্যাগ করিলেও মুক্তি যেন বলপূর্ব্বক ভক্তের অনুগমন করে অর্থাৎ ভগবন্তের অতি আনুষঙ্গিকভাবেই সমস্ত দুঃখ-নিবৃত্তি, আত্ম-রামতা প্রভৃতি লাভ হয়। তাঁদের চিত্ত ভগবৎপ্রেমানন্দে সর্ব্বদা তন্ময়। ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতীয় স্ফোট-দর্শনের প্রয়োজন ও সিদ্ধান্ত। (ঐ ২।৫।১৯৮)

অভিধেয়-বিচারে—ব্রহ্মসূত্রের সাধনাধায়ে অর্থাৎ তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে উপাসনার প্রতিকূল বিষয়ে বৈরাগ্য, দ্বিতীয় পাদে প্রাপ্য বিষয়ের জন্ম তৃষ্ণা, তৃতীয় পাদে উপাসনার প্রকার আলোচনা এবং চতুর্থ পাদে পরাবিছা বা ভক্তির দ্বারাই পরম পুরুষার্থ-লাভের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। “অপি সংরাধনে

প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্' (ব্রঃ সূঃ ৩।২।২৪) ;—অপি (পূর্বসূত্রে ব্রহ্মকে অব্যক্ত অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য বলা হইয়াছে, তথাপি) সংরাধনে (সম্যক্ আরাধনায় পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হয়) প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্ (ইহা শ্রুতি ও স্মৃতি হইতে জানা যায়)—এই সূত্রে 'সংরাধন'-শব্দে সম্যক্ আরাধন বা সাক্ষাদ্ ভক্তিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। প্রত্যক্ষ অর্থাৎ শ্রুতি এবং অনুমান অর্থাৎ স্মৃতি এ বিষয়ে প্রমাণ (ভগবৎসন্দর্ভ ৭৮, ১০১)। কঠোপনিষৎ (২।১।১, ১।২।২৩), মুণ্ডকোপনিষৎ (৩।২।৩), মাধ্বভাষ্য (৩।৩।৫৩)-ধৃত্য মার্ঠরশ্রুতি প্রভৃতি শ্রুতিমন্ত্রে এবং শ্রীগীতায় (১।১।৫৪, ১।৮।৫৫) ইত্যাদিতে উক্তি হইয়াছে যে, ভক্তিসাধকের নিকটই ভগবত্তনু প্রকাশিত হন, ভক্তিই সাধককে ভগবদর্শন করাইয়া থাকেন, ভগবান্ ভক্তিবশ। অনন্য বা পরাভক্তিদ্বারাই ভগবানের যথার্থ স্বরূপ অবগত হওয়া যায়। অতএব ভক্তিই সর্বোত্তম অভিধেয় (সাধন) বা সম্যক্ আরাধন। সেই ভক্তি ভগবানের স্বরূপ-শক্তি হ্লাদিনীভূত আনন্দরূপাই। ইহার দ্বারাই ভগবান্ স্বরূপানন্দের অনুভব করেন এবং সেই আনন্দদ্বারাই বিশেষ আনন্দ-যুক্ত হ'ন। আবার সেই ভক্তিদ্বারাই ভগবান্ ভক্তগণকেও সেই আনন্দ অনুভব করাইয়া থাকেন। (প্রীতি-সঃ ৬৫ অঃ)

'সংরাধন'-শব্দের অর্থ যে ভক্তি, ইহা শ্রীশঙ্করাচার্য্য-পাদ, শ্রীভাস্করাচার্য্যপাদ, শ্রীরামানুজাচার্য্যপাদ, শ্রীনিম্বার্ক-চার্য্যপাদ, ও শ্রীবল্লাভাচার্য্যপাদাদি সকল আচার্য্যই স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সংরাধন

বা সম্যক্ আরাধনরূপা ভক্তিকে ‘হ্লাদিনী’ নাম্নী শ্রীভগবৎ-
 স্বরূপশক্ত্যানন্দারূপা বা ভগবৎপ্রেমবিলাস রূপা বলিয়া খ্যাপন
 করিয়াছেন। শ্রীলোকবিরাজ গোস্বামিপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতা-
 মৃতে—“রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয়-বিকার। স্বরূপশক্তি—
 ‘হ্লাদিনী’ নাম যাঁহার ॥ হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন
 হ্লাদিনীর দ্বারা করে ভক্তের পোষণ ॥ হ্লাদিনীর সার ‘প্রেম’,
 প্রেমসার ‘ভাব’। ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম ‘মহাভাব’ ॥
 মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধা-ঠাকুরাণী। সর্বগুণখনি কৃষ্ণকান্তা-
 শিরোমণি ॥ কৃষ্ণবাঞ্ছা-পূত্রিকরূপ করে আরাধনে। অতএব
 ‘রাধিকা’ নাম পুরাণে বাখানে ॥ অনস্মার্নাধিতো ন্যূনং
 ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ। যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো
 যামনয়দ্রহঃ ॥ (ভাঃ ১০।৩০।২৮) ॥ সুতরাং ব্রহ্মসূত্র
 ‘সংরাধন’ এবং তাঁহার অকৃত্রিমভাষ্যভূত শ্রীমদ্ভাগবত
 ‘আরাধন’-শব্দে স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীকেই প্রতিপাদন করিয়া-
 ছেন অর্থাৎ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ অধোক্ষজ বা অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব হইলেও
 তাঁহার স্বরূপশক্তি শ্রীরাধার কৃপাকটাক্ষম্নাত নিজ-জনের সেবা-
 সঙ্গ-ফলে প্রত্যক্ষীকৃত হ’ন; ইহা ঋক্‌পরিশিষ্ট, শ্রীগোপাল-
 তাপনী প্রভৃতি শ্রুতি এবং বৃহদ্‌গৌতমীয়, মৎস্যপুরাণ, শ্রীসনৎ-
 কুমার-সংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্র প্রমাণ হইতে জানা যায়। ব্রহ্ম-
 সূত্র ও তাহার স্বতঃসিদ্ধ ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীরাধার পরম-
 নিগূঢ়-রহস্যময় নাম ঐরূপ ইঙ্গিতেই উক্ত হইয়াছে।

ভক্তির নিত্যত্ব—আ প্রায়ণাত্ত্রাপি হি দৃষ্টম্ (ব্রঃসূঃ-
 ৪।১।২) আ প্রায়ণাৎ (মুক্তি পর্য্যন্ত) তত্রাপি (মুক্তিতেও)

হি (নিশ্চয়) দৃষ্টম্ (ভগত্বপাসনা দেখা যায়) । “সর্বদৈন-
মুপাসীত যাবমুক্তি, মুক্তা হ্যেনমুপাসতে” [মাধ্বভাষ্য (৪।১।১২)
ধৃত সৌপর্ণশ্রুতিমন্ত্র]—মুক্তি পর্য্যন্ত সর্বদা ভগবানের উপাসনা
করিবে ; যেহেতু মুক্তগণও তাঁহার উপাসনা করেন । “মুক্তা-
নামপি ভক্তর্হি নিত্যানন্দ-স্বরূপিণী” (শ্রীমহাভারত-তাৎপর্য্য-
[১।১০৬] ধৃত শ্রুতি) অর্থাৎ মুক্তগণেরও নিত্যানন্দরূপিণী
ভক্তি বিরাজমান ।। “যৎ সর্বদেবা আনমন্তি মুমুক্শ্বো ব্রহ্ম-
বাদিনশ্চ” (নৃঃ পুঃ তাঃ ২।৪।২৬) এই শ্রুতির ব্যাখ্যায় শ্রীশঙ্করা-
চার্য্যও বলিয়াছেন,—মুক্ত (সাযুজ্যমুক্তিপ্রাপ্ত) পুরুষগণও
সেচ্ছায় বিগ্রহ ধারণ করিয়া ভগবদ্ভজন করেন । মহাভারতে
উক্ত হইয়াছে,—“কৃষ্ণে মূর্ত্তৈরিজ্যতে বীতমোহৈঃ” অর্থাৎ—
মোহবিমুক্ত মুক্তগণও শ্রীকৃষ্ণের পূজা করেন । “ব্রহ্মভূতঃ
প্রসন্নাত্মা * * * * মদ্বক্তিং লভতে পরাম্” (গীতা ১৮।৫৪) এই
গীতাবাক্যেও ব্রহ্মভূত অর্থাৎ মুক্ত পুরুষকেই পরা ভক্তির
অধিকারী বলা হইয়াছে । বিষ্ণুপুরাণেও দৃষ্ট হয়, “পাতাললোক
শ্রীপ্রহ্লাদ ও শ্রীবলি-প্রমুখ মহাভগবতগণের নিবাসস্থান বলিয়া
বিমুক্ত পুরুষ মাত্রেই প্রিয় । (শ্রীভগবৎসন্দর্ভ ৭৮ অনু) । তস্ম
চ নিত্যত্বাৎ (ব্রঃ সূঃ ২।৪।১৭)—তস্ম (বেদসার বর্ণাঙ্ক নামের)
চ (ও) [নিত্যতা] নিত্যত্বাৎ (বর্ণসমূহ নিত্য বলিয়া)—বর্ণ-
সমূহ নিত্য বলিয়া বেদের সারস্বরূপ বর্ণাঙ্ক শ্রীকৃষ্ণাদি নামের
নিত্যতা সিদ্ধ হয় । বেদে (ঋক্‌সংহিতা (১।১৫৬।৩) ও
শ্রুতিতে (ছা ২।২৩।৩ ; মাণ্ডুক্য ১।১ ; গোপালতাপনী পৃঃ ৩০)
“শ্রীভগবন্নামের নিত্যত্ব” কথিত হইয়াছে । শ্রীকৃষ্ণাদি প্রসিদ্ধ

নামসমূহ নিখিল প্রমাণের অগোচর এবং বেদসমূহেরই আত্ম-
রূপে স্বতঃ সিদ্ধ। পরমেশ্বরের অন্ত্যন্ত অবতারের ন্যায় এই
শ্রীনাম ও তাঁহারই বর্ণরূপী অবতার—এই বিষয়টি সেই শ্রুতি-
বলেই অঙ্গীকৃত হইয়াছে; আর শ্রীভগবানের সহিত অভেদ-
হেতু সেইরূপ উক্তি সম্ভবপরই হয়। তাদৃশ ভগবন্নামাদি
কিরূপে পুরুষের ইন্দ্রিয়জ্ঞ হইতে পারে? তত্বত্তরে—
যেমন শ্রীভগবানের কৃপায়ই নিখিল বেদ পুরুষের ইন্দ্রিয়াদিতে
আবিভূত হ'ন; পরন্তু উহা পুরুষের ইন্দ্রিয় দ্বারা উৎপাদনের
যোগা নহেন, সেইরূপ শ্রীভগবৎকৃপায়ই সেবোন্মুখ জিহ্বাদিতে
শ্রীনাম স্বয়ং স্ফুর্তি প্রাপ্ত হ'ন। (শ্রীভগবৎসন্দর্ভ ৪৬)।

প্রয়োজন :—আবৃত্তিরসকৃত্যুপদেশাৎ (ত্রঃ সূঃ ৪।১।১)—
আবৃত্তিঃ (কীর্তন বা অনুশীলন) অসকৃৎ (বারংবার) [কর্তব্য],
উপদেশাৎ (শাস্ত্রের উপদেশপর বাক্য হইতে) [জানা যায়]।
শ্রীনামের আবৃত্তি-বা অনুশীলনই সাধন' ও 'সাধ্য'। নামাপরাধ
থাকাকালে শ্রীনামব্রহ্মের আবৃত্তির বিধান শাস্ত্রে যে উপদিষ্ট
হইয়াছে, তাহা শাস্ত্রপ্রমাণ হইতে জানা যায়। সিদ্ধপুরুষগণও
শ্রীনামব্রহ্মের আবৃত্তি করেন। ঐ আবৃত্তি প্রতিপদে সুখ-
বিশেষেরই উদয় করায়। আর অসিদ্ধগণের যে আবৃত্তির
নিয়ম, তাহা ফলপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত; অর্থাৎ অবিশ্রান্তভাবে নামের
আবৃত্তি করিতে করিতে যখন শ্রীনামের কৃপায় তাহাদের
অপরাধ দূর হয়, তখনই তাহাদের প্রয়োজন লাভ সম্ভব;
আবৃত্তির অভাব হইলে ফলপ্রাপ্তির বাধক অপরাধ থাকিতে
পারে।—“সিদ্ধানামাবৃত্তিস্তু প্রতিপদমেব সুখবিশেষোদয়ার্থা।

আসিদ্ধানামাবৃত্তিনিয়মঃ ফলপর্যাপ্তিপার্যাপ্তঃ ; তদন্তুরায়েহপরা-
ধাবাস্থিতি-বিতর্কাৎ ।” (ভক্তিসন্দর্ভ ১৫৩ অনু)

ফলাধ্যায়ের সর্বশেষ সূত্র—“অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ
শব্দাৎ” (ব্রঃ সূঃ ৪।৪।২২)—“অনাবৃত্তিঃ (অপ্রত্যাবর্তন) শব্দাৎ
(শ্রুতি প্রমাণানুসারে) [দৃঢ়তার জন্তু পুনরাবৃত্তি বা সমাপ্তিসূচক
পুনরাবৃত্তি] । “ন চ পুনরাবর্ত্ততে ন চ পুনরাবর্ত্ততে” [ছাঃ ৮।১৫।১]
“যদ্ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে শান্তাঃ সন্ন্যাসিনোহমলাঃ” ভাঃ ৭।৪।২২ “যদ্
গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম” (গীতা ১৫।৬) ইত্যাদি শাস্ত্র
প্রমাণ হইতে মুক্তপুরুষগণের কস্মাধীন জন্মের নিবৃত্তির প্রমাণ
পাওয়া যায় । কোন কোন স্থলে মুক্তপুরুষগণের যে পুনরাবৃত্তির
কথা শুনা যায়, তাহা প্রপঞ্চে ভগবদ্ধামসমূহের স্থিতি অপেক্ষায় বা
ভগবল্লীলা-কৌতূকের অপেক্ষায়ই জানিতে হইবে অর্থাৎ শ্রীমথুরা,
শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীদ্বারকা, শ্রীঅযোধ্যাদি যে সকল ভগবদ্ধাম এই
জগতে বিরাজমান আছেন, সেই সকল ধামে বিচরণ করিবার
জন্তু মুক্ত ভগবৎপরিকরণও কখনো কখনো পরব্যোমস্থিত
ভগবদ্ধাম হইতে অবতরণ এবং জয়-বিজয়ের জ্বায় কোন কোন
পরিকর ভগবল্লীলা-কৌতুক-সম্পাদনের জন্তু জগতে আগমন
করেন । তাহা হইলেও তাঁহারা চিরকাল প্রপঞ্চে অবস্থান করেন
না ; পরে নিত্যসালোক্য প্রাপ্ত হন । (প্রীতিসন্দর্ভ ১০ অনু)
এতৎ প্রসঙ্গে শ্রীজীব গোস্বামিপাদ শ্রীপ্রীতি সন্দর্ভে ১৩-১৬ অনু
বহু শাস্ত্র বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন । ছান্দোগ্যোপনিষদে
৭।২৫।২ মুক্তপুরুষের সকল লোকেই স্বাচ্ছন্দগতি এবং বৃহ-
দারণ্যকোপনিষদে (৪।৪।৬,২২) মুক্তপুরুষের যে পরমাত্মভাব

প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেই প্রসঙ্গ লইয়াই ব্রহ্মসূত্রে (৪।৪।১৭) উক্ত হইয়াছে যে, নিখিল চিদচিং সৃষ্টি-স্থিতি-নিয়মনরূপ জগদ্ব্যাপার একমাত্র ব্রহ্মেরই কার্য্য, এতদ্ব্যতীত সকল কার্য্যে মুক্ত জীবের কর্তৃত্ব সম্ভব। এই ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীমদ্ভাগবতের ১।৩।৪১ “অদৃষ্টাশ্চ তমং লোকে শীলৌদার্য্য-গুণৈঃ সমম্।”—শ্লোকের প্রমাণ হইতে জানা যায়, সৃষ্টিমুক্তি অর্থাৎ শ্রীভগবানের সমান ঐশ্বর্য্যের কথা যাহা বলা হইয়াছে, তাহা গৌণ অর্থাৎ সৃষ্টিমুক্তিতে অনিমাদি ঐশ্বর্য্যের আংশিক প্রাপ্তি হয়। সাক্ষ্যমুক্তিতেও কোন মুক্ত পুরুষই ভগবানের সমুদয় রূপ, চিহ্ন ও লক্ষণযুক্ত হইতে পারেন না। শ্রীবেংস, কৌস্তভ ও শ্রীভগবানের শ্রীকরচরণের অসাধারণ চিহ্ন-সকল একমাত্র শ্রীভগবানেরই নিজস্ব। সাযুজ্যমুক্তিতে ভগবানের স্বরূপভূত আনন্দে নিমগ্নতার স্ফুর্ভিত্তিই প্রধান। কেহ বলেন,—শ্রীভগবানের শক্তিলেশ-প্রাপ্তিদ্বারা মুক্তপুরুষ অপ্রাকৃত ভোগলেশানুভব করেন; কিন্তু সর্ব্বতোভাবে ভগবানের স্থায় ভোগ অনুভব করিতে পারেন না। সাযুজ্যমুক্তিতে সেবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের অভিপ্রেত নহে; এজন্য শ্রীমদ্ভাগবতে উহার স্পষ্ট উদাহরণ নাই। শিশুপাল ও দত্তবক্র সাযুজ্যমুক্তি পাইয়াছিলেন। সাযুজ্যমুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকেও স্বেচ্ছায় শ্রীভগবান্ লীলার জগ্ন নিজ শ্রীঅঙ্গ হইতে বাহিরে আনিয়া পুনরায় পার্শ্বদরূপে সংযোজিত করেন (ভাঃ ৭।১।৪৬। সালোক্যাদি পঞ্চবিধ মুক্তির মধ্যে সামীপ্যমুক্তিই শ্রেষ্ঠ; কারণ, তাহা বহিঃসাক্ষাৎকারময়। আর সেব্য-

সেবক-ভাবের অভাবহেতু সাযুজ্যমুক্তি নিকৃষ্ট, তথাপি ব্রহ্ম-কৈবল্য হইতে শ্রেষ্ঠ। ভক্তগণ—‘নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য-না লয়’। শ্রীকর্দমের সামীপ্যমুক্তি (ভাঃ ৩২৪।৪৩-৪৭), শ্রীগজেন্দ্রের সারূপ্যমুক্তি (ঐ ৮।৪।৬), জয়-বিজয়ের সালোক্য-মুক্তি (ঐ ৩।১৫।১৪), শ্রীদেবহূতির সাস্তি-মুক্তি (ঐ ৩।২৩।৬, ৭) ও শিশুপাল-দন্তুবক্রাদির সাযুজ্যমুক্তির (ভাঃ ৭।১।৪৬) কথা শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়। শ্রীপরীক্ষিতের ব্রহ্মকৈবল্যের পর ভগবৎপ্রাপ্তি হইয়াছিল (ভাঃ-১২।৬।৫-৭) ; শ্রীঅজামিলের (ভাঃ-৬।২।৪০-৪৪) এবং শ্রীভীষ্মের ব্রহ্মকৈবল্যের পর ক্রমভগবৎ-প্রাপ্তির রীতি-অনুসারে ভগবৎপ্রাপ্তি হইয়াছিল (ভাঃ ১।২। ৪৪ ৭।৭।৩৭) ।

সপ্তম ক্রম

স্ফোট শরণাগত ব্যাকুল ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রথমে অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্ররূপে সৃষ্টিত হইয়া সৃষ্টির পূর্বে প্রকাশিত হ’ন। সেই স্ফোট গায়ত্রীরূপে প্রকাশিত হইয়া ব্রহ্মাকে সৃষ্ট্যাদি কর্মে প্রয়োজিত করেন। ব্রহ্মা স্ফোট হইতেই সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করেন। ব্রহ্ম মন্ত্রাত্মক স্ফোটের আরাধনা করিলে স্ফোট কৃপাপূর্ব্বক নিজ পূর্ণস্বরূপ, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর, মায়া ইত্যাদি প্রদর্শন করিলেন। ব্রহ্মা আবার শ্রীনারদকে, শ্রীনারদ শ্রীব্যাসদেবকে উক্ত সকল বিষয় সঞ্চারিত করিয়া এজগতে ব্রহ্ম সম্প্রদায় বিস্তার করেন। এইরূপ শ্রীলক্ষ্মীদেবী, শ্রীকৃষ্ণদেবও চতুঃসন স্ফোটতত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া নিজ নিজ ধারায় প্রবাহিত করেন। স্ফোটের প্রকাশ বেদকল্প-বৃক্ষের বীজ,—‘প্রণব,’ অক্ষুর—‘গায়ত্রী’ এবং

ফল—‘চতুঃশ্লোকী’ ভাগবত । বিশ্বসৃষ্টির প্রাক্কালে তত্ত্বজিজ্ঞাসু শ্রীব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে চতুঃশ্লোকী ভাগবত প্রাপ্ত হন । শ্রীব্রহ্মা শ্রীনারদকে তাহা উপদেশ করেন এবং শ্রীনারদ এই চতুঃশ্লোকী শ্রীব্যাসদেবের নিকট কীর্তন করেন । এইভাবে আশ্রয়-পারম্পর্যে বিস্তার হয় । চতুঃশ্লোকীর প্রারম্ভে মূল বক্তব্য বিষয়ের মুখবন্ধরূপে দুইটি শ্লোক আছে । সুতরাং চতুঃশ্লোকী লইয়া সর্বশুদ্ধ ছয়টি শ্লোক । বেদোক্ত ‘সম্বন্ধ’, ‘অভিধেয়’ ও ‘প্রয়োজন’ তত্ত্ব আদি চতুঃশ্লোকী ভাগবতে দৃষ্ট হয় । ভূমিকা-স্বরূপ প্রথম শ্লোকটিতে শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিলেন,—তিনিই (শ্রীকৃষ্ণই) সম্বন্ধিতত্ত্ব, তাঁহার সম্বন্ধীয় জ্ঞান (যথার্থ নির্দ্ধারণ) এবং তাঁহার সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান (অনুভব বা সাক্ষাৎকার) সম্বন্ধ-তত্ত্বেরই অন্তর্ভুক্ত । আর যাহার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত জীবের সম্বন্ধ (সম্যক্ বন্ধন) স্থাপিত হয়, তাহাই ‘রহস্য’ অর্থাৎ প্রেমরূপ প্রয়োজন । রহস্যের যে অঙ্গ, তাহাই সাধনভক্তিরূপ ‘অভিধেয়’ তত্ত্ব । মুখবন্ধের দ্বিতীয় শ্লোকে শ্রীভগবান্ শ্রীব্রহ্মাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন যে, তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) কৃপায় সেই পরমগুহ্য জ্ঞান ব্রহ্মার চিত্তে ফুরিত হউক । তদ্বারা শ্রীভগবান্ যে পরিমাণ বিশিষ্ট (বিভূ, অণু বা মধ্যমাকৃতি), যে যে লক্ষণ (স্বরূপ ও তটস্থ)-যুক্ত এবং তাঁহার যে সমস্ত স্বরূপান্তরঙ্গ শ্যাম-চতুর্ভূজাদি রূপ, ভক্তবাৎসল্যাদি গুণ ও লীলাসমূহ নিত্য বিদ্যমান, তাহার উপলব্ধি হইবে ।

চতুঃশ্লোকীর প্রথম শ্লোকে বলিলেন,—সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র তিনিই ছিলেন ; তাঁহার বিজাতীয় সংস্বরূপ স্থূল জগৎ, অসৎ-

স্বরূপ সূক্ষ্ম জগৎ এবং স্থূল ও সূক্ষ্ম জগতের কারণরূপ প্রধান বা প্রকৃতি কিছুই ছিল না। ব্রহ্মার নিকট যে পরম মনোহর শ্রীবিগ্রহরূপে উপদেশ প্রদান করিতেছিলেন, তিনি সেই শ্রীমূর্তিতেই মহাপ্রলয়কালেও বর্তমান ছিলেন। ইহা শ্রীব্রহ্মাকে বলিলেন। ‘সৃষ্টির পূর্বে আমিই ছিলাম’— শ্রীভগবানের এই উক্তিতে শ্রীভগবান্ তাঁহার ধাম ও পরিকরাদির সহিত সৃষ্টির পূর্বেও ছিলেন—ইহা বুঝা যায়। সৃষ্টির পূর্বে সমস্ত মায়িক ব্রহ্মাণ্ড, প্রকৃতি ও পুরুষ সকলই শ্রীভগবানের লীন ছিল; তখন তাহাদের আর কোন পৃথক্ অস্তিত্ব ছিল না। সৃষ্টির পরেও বৈকুণ্ঠে ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহরূপে এবং অগ্ন্যাগ্ন ভগবদ্ধামে, তত্ত্বদ্ধামোপযোগী স্বরূপে, আর প্রাপঞ্চিক ব্রহ্মাণ্ডে অন্তর্যামিরূপে, কখনো কখনো বা মৎস্যাদি অবতাররূপে তিনি অবস্থান করেন।

চতুঃশ্লোকীর দ্বিতীয় শ্লোকে শ্রীভগবান্ তাঁহার নিজ-স্বরূপ ব্যতিরেকমুখে জানাইবার জন্ম মায়ার লক্ষণ বলিয়াছেন। তিনিই (শ্রীকৃষ্ণই), ‘অর্থ’ অর্থাৎ পরমার্থভূত বস্তু। সেই পরমার্থবস্তু ব্যতীত যাহার প্রতীতি হয় অর্থাৎ তাহার প্রতীতি (প্রতি + ই + তি = প্রতিগমন বা উন্মুখতা) না হইলেই যাহার প্রতীতি হয়, তাহাই তাঁহার ‘মায়া’। পরমাত্মার আশ্রয়-ব্যতীত মায়ার স্বতঃপ্রতীতি বা স্বতন্ত্র সত্তা নাই। ইহার দ্বারা মায়া যে পরমাত্মার আশ্রিত শক্তি এবং পরমাত্মার বাহিরেই মায়ার প্রতীতি হওয়ায় তাহা যে পরমাত্মার বহিরঙ্গ শক্তি, ইহা প্রমাণিত হইল। মায়ার দুইটী বৃত্তি—‘জীবমায়া’ ও ‘গুণমায়া’।

যে বৃত্তিটি বহিস্মুখ জীবের স্বরূপ-জ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাখে এবং মায়িক বস্তুতে জীবের আসক্তি করায়, তাহাই জীবমায়া ; আর ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিই গুণমায়া। জীবমায়াংশে মায়া—সৃষ্টির গৌণ 'নিমিত্ত'-কারণ এবং গুণমায়াংশে—সৃষ্টির গৌণ 'উপাদান'-কারণ। শ্রীভগবান্ 'সূর্য্যো'র দৃষ্টান্তের দ্বারা তাঁহার 'স্বরূপের', 'আভাসের' দ্বারা 'জীবমায়ার' এবং 'অন্ধকারের' দ্বারা 'গুণমায়া'র স্বরূপ ব্রহ্মাকে বুঝাইলেন।

চতুঃশ্লোকীর তৃতীয় শ্লোকে—শ্রীভগবান্ প্রেমের রহস্য বুঝাইলেন। 'মৃত্তিকা', জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ'—এই পঞ্চ-মহাভূতের দ্বারা প্রাণিগণের দেহ গঠিত। সুতরাং এই পঞ্চ-মহাভূত প্রাণিগণের দেহে অনুপ্রবিষ্ট। আবার উক্ত পঞ্চমহাভূত প্রাণিগণের দেহের বহির্দেশেও মৃত্তিকা, জল প্রভৃতিরূপে অবস্থিত বলিয়া প্রাণীর দেহে অপ্রবিষ্ট। শ্রীভগবান্ও প্রণত (ভক্ত) জনের অন্তরে ও বাহিরে সর্বদা স্ফূরিত হন। অবশ্য শ্রীভগবান্ অন্তর্যামিস্বরূপে সকল প্রাণীর মধ্যেই প্রবিষ্ট আছেন ; আবার নিজস্বরূপে স্বীয়ধামেও বিরাজমান আছেন। সুতরাং তিনি প্রাণিগণের বহির্ভাগেও আছেন। অত্র প্রাণীর মধ্যে শ্রীভগবান্ নির্লিপুভাবে অন্তর্যামিরূপে অবস্থান করেন, তথায় তিনি কেবল সাক্ষিস্বরূপে উদাসীন ; কিন্তু প্রণত জনের হৃদয়ে শ্রীভগবান্ ভক্তের প্রেমরস আশ্বাদন করিয়া স্বয়ং আনন্দিত হ'ন এবং স্বীয় স্বরূপ-শক্ত্যানন্দের দ্বারা ভক্তগণকেও আনন্দিত করেন। আবার প্রণত জনের বাহিরে যখন তিনি স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হ'ন, তখনও তিনি তাঁহাদের প্রেমরস আশ্বাদন করিবার জন্য

এবং স্বীয় সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য ভক্তকে আশ্বাদন করাইয়া তাঁহাকে আনন্দিত করিবার জন্যই সর্ব্বদা ব্যগ্র থাকেন। ইহাই প্রেমের স্বভাব। এই প্রেমভক্তিই—‘রহস্য’।

চতুঃশ্লোকীর চতুর্থ শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—বিধি ও নিষেধদ্বারা যাহা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিद्यমান থাকে, আমার তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছু ব্যক্তিগণ তাহাই শ্রীগুরুদেবের নিকট জিজ্ঞাসা করিবেন। উক্ত শ্লোকে শ্রীভগবান্ পরমরহস্য ভগবৎপ্রেমের অঙ্গ-স্বরূপ ক্রমলব্ধ ‘সাধন-ভক্তি’র উপদেশ করিয়াছেন। এই সাধনভক্তি প্রয়োজন-সাধক বলিয়া নিজেও ‘রহস্য’। এই সাধনভক্তি বা উপায়টিতে অহয় (বিধি) ও ব্যতিরেক (নিষেধ), অহ্ননিরপেক্ষতা, সার্ব্বত্রিকতা ও সদাতনত্ব সিদ্ধ রহিয়াছে বলিয়া ইহা অভীষ্টসিদ্ধির নিশ্চিত উপায়। ভক্তি—‘অহ্ননিরপেক্ষ’। কৰ্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি সাধন—ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ না করিলে অভীষ্ট ফললাভ করিতে পারে না; ইহা শ্রীগীতা শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রপ্রমাণ হইতে সুস্পষ্টভাবে জানা যায়। কিন্তু ভক্তি অহ্ননিরপেক্ষ হইয়া আভাসের দ্বারাই কৰ্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির প্রাপ্য যাবতীয় ফল অনায়াসেই প্রদান করিতে পারেন এবং স্বয়ং পরম ফল যে ‘প্রেমা’, তাহা দান করেন। ভক্তির ‘সার্ব্বত্রিকতা’ স্বতঃসিদ্ধ। সদাচারী ও ছুরাচারী, জ্ঞানী ও অজ্ঞানী, বিরক্ত ও আসক্ত, মুমুক্শু ও মুক্ত, সাধক ও সিদ্ধ, পার্শ্বদতাপ্রাপ্ত ও নিত্যপার্ষদ—সর্ব্বপাত্র-নিবিশেষে ভক্তির অধিষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়। মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, কীট-পতঙ্গ, পশু-পক্ষী প্রভৃতিও ভক্তি-

প্রভাবে উর্দ্ধগতি, এমন কি বৈকুণ্ঠগতি লাভ করিতে পারে। ভক্তি—সকল দেশে ও সকল অধিকারীতে এবং সকল সময়ে অনুষ্ঠিত হইতে পারে। ভক্তি—‘সদাতন’। কৰ্ম—সন্ন্যাস ও ভোগপ্রাপ্তি-পর্য্যন্ত, তাহার পরে নহে; যোগ—সিদ্ধি-পর্য্যন্ত এবং সাংখ্য—আত্মজ্ঞান-পর্য্যন্ত; তাহার পরে উহাদের প্রয়োজন নাই। জ্ঞান-সাধন—মুক্তিকাল-পর্য্যন্ত, সুতরাং উহারও নিত্যতানাই; কিন্তু ভগবদ্ভক্ত নিত্যসিদ্ধদেহে ভগবদ্ধামে নবনরায়মান বিচিত্রার সহিত ভক্তির নিত্যকাল অনুষ্ঠান করেন। সকল অবস্থায়ই ভক্তির যোগ্যতা, যথা—গর্ভে অবস্থানকালে প্রহ্লাদাদির, বাল্যকালে ধ্রুবাদির, যৌবনে অশ্বরীষাদির; বার্ককো যযাতি প্রভৃতির, দেহত্যাগকালে অজামিলাদির এবং স্বর্গ-গতাবস্থায় চিত্রকেতু প্রভৃতির ভক্তিতে অধিকার দেখা যায়। নৃসিংহপুরাণোক্তি হইতে নরকে অবস্থানকালেও হরিভজনে অধিকারের কথা জানা যায়।

সমগ্র ঋগ্বেদের সংক্ষেপ-স্বরূপ যে উহার প্রথম মন্ত্র, তাহার অর্থ চতুঃশ্লোকী ভাগবতের প্রথম শ্লোকে; সমগ্র যজুর্বেদের সংক্ষেপ স্বরূপ যে উহার প্রথম মন্ত্র তাহার অর্থ চতুঃশ্লোকী ভাগবতের দ্বিতীয় শ্লোকে; সমগ্র সামবেদের সংক্ষেপ-স্বরূপ যে উহার প্রথম মন্ত্র, তাহার অর্থ চতুঃশ্লোকী ভাগবতের চতুর্থ শ্লোকে, সমগ্র অথর্ববেদের সংক্ষেপস্বরূপ যে উহার প্রথম মন্ত্র, তাহার অর্থ চতুঃশ্লোকী ভাগবতের তৃতীয় শ্লোকে এবং চতুর্বেদের রহস্যভূত-মন্ত্র, শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের

পঞ্চমাধ্যায়স্থ ‘কৃষ্ণবর্ণং ত্রিষাংকৃষ্ণং’—এই পরম-রহস্যভূত শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

স্ফোটের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ স্বরূপ মহামন্ত্র ইজ্যা, ব্রত, অধ্যয়ন ইত্যাদি সমস্ত পারমার্থিক অনুশীলনের চালক। কলিযুগ পাবনাবতারী শ্রীগৌরহরি এই মহামন্ত্র উপদেশ করিয়াছেন। ইহা একাধারে কলিযুগের তারক ও পারক-ব্রহ্মনাম। শ্রীরূপগোন্ধামিপাদ-সঙ্কলিত শ্রীমথুরামাহাত্ম্যে ১১৭ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—“তারকাজ্জায়তে মুক্তিঃ প্রেম-ভক্তিঞ্চ পারকাং ॥” মায়াদেবী শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন,—“মুক্তি-হেতুক তারকব্রহ্ম হয় রামনাম। কৃষ্ণনাম পারক হঞা করে প্রেমদান ॥” (চৈঃ চঃ অঃ ৩২৫৫)। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব-প্রবর্তিত সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য কোথাও ‘হরে কৃষ্ণ’ ইত্যাদি ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরকে ‘মহামন্ত্র’ বলিয়া সর্বক্ষণ অনুশীলনের কথা নাই। শ্রীরামানুজ সম্প্রদায়ে “শ্রীমন্নারয়ণচরণৌ শরণং প্রপদ্যে”, “শ্রীমতে নারায়ণায়”—এই নাম সর্বক্ষণ কীর্তনীয় এবং অষ্টাক্ষর প্রণবপুটিত মন্ত্র ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিকের সময় তুলসীমালায় জপ্য। উক্ত সম্প্রদায়ের শ্রীরামানন্দি-শাখায় দীক্ষামন্ত্রই আহ্নিকের সময় জপ করা হয়। সর্বক্ষণ কীর্তনীয় কোন নির্দিষ্ট মন্ত্র নাই। তত্ত্ববাদিগণের মধ্যেও ঐরূপ বিচার। শ্রীবল্লভ-সম্প্রদায়ে “শ্রীকৃষ্ণ শরণং মম” বাক্যকে মহামন্ত্র বলা হয় এবং উহা তুলসীমালায় গোমুখীর (মালার থলের) মধ্যে জপ করা হয়। নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ে শ্রীকেশব কাশ্মীরীর প্রশিষ্য শ্রীহরিবাসদেবজীর সময় হইতে

গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের অমুকেরণে “রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধে রাধে । রাধেশ্যাম রাধেশ্যাম, শ্যাম শ্যাম রাধে রাধে ॥”—বাক্য মহামন্ত্ররূপে তুলসীমালায় জপ্য হইয়াছে ।

‘কলিসন্তারক’ বা ‘কলিসন্তরণ’-উপনিষদে,—উহাদের প্রারম্ভে “ওঁ শ্রীমদ্বিশ্বাধিষ্ঠান-পরমহংসগুরু-রামচন্দ্রায় নমঃ’ এবং উপসংহারেও ঐরূপ পদের সহিত ‘রামচন্দ্রায়ার্ণমস্ত’ বাক্য দৃষ্ট হয় । কোন কোন পুঁথির প্রারম্ভে শ্রীরামচন্দ্রের প্রণাম-সূচক শ্লোকও দৃষ্ট হয় । এতদ্ব্যতীত অযোধ্যাদি স্থানে শ্রীরামলীলার সংকীর্তনমণ্ডলী ও কুম্ভমেলায় সমবেত রামোপাসকগণ উক্ত কলিসন্তরণোপনিষদের ক্রমানুসারেই শূদ্রাদি জাতিনির্বিশেষে উক্ত নাম সংকীর্তন করেন । কোনও রামোপাসক ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের দ্বারা ঐ গ্রন্থ সঙ্কলিত বলিয়া অনুমান করা যায় ।

অষ্টম ক্রম

স্ফোটে শব্দ বিজ্ঞানঃ—সাক্ষর্ষণমূত্রে দুইটি মূত্র আছে, তাহার মূল কথা এই—১। শব্দ ও শব্দী ভিন্ন নহে । ২। শব্দমাত্রই শব্দী । অর্থাৎ শব্দমাত্রই বিষ্ণুবোধক । শব্দকে মাপা যাইবে না । যেখানে মাপা যায়, সেখানেই বহির্জগৎ, ইতরব্যোম—পরব্যোম নহে । আমাদের যাবতীয় প্রচেষ্টা ও প্রবৃত্তি কেবল বিষ্ণুর ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্তই যখন নিযুক্ত, তখনই তাহা সেবায় উন্মুখ ; আর যাহা অপরের নিকট হইতে সেবা আদায় করে—ধর্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষ-কামনার তৃপ্তির আকারে, তাহাই সেবার বিরোধী ব্যাপার বা নাস্তিকতা । এই নাস্তিকতা বলরূপিণী মূর্ত্তিতে উপস্থিত হইতে পারে

Altruism, Utilitarianism, Positivism, Pantheism ইত্যাদি নানা আকারে উপস্থিত হয়। এ সকল দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিতে হইবে। মহাপ্রভু বলিয়াছেন—“হরেনাঁম হরেনাঁম হরেনাঁমৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতির-
 গুথা ॥” হরিনাম গ্রহণ ছাড়া অন্য alternative আছে, ইহাই তর্কপথ। হরিনামের আর অন্য কোন প্রকার alter-
 native নাই। Alternative কল্পনা করিলেই এই পৃথিবীর চিন্তাস্রোত। হরিনাম-গ্রহণ কারিগণকে একটা Party মনে করিয়াছেন যাঁহারা, আর হরিনাম-শ্রবণ-কীর্ত্তনই একমাত্র পথ নহে যাঁহারা মনে করিতেছেন, তাঁহারা অপ্রাকৃতকে মাপিতে যাইতেছেন, তাঁহারা মাপার দল বা মায়ার দল—অভক্তসম্প্রদায়।

সর্ব্বাণ্ড্রে নাম জিনিষটা কি, তাহা জানা দরকার। শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন—“নিখিল-শ্রুতিমৌলিরত্নমালাছ্যাতি-
 নীরাজিত-পাদ-পঙ্কজাস্ত। অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্ত্রমানং পরিতস্ত্রাং
 হরিনাম সংশ্রয়ামি ॥” নাম একটা অচেতন পদার্থ নহেন। যেখানে নাম অচেতন পদার্থের বাচক হয়, নাম-নামী ভেদ হয়, সেখানে ‘হরিনাম’ সম্বন্ধে বলা হয় না। হরিনাম আভিধানিক শব্দ কিম্বা প্রাকৃত ব্যাকরণ-নিষ্পন্ন শব্দ ন’ন। অণ্ড যাবতীয় শব্দের উদ্দিষ্ট বস্তু স্বতন্ত্র,—শব্দ স্বতন্ত্র। ‘হরিনাম’ কথা বলতে পারেন। যিনি হরিনাম গ্রহণকারী, তিনি চেতনময় বস্তু। তিনি বলছেন,—“হে হরিনাম! আমি তোমার দাস, তোমার আনুগত্য স্বীকার করলাম।” যিনি হরিনাম করতে প্রবৃত্ত হ’ন, তিনি হরিনাম-প্রভুর ভৃত্য। জগতের শব্দমাত্রই হরিভিন্ন

অন্যবস্তুকে উদ্দেশ্য করে। যে-সমুদয় বস্তু জাগতিক শব্দ-দ্বারা উদ্দিষ্ট হ'য়েছে, তা' অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আলোচিত হ'য়ে তা'দের সম্বন্ধে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতার মোট তাৎপর্য্য মনদ্বারা গৃহীত হচ্ছে। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিও স্বতন্ত্র। শব্দ জিহ্বা-দ্বারা উচ্চারিত এবং কর্ণদ্বারা শ্রুত হয়। কিন্তু জিহ্বা-দ্বারা উহা আশ্বাদনীয় নয়, ত্বকের দ্বারা উহা স্পর্শ করা যায় না। শব্দ কেবল কর্ণে ইন্দ্রিয়েরই গ্রাহ্য। হরিনাম ঐরূপ শব্দের সহিত সমান ন'ন। অন্য শব্দ কর্ণে প্রবিষ্ট হওয়া মাত্র অন্য চারিটি ইন্দ্রিয় তৎসম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হয়। শব্দ শব্দীকে লক্ষ্য করে। জাগতিক শব্দের শব্দী বহির্জগতের কোন বস্তু—যা' ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য। শব্দ কাণে গিয়া অন্য ইন্দ্রিয়দিগকে বলে যে, তোমরা বুঝে নেও—বস্তুটি কি। সসীম জিনিষের যেমন একটা সংজ্ঞা আছে, সেইরূপ যা' সীমাবদ্ধ নয়, তা'রও একটা সংজ্ঞা আমরা ব্যতিরেকভাবে করতে পারি। সীমাবিশিষ্ট বস্তু সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়দিগের মেপে নেওয়া একটা কার্য্য উপস্থিত হয়। যা'র সীমা নেই চেষ্টা ক'রেও আমরা তা'র কোন কিনারা পাই না। এইরূপ ব্যাপারকে অসীম (infenity) ব'লে একটা শব্দ দ্বারা লক্ষ্য করি। যদি শব্দ-দ্বারা জ্ঞাতব্য বস্তু সীমাবিশিষ্ট হয়, তা' হ'লে সেই বস্তুকে জানবার জন্য বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গুলিকে নিযুক্ত করি। হরি বস্তু সীমাবিশিষ্ট ন'ন। তিনি সীমাবিশিষ্ট বস্তুর সীমাকে হরণ করেন। অসীমকে যখন তিনি হরণ করেন, তখন তিনি সীমাবিশিষ্ট। সসীম বস্তু কখনও অসীম নহে। দেশ সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছে। সীমাবিশিষ্ট ব্যাপারে যে

অবরতা আছে, হরিতে তা' আরোপ করতে হ'বে না। অসীম বস্তুর অভ্যন্তরে 'সীমা' ব'লে একটা ব্যাপার আছে; কিন্তু সসীম এবং অসীম শব্দ হরিতে যুগপৎ প্রযুক্ত হ'তে পারে। সমস্ত জিনিষ যিনি নিয়ে নেন, তিনিই সেই হরি।

সূর্য্যকে 'কপিঃ' (কং জলং পিৰতি ইতি কপিঃ) বলা হয়, যেহেতু তিনি জলকে টেনে নেন। হরি শুধু জল টেনে নেন না; জড় জগতের যত বস্তু আছে—ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম—সব তিনি হরণ করতে—আকর্ষণ করতে পারেন। 'অভাব' ও 'ভাব'-যুক্ত উভয়বিধ জিনিষকে তিনি হরণ, আকর্ষণ করেন। হরণ-কার্যের নির্বিবশেষ বিচার গ্রহণ করতে হ'বে না। সবিশেষ আকর্ষণ বিচারে হরিকে 'বিষ্ণু' বলা হয়। বর্তমানতা ও অবর্তমানতা উভয়কেই তাঁর হরণ করবার ক্ষমতা আছে। 'বিষ্ণু' ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হ'ন। আমরা এই হরিকে না বুঝতে পেরে অশ্রুতরূপে অনেক কথা বলি—হরিকে নির্বিবকার, নিরাকার বলি। চক্ষু ইন্দ্রিয় অসীম বস্তুকে গ্রহণ করতে সমর্থ নহে। চক্ষু ইন্দ্রিয়ের যা' অগ্রাহ্য, এরূপ অসীম আকারবিশিষ্ট বস্তুকে আমরা নিরাকার বলি। কিন্তু আকাশকে অসীম বললে অসীম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হ'য়ে যায়—সসীমের অন্তর্গত হ'য়ে যায়—সসীমের গুণফল (multiple of something definite) বিচার হ'য়ে যায়—চক্ষুর দৃষ্টিশক্তির সীমাটা তখন পরিমাপক হয়। বিকারশীল জগতে আমরা নির্বিবকার বস্তু দেখি না; নেতি নেতি ক'রে মনে ক'রি,—নির্বিবকার। আমার ধারণার বাহিরের বস্তু নির্দেশ করতে গিয়ে

ধারণার মধ্যের বস্তুকে লোপ (Rub out) করি। দৃশ্য বিষয় (Phenomena) কে একরূপভাবে বিদায় করলে দৃশ্য বিষয়েরই অপরদিক আমাদের উদ্দিষ্ট বস্তু হয়।

জড়বৈজ্ঞানিকগণ বিচার করতে পারেন যে, তাঁরা সব বুঝে নিয়েছেন। তাঁ'রা যা' বুঝতে পেরেছেন, তা' 'ঈশ্বর' শব্দ বাচ্য হ'বে না—সে-সব 'বান্দা' হ'য়ে যায়। একরূপ মনে করাটাও থাকে না। এই সমুদয় শব্দ অর্থাৎ নিরাকার, নির্বিকার, ব্যক্তিহীন ইত্যাদি শব্দগুলি ব্যবহার দ্বারা ভগবানের ব্যক্তিত্ব অপলাপ করা হয়। আমার বশীভূত যা' নয়, তাঁ'কে উদ্দেশ্য ক'রে একটা শব্দ প্রয়োগ করা হয় মাত্র—যে শব্দটা জিনিষ থেকে আসু'ছে না। ইহ জগতের জিনিষকে ছেড়ে দিয়ে তা'র অভাব-বোধক অণু জিনিষকে যে শব্দ-দ্বারা লক্ষ্য করি, আমরা সে শব্দকে 'বড়' ব'লে মনে করি। কিন্তু সে শব্দটা পূর্ণ অদ্বয়বস্তুর একটি আংশিক প্রতীতি মাত্র। Undefined Portion of the angle কে যেমন Complementary, Supplementary angle ব'লে। অর্ধেক কথা নিয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা; অপর অর্ধেকের কথা আমরা জানি না। আমরা দেখি—ইন্দ্রিয়গুলো দেখে—বৃত্তার্দ্ধ (hemisphere), বৃত্তের অন্য অর্দ্ধ (other moiety) সর্বদা অস্বীকৃত হচ্ছে। দেশের সম্বন্ধে এইসব কথা হচ্ছে।

আবার কালের সম্বন্ধে ইতিহাসে অনেক কথা লেখা আছে। সূর্যের ভ্রমণ, গ্রহ-নক্ষত্রাদির ভ্রমণ, জাগতিক সমুদয় ব্যাপারের ঘটনাকাল ইত্যাদি কালবিচারের অন্তর্গত। এই কালের

রাজ্যের বিচার বাদ দিয়ে কালাতীত রাজ্যের বিষয়কে 'মহাকাল' ইত্যাদি শব্দদ্বারা অভিহিত করি। মহাকাল কালের অব্যবহিত অভিজ্ঞান (Uninterrupted Cognesance of time)। তিন বৎসর, সাড়ে তিন বৎসর ইত্যাদি খণ্ডকালকে লক্ষ্য করে। অন্য অংশকে বাদ দিয়ে একটা অংশ বলা হয়। খণ্ডকালকে হরণ করেন ব'লে তাঁকে মহাকাল বলা হয়। মহাকালকে হরণ করেন ব'লে তাঁকে খণ্ডকাল বলা যায়। তিনি খণ্ডকালের মধ্যে তাঁ'র অন্তর্গতরূপে আসতে পারেন না, ইহা সর্বব্যাপকত্ব কথা হ'তে পারে না। তিনি কাল মহাকাল—উভয়কেই হরণ করেন।

পাত্র সম্বন্ধে বিচার দেখা যায় যে, পাত্র-দ্বারা বিশিষ্ট জিনিষকে (individuality) বুঝার—যা' কাল এবং দেশ জাতীয় ব্যাপারকে (in corporates the factors of time and space) অন্তর্ভুক্ত করে। খণ্ডিত পাত্র—যেমন কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি (individual), অর্থাৎ খণ্ডকাল এবং খণ্ডদেশ অবকাশকে ঢেকে রেখে যে মানুষটা হয়, তা'কে ব্যক্তিবিশেষ ব'লে অভিহিত করি। অন্য মানুষ—বর্তমানের এবং ভবিষ্যতের মানুষ অন্তর্ভুক্ত করে' 'বিরাত' কল্পনা করা হয়। 'এক' পাত্র বিভিন্ন হ'য়ে বহু' পাত্র। যেমন এক গ্লাস জলে আলোক প্রতিফলিত হ'য়েছে—এক হাজার গ্লাসে প্রতিফলিত হ'য়েছে—সমান্তর আয়নাতে প্রতিফলিত হ'য়েছে। একটা জিনিষই বহু হয়েছে। জিনিষটার বহু হয় নাই—তা'র সাদৃশ্য বহু হ'য়েছে। তা'তে জিনিষটার একত্ব বিনিষ্ট হয় না। বিশিষ্ট

অবকাশের (Particular Span) মধ্যে বিষ্ণুর বিগ্রহের (Figure) অধিষ্ঠান হ'তে পারে। বহির্জগতের দৃশ্য বস্তুর সঙ্গে ভুলক্রমে সাম্য বিচার করতে হ'বে না। তিনি তদপেক্ষা অধিকতর শক্তিবিশিষ্ট। তিনি জগতের সমস্ত ব্যক্তির সমুদয় যুক্তিকে নিরাস ক'রে বিরাজ করতে পারেন। তিনি পাত্রকে হরণ করতে পারেন, নিত্যকাল আত্মবৃত্তিতে রেখে দিতে পারেন। অল্পকাল স্থায়ী বিমুখ মানব-জীবনকে হরণ ক'রে নিত্য আত্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। তিনি যে কেবল সসীম জিনিষকেই হরণ করতে পারেন, এমন নয়।

সমস্ত শব্দ—হরি। হরি ব্যতীত অণ্ড কোন শব্দ নাই। 'হরি' শব্দে হরণ করা ধর্ম আছে। যে হরি শব্দে হরণ ধর্ম নাই, তা' হরি নহে। যেমন আভিধানিক অর্থবাচক ঘোড়া ইত্যাদি শব্দ। অনেকে রূপক, ঐতিহাসিক, আধ্যাত্মিক ইত্যাদি অর্থ বুঝতে চায়। 'হরি' যেটুকুমাত্র পাত্রত্ব নহেন। হরিতে যুগপৎ ব্যক্তিত্ব ও অ-ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য আছে। তথাকথিত যুক্তিমার্গ-বিচার-দ্বারা নানারকমের সে-সমুদয় শব্দ উপস্থিত হ'য়েছে, 'হরি' শব্দে সে-সমুদয় শব্দ অপেক্ষা বিশেষত্ব আছে। সেই হরিশব্দ যখন কাণে প্রবেশ করেন তা'র এতটা শক্তি আছে যে, তখন তা' অণ্ড সকল প্রকার অভিজ্ঞান দূর করে দেন। শব্দ যখন পূর্ণতাকে উদ্দেশ্য করে, তখন ক্ষুদ্রত্বকে বুঝায় না—এরূপ নহে। 'ব্রহ্ম' শব্দ ক্ষুদ্রত্বকে রক্ষা করে না। অতি বৃহত্বকে মাত্র লক্ষ্য করে। শব্দ যখন কেবল অতি বৃহত্বকে লক্ষ্য করে, তখন মানুষের ইন্দ্রিয়

নিষ্ক্রিয় (benumbed) হ'য়ে যায়। ঐ শব্দটা এতটা অধিক শক্তি দেখায় যে, মানুষের সব অভিজ্ঞতা নিস্তব্ধ ক'রে দেয়। ইহা শব্দের বিদ্বদ্ভাটিবৃত্তির পূর্ণ পরিচয় নহে। আবৃতবিশেষ-পরিচয় পূর্ণতাকে লক্ষ্য করে না। অগ্নি বস্তু হ'তে পৃথক্ ক'রে ৭ চার বলা হ'ল—১, ২, ৩ এবং ৫, ৭ ইত্যাদিকে বাদ দেওয়া হ'ল। শব্দের স্থিতি-স্থাপকতামাত্র লক্ষ্য করা হচ্ছে, যেখানে-সেখানে 'বৈকুণ্ঠ' শব্দ হ'ল না—হরিজ্ঞাপক হ'ল না। আমরা মেপে নেওয়ার মধ্যে প'ড়ে গেলাম।

হরিই—নাম। কর্মধারয় সমাস “হরিশ্চেতি নামচাসৌ”। হে হরি নাম! তোমাকে আমি সম্পূর্ণরূপে আশ্রয় করলাম—অগ্নি সব ছাড়লাম। 'হরি' শব্দকে আশ্রয় করলাম। মুক্তকুল—যাঁরা মুক্তিলাত ক'রেছেন, তাঁরা উপাসনা করছেন—ইহ জগতে যাঁদের আর কোন কৃত্য নাই, তাঁহারা শ্রীহরি নাম করেন। 'হরি নাম' অচেতন কিম্বা কল্পিত পদার্থ ন'ন—দৃশ্যপদার্থবিশেষ ন'ন—দৃশ্য-জগতের কোন বস্তু ন'ন। আমরা হরি নামকে সম্যগ্রূপে আশ্রয় করব, আর কারো কাছে যা'ব না। বৈকুণ্ঠ-বস্তুকে সম্যগ্রূপে আশ্রয় করব। তোমাকেই—হরি শব্দকেই আশ্রয় করব। নাম-নামীর মধ্যে প্রভেদ নাই; নামই—নামী—সেই জিনিষটিই। সেই তোমাকেই আশ্রয় করলাম।

যে-সমুদয় বৈকুণ্ঠ শব্দ বিদ্বদ্ভাটিতে প্রকাশিত হ'য়েছে, হরি নাম তৎসমুদয় শাস্ত্রকে অঙ্গীভূত করেছেন। যদি কোন ঋষ্টধর্মাবলম্বী বলেন যে, তাঁর শাস্ত্র পৃথক্, 'নিখিল'-শব্দ-দ্বারা তাঁর সম্ভাবনা নিরস্ত হ'য়েছে। যে-সব শাস্ত্র ইহ জগতে

অবতরণ করেছেন—যেগুলি আসেন নাই—খণ্ডকালের মধ্যে অবতরণ করবেন না, যে-সমুদয় শব্দশাস্ত্র হরিনামকে উদ্দেশ্য করেছেন। তাঁদের শীর্ষভাগসমূহের রত্নমালা—‘রত্ন’ যা’ হ’তে আলোক উচ্ছুরিত হচ্ছে—হরিনামের ‘নিরাজন’—আরতি করছে। শ্রীবিগ্রহকে শীতল জলে ধুয়ে দেওয়া—স্নান করিয়ে দেওয়া হ’ল—আচমনীয় দেওয়া হ’ল। পা’টা ধুয়ে দেওয়া হ’ল। ঐ যে ঠাণ্ডা জলটা লাগল, উহাতে নাতিশীতোষ্ণ ভাবটা আনবার জন্য অল্প গরম সেক্ দেওয়া হ’ল। এর নাম নীরাজন। ‘পা’—হরি নামের পাদপদ্ম। তাঁ’র অন্তপ্রদেশ নিরাজিত হচ্ছে। কোনো কর্দমাদি মলিনতা এসে কলঙ্কিত না করতে পারে। ধুয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই হরিনামকে আশ্রয় করতে হবে, ইহা আচার্য্যের উপদেশ।

আর যে হরিনাম নিজের কোন সুবিধা ক’রে দিচ্ছে, সে হরিনাম বদ্ধজীবের একটা জাগতিক চেষ্টা-মাত্র। হয়ত’ কেউ বলেন,—“আমি বাঙ্গালী, বাংলাদেশের লোক, আমার হরিনাম।” আবার সেইরূপ অপরে বলছে,—“আমি অন্য দেশবাসী, আমার জন্য অন্য শব্দ।” এইরূপ বিচার অবলম্বন ক’রে জাতিগত, দেশগত ধর্ম-দ্বারা ভিন্ন জাতি, ভিন্ন-দেশের ধর্ম হ’তে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা আমাদের আবশ্যকীয় বিষয় নহে। সে রকম শব্দ প্রেমাভাব উৎপন্ন করে। সেরূপ-ভাবে নামের ভজন হ’তে পারে না। নামভজন ছাড়া দ্বিতীয় পন্থা হ’তে পারে না। ‘মুক্ত জীবের উপাস্ত্র’ অর্থে—বদ্ধজীবের ধারণা সুবিস্তার হ’য়েছে সেখানে পৌঁছুক, এরূপ কথা বলা

হচ্ছে। বৈকুণ্ঠ নামে রুচি হোক। অবৈকুণ্ঠ নামে রুচি হোক, একথা বলা হচ্ছে না। যে হরিকীর্তন-দ্বারা কলেরা, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি ভাল হ'বে, সে হরিনাম করতে হ'বে না। হরিনামের দ্বারা কলেরা ভাল করতে গেলে, হরিকে চাকর ক'রে ফেলা হয়—সে কথা আছে—ভিন্ন ভিন্ন অপেক্ষায়ুক্ত অবস্থায় আছে—থাকুক। তদপেক্ষা উচ্চ কথাটা শোনা যাক। সত্য কথা অন্য কিছুর অপেক্ষা করে না, যা' শুনলে লক্ষ লক্ষ লোক ক্ষেপে যা'বে। বৈকুণ্ঠে একটা সিংহ একটা মানুষকে খেয়ে ফেললে। মায়িক জগতে ইহা প্রবল হুঁদৈব; কিন্তু বৈকুণ্ঠে সেরূপ অসুবিধা হয় না। এ জগতে কর্মফলে একজনের প্রার্থনা এক প্রকার, আর এক জনের প্রার্থনা অন্য প্রকার হ'য়ে পড়ে; কিন্তু নিত্যজগতে সেবাই নিত্যকর্ম। স্বল্পদৃষ্টি হ'তে ফলটা সঙ্গে সঙ্গে পা'বে, এরূপ ইচ্ছা ভোগপর কর্মবাদীর। তাই ব'লে 'বৈকুণ্ঠ' শব্দের সত্যকথাটা উড়িয়ে দেবো—এরূপ বিচার সঙ্গত নহে। এই দেহটা কতদিন থাকবে? দেহে ফল পাবে মনে করতে পারা যায়। কিন্তু উহা অবিবেচনা, সুশিক্ষার অভাব, বিচার করতে হ'বে। এইগুলো নিয়ে যদি থাকা যায়, তা'হ'লে যা'দের এসব অভাব থেমে গেছে, তাঁ'দের কথা শোনা হয় না। তাঁ'দের কথাটা শুনতে হ'বে। নিজের সুবিধা ব'লে যে জিনিষটা, তা' এসব কথা নয়। নিজে যখন বুঝা যাইবে তখন যা' সঙ্গত তাহাই করিতে হইবে। শ্রবণ ক'রে যতদিন না নিত্য-সত্যে রুচি হয়, ততদিন বৈকুণ্ঠনাম শ্রবণ করতে হ'বে।

বন্ধাবস্থায় বুঝা যাইবে না। নেশার বশে থাকলে রুচি হ'বে না। অনর্থযুক্ত অবস্থায় উন্মাদের বিচার বাঞ্ছনীয় নহে। সে বিচার কতক্ষণ স্থায়িত্ব হ'বে? তা ছাড়া বাদবাকী বিচার ও খানিকক্ষণ পরে আপনিই ছেড়ে দিতে হ'বে। অপরিবর্তনীয় ব্যাপারের সঙ্গে পরিবর্তনীয় ব্যাপার এক করিতে হইবে না। তা' করলে বুঝতে হ'বে যে, চৈতন্যচরিতামৃতের 'অ' আ'র মধ্যে প্রবেশ হয় নাই। এ ভাষা ত' এখনও এদেশে আসে নাই। কিন্তু এই কথাটাই সত্য। যখন Realise করতে পারবেন তখন বুঝতে পারবেন—জন্ম-জন্মান্তরে বুঝবেন। ভগবান্ কেবলই বঞ্চিত ক'রে রাখবেন, একরূপ নয়। গাছের ফল নয় যে, আস্লেন আর পেড়ে নিয়ে গেলেন; জন্ম-জন্মান্তরের কত সংস্কার, কত কথা সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছেন। সে-সব না কেটে গেলে গুণতে পাবেন কেমন ক'রে? মহাপ্রভু যা'কে-তা'কে দিলেন। যদি মনে করেন, যা'কে-তা'কে দিয়ে গেছেন, আমি তা'র থেকে একটু ভাল, তা' হ'লে পাবেন না। মহাপ্রভু যা'কে দিলেন, তা'কে উহা গ্রহণের জন্ম আগে শক্তিসঞ্চারণ করলেন। মহাপ্রভু যখন যা'কে দয়া করেন, তখন সে দয়াটা এসে পড়লে সুবিধা হয়। কিন্তু দয়ার প্রয়োজন নাই—একরূপ যতক্ষণ মনে থাকে, ততক্ষণ দয়াটা এসে পড়লেও ধরতে পারা যায় না। বি, এ, ক্লাসের পাঠ্য পাঠশালার ছাত্রকে কখনই বুঝিয়ে দেওয়া যায় না।

স্ফোটের রূপান্তর চেতন-ধর্মের পূর্ণ অভিব্যক্তি—স্ফোট স্ফুটিত হইয়া যখন নামরূপে গুরুমুখ হইতে

অনুগত শিষ্যের চিৎকর্ণে ভগবৎকীর্তন-রূপে প্রবিষ্ট হইবে তখন চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ভ্রুকু, মন, বাকু, পাণি প্রভৃতি সকল ইন্দ্রিয়গুলিই সংশোধিত, সংযমিত ও সৎপথে চালিত হইবে। চেতনময় কীর্তন কর্ণে প্রবিষ্ট হইলে বহির্দর্শন ও জড়হস্তের স্পর্শ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া পূর্ণবস্তুর দর্শনলাভ হইবে। ভগবদ্বস্তুর দর্শন, আরাধনা প্রয়োজনীয়। কিন্তু বর্তমানে ভগবদ্বস্তুর দর্শন হইতেছে না। বহির্জগতের দর্শন 'ভগবদ্দর্শন' নয়। ভগবান্ প্রকাশিত হইলে প্রকাশ-বাধ ইন্দ্রিয়সকল আর বাধা প্রদান করিতে পারে না। সেই বাধা একমাত্র শ্রবণের দ্বারাই ফোটার স্মরণ শক্তির প্রবেশে অপসারিত হইতে পারে। শ্রবণফলে জীব ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণ ও ভগবৎকৃপালাভের অধিকারী হয়,—ফোটার মহা-আকর্ষণী শক্তিপ্রভাবে। “যমেবৈষ বৃনুতে তেন লভ্যঃ।” এজন্য শ্রীগৌরসুন্দর জড়জগতে জীবের বর্তমান অনুভূতিতে সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নস্তরে অবস্থানের উপদেশ দিয়েছেন এবং অভাব, অসুবিধা, বিপত্তিতে সর্ব্বতোভাবে সহিষ্ণুতার আবশ্যকতা জানিয়েছেন। বাহিরের উপদেশ ব্যতীত অন্তরের সংযম-জন্য—‘অমানী ও মানদ’ হইয়া অনুক্ষণ হরিকথা কীর্তন করিবারই আদেশ দিয়াছেন। হরিকীর্তন ও বিশ্বের কথা কীর্তনের মধ্যে পার্থক্য আছে। বিশ্বকথা-কীর্তন অনিত্য। কিন্তু হরিকীর্তন এবং তাঁহার কীর্তনীয় বস্তু উভয়ই নিত্য। সেই কীর্তনে স্বতঃই ইন্দ্রিয়সমূহ সংযমিত ও নিয়মিত হয়। এই সকল কথা আলোচনার নামই হরিকথা আলোচনা। যাঁহারা এই হরিকথার আলোচনাকে প্রাধান্য ও মুখ্যতার

আসনে স্থান দেন, তাঁহাদের ক্রিয়া কলাপ পরমারাধ্য ব্যাপার। এইরূপ বিচার যাঁহাদের মধ্যে সর্বদা দেদীপ্যমান, তাঁহারা ই বরণে। সেইরকম ভগবন্তের পূজার দ্বারা ই পূজা বস্তুর পূজার পূর্ণতা সাধিত হয়। কেবল ভগবানের পূজায় পূর্ণতা সাধিত হয় না। তাহাতে বাকী থেঁকে যায়। ভগবন্তের পূজায়ই ভগবানের পূজার পূর্ণতা সাধিত হয়। কারণ ফোটের শক্তি জীবের প্রতি তাঁহাদের কুপায়ই সঞ্চারিত হইলে তবে জীব ভগবন্তত উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয়। এবং তাঁহাদের কুপার প্রকাশই সর্বত্র দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিয়া মনে করেন,—“সকলেই ভগবানের সেবা করিতেছেন, আমিই কেবল ভগবানের সেবা করিলাম না। আমা অপেক্ষা ছোট আর কেহ নাই।

কৃষ্ণকে অনেকে ‘ঐতিহাসিক’, ‘রূপক’ প্রভৃতি মনে করেন। কিন্তু কৃষ্ণ ঐতিহ্যসম্পাদিত কোন বস্তু কিংবা কাল্পনিক রূপক পদার্থের সঙ্গে সমতা-প্রদর্শনের জন্ম আবির্ভূত হন না। কৃষ্ণ অখিলরসামুদ্রমূর্তি। কৃষ্ণপাদপদ্মে সকল রসেরই কথা পূর্ণভাবে বিরাজিত। অনেক সময় বিশ্ব হইতে গৃহীত বিচারে বাসুদেবকেই পরতত্ত্ব বলিয়া বিচার করা হয়। বাসুদেবের সহিত মহালক্ষ্মীর, সীতা-রাম প্রভৃতির উপাসনার কথাও প্রচারিত আছে। কিন্তু শ্রীরাধাগোবিন্দের উপাসনা ব্যতীত রসের পরিপূর্ণতা কোথাও পাওয়া যায় না। শাস্ত্র, দাস্ত্র এবং গৌরবসখ্যার্কের দ্বারা ভগবানের উপাসনা অপেক্ষা যেখানে নিকট-সম্বন্ধে বিশ্রস্তাবস্থায় ব্রজবালকগণ সর্ব্বারাধ্য বস্তু কৃষ্ণের

স্বল্পে পদবিক্ষেপ করেন, তালগাছ হইতে তাল সংগ্রহ করেন এবং সেই তালের উচ্ছিষ্টানুচ্ছিষ্ট কৃষ্ণকে প্রীতিভরে প্রদান করেন, সেইরকম প্রীতিময়ী চেষ্টাই অধিকতর সেবাময়ী। কেহ কেহ আরাধ্য বস্তুকে মাতৃপিতৃরূপে বিচার করিয়া থাকেন। কিন্তু মাতাপিতার নিকট আমরা দ্রব্যাদি আকাজক্ষা করি, আমাদের নিরুপায় অবস্থায় তাঁহারা আমাদের সেবা করিয়া থাকেন, আমরা তাঁহাদিগকে আমাদের পূজনীয় বলিলেও এবং আমাদের চেষ্টাই সেবক বলিলেও কার্যতঃ তাঁহাদিগের দ্বারা আমাদের অধিকতর সেবা করা হয় থাকি। আমাদের জন্মের পূর্ব হইতে, জন্মের পরে শৈশব, বাল্য, ঐকেশোর, পৌগণ্ড, যৌবনাদি অবস্থায়ও নানাভাবে পিতামাতার দ্বারাই সেবা করা হয় থাকি। কিন্তু ভগবানের পুত্রত্ব-বিচারে মাতাপিতা নিত্যকাল ভগবানের বিশ্রান্তসেবা করিতে পারেন। মাতাপিতা পুত্রের জন্মাবার পূর্ব হইতেই এবং পরমুহূর্ত্ত হইতেই পুত্রের সেবা করিতে পারেন। ভগবানের পিতৃত্ব-বিচারে সেরূপ সৌন্দর্য্য ও রসমাধুর্য্য নাই।

আবার গোপীগণ সর্ব্বাঙ্গ দিবে সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণানু-শীলনের যে আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে সকল রসের যুগবৎ পূর্ণাবস্থান প্রকটিত হইয়াছে। যখন বিরহবিধুরা গোপলননাসকল কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণকে দেখিতে পাইয়াছিলেন, তখন বলিয়াছিলেন যে, তাঁহারা অগাধবোধ যোগিগণের শ্রায় ধ্যান করিয়া কৃষ্ণকে দূর হইতে দর্শন করিতে চান না। দূরের জিনিষকেই লোকে ধ্যান করে। যে জিনিষ একমাত্র

গোপীর নিজস্ব—করায়ত্ত—সহজ—সুলভ, সে জিনিষের ধ্যান তাঁহারা কেন করিবেন? গোপীসকল গৃহ ত্যাগ করিয়া কঠোর বৈরাগ্য তপস্বাদি দ্বারাও তাঁহারা ভজন করিতে চান না। তাঁহারা কৃষ্ণ-গৃহব্রতা। কৃষ্ণকে নিয়ে তাঁহাদের সংসার। তাঁহারা সৰ্ব্বাঙ্গ দিয়ে কান্ত কৃষ্ণের ভজনা করেন। এই সৰ্ব্বাঙ্গীন, সার্বকালিক, সৰ্ব্বরসে কৃষ্ণানুশীলন একমাত্র গোপললনাগণের আরাধনাতেই ব্যক্ত হইয়াছে। বালকৃষ্ণের উপাসনা অপেক্ষা কিশোর-কৃষ্ণের উপাসনা অধিকতর চমৎকারিতাময়ী।

সাধারণ আধ্যাত্মিক নৈতিক বিচারে—জাগতিক প্রত্যক্ষ দর্শনের অনুমানোক্ত জ্ঞানের প্রতিফলনে যে রাধাগোবিন্দের উপাসনা পরম হেয় বলিয়া দৃষ্ট হয়, সেই বিকৃত, প্রতিফলিত হেয় বিচারকে বিনষ্ট করিয়া যে শ্রীরাধাগোবিন্দের উপাসনা একমাত্র বাস্তব পরমোপাদেয়ত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই শ্রীরাধাগোবিন্দের উপাসনার আলোচনা যাঁহারা করেন, তাঁহারাই সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত। তাঁহাদের আরাধনা করাই সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য। তাঁহাদের কৃপায় ফোটের যে প্রকার সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ ও প্রভাব লাভ করা যায় তাহা অন্তত কুত্রাপি লভ্য নহে। এই কার্যে যাঁহাদের চিত্ত ব্যস্ত হইয়াছিল, তাঁহারা ইহজগতে থাকিলেও আমরা তাঁহাদের সেবা করিব—নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হইলেও তাঁহাদেরই সেবা করিব। তাঁহাদের ইহজগতে অবস্থান-কালে অনেক সময় আমরা অপরাধ করিয়া বসি। আমরা তাঁহাদের 'উপদেশক', 'গুরু' প্রভৃতি মনে করিয়া বসি। কিন্তু যে সময়

তঁাহারা আর এ' জগতে আমাদের সেবার জন্ত অধিকার পান না, এমন সময় এ জগতে অবস্থানকালেও আমরা তঁাহাদের সেবা করিবার সুযোগ পাই। ভগবান্ যাঁহাকে দয়া করেন, তঁাহাকে নিত্যলীলার সঙ্গে সঙ্গে নিত্য সেবাধিকার দেন। অনেকে মনে করেন, 'রামের গুরু শিব, শিবের গুরু রাম'—এটা একটা বিরুদ্ধ কথা। কিন্তু রাম যদি ভক্তবাৎসল্যেহেতু মহাদেবের সেবা করেন—ভগবন্তের উপাসনা করেন, তাহাতে শ্রীরামের ভগবত্তা কিছু কমিয়া যায় না। তৃণাদপি সুনীচ, নিজে উত্তম হইয়াও মানহীন এবং মানদ হইলেই হরিকীর্্তনের অধিকার লাভ করা যায়।

ফোটির বলদেবত্ব—শ্রীবলদেব স্বয়ংপ্রকাশতত্ত্ব। পরমেশ্বর বস্তু প্রকাশিত না হইলে তঁাহাকে কেহ জানিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অখিলরসামুতসিন্ধু; সেই কৃষ্ণচন্দ্রের স্বয়ং-প্রকাশ-বিগ্রহ অভিন্নবস্তু বলদেব; তিনিও 'ব্রজরাজকুমার' বলিয়া প্রসিদ্ধ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে যে-সকল কথা আছে, তঁাহাতেও তাহাই আছে, তবে তঁাহাকে কৃষ্ণ বলা হয় না, বলরাম' বলা হয়। নিখিল বিষ্ণুতত্ত্ব যাঁহা হইতে প্রকাশিত হইয়াছেন—দেবাসুর যাঁহার উপাসনা করেন, তিনিই স্বয়ং-প্রকাশবস্তু। সুরাসুরগণ স্বয়ং রূপবস্তুর উপাসনা না করিয়া স্বয়ংপ্রকাশবস্তুর উপাসনা করেন, যেহেতু ফোটির স্বয়ংরূপত্ব প্রকাশদ্বার ব্যতীত স্কুরিত হইয়া স্বয়ং নিজের পরিচয় দেন না। সেই স্বয়ংপ্রকাশ দ্বারই বিগ্রহরূপে—শ্রীবলদেব প্রভু।

মানব-জ্ঞানে যাহা জানা যায়, তাহা সঙ্কীর্ণ—বলদেবের বলের কিঞ্চিৎ আভাসময় অংশ মাত্র। বলদেব প্রভু সর্ব-শক্তিমান—সকল বল যাঁহার পদনখে অবস্থিত—যে সর্বশক্তি-মত্তা হইতে দূরে অবস্থান করিয়া কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ংক্রপের লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। মর্যাদাপথে ভগবান্কে জানিবার ইচ্ছা হইলে আমরা বলদেব প্রভুর পাদপদ্ম পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারি, তাঁহার অতিরিক্ত আমরা দর্শন করিতে পারি না। এখানে যাহা অতিদুর্লভ—এখানে যাহা আংশিক, চিঞ্জগতে তাহার আকর বস্তু সম্পূর্ণরূপে অবস্থিত। বলদেব প্রভুর বলে আমরা তাহা আলোচনা করিতে সমর্থ হই। আমরা মায়িক জগতের অন্তরালে অবস্থিত—আমাদের কথা খণ্ডিত হইয়া যাইতেছে। যে বল আমাদেরকে অভিভূত করে, আমরা তাহার আনুগত্য স্বীকার করি। আমরা দুর্বল—সামান্য শক্তি লাভের জন্ত আমরা কত যত্ন করি। শ্রীগৌরমুন্দর বলিয়াছেন,—‘তৃণাদপি সুনীচ’ হও, বৃক্ষের গায় সহগুণসম্পন্ন হও, নিজের চেষ্টায় বলবান্ হইবার ছবুঁদ্ধি না করিয়া যিনি বল-প্রদাতা, সেই বলদেব প্রভুর আশ্রয় গ্রহণ কর। যাঁহার বল, তিনি বলদেব প্রভু; কৃষ্ণচন্দ্র বলদেবের অনুগত জন কর্তৃক সেব্য হইতে ইচ্ছা করেন। বলদেব প্রভুর অনুগ্রহ ব্যতীত কৃষ্ণসেবা পাইবার উপায় নাই। যাঁহারা বলদেব প্রভুর সেবক হইতে পারেন, তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে বলবান্ হন। আমরা যদি অল্প কার্যে নিযুক্ত হইয়া যাই, তাহা হইলে বলদেব প্রভুর সেবা করিবার পরিবর্তে আমরা নিজেদের সেবা প্রার্থী হইয়া যাই। আমরা দুর্বল

জীব—৫০টি গুণ অতি অল্প পরিমাণে আমাদের আছে। ৬-টি গুণ সম্পন্ন বিষ্ণুবস্তুর আনুগত্য ব্যতীত আমরা তত্তদ্গুণবিশিষ্ট হইয়া বাস করিব মাত্র; কিন্তু তাঁহার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইলে পূর্ণতা লাভ করিব। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ যে কোন অবস্থায় থাকি না কেন, তাঁহার আনুগত্য ব্যতীত আমরা বলবিহীন হইয়া থাকিব। যিনি সর্বশক্তিমান—যাঁহা হইতে মানব পূর্ণবিচারশক্তি লাভ করিয়া কৃষ্ণদর্শনের সুযোগ প্রাপ্ত হন—যিনি সুরাসুর-বন্দ্য—সকল বেদ যাঁহাকে স্থির নিশ্চয় করিতে পারে না, তিনিই বলদেব। তাঁহারই বাহু-অঙ্গ হইতে এই জগৎ প্রকাশিত হইয়াছে। বাহু-অঙ্গ—পরিবর্তনশীল। অন্তর অঙ্গ—নিত্য। সন্ধিনী—‘সৎ’—বর্তমান। সেই বলদেব প্রভু একমাত্র পালনকারী—সকল মঙ্গলের মূল বিধাতা; তাঁহার মূল বস্তু কৃষ্ণ স্বয়ংরূপ, স্বয়ংপ্রকাশ বলদেব প্রভুর সেব্য। তিনি সখা, ভাই, শয়ন, ব্যজন, আবাহন, গৃহ, ছত্র, বস্ত্র, ভূষণ, আসন প্রভৃতিরূপে কৃষ্ণের সেবা করেন। বলদেব, বলভদ্র, বলরাম প্রভৃতি শব্দ দ্বারা তাঁহার সকল প্রকারের বলের কথা বলা হইয়াছে। তাঁহার অন্তরঙ্গা শক্তি হইতে বৈকুণ্ঠ, গোলোক, বৃন্দাবনাদি প্রকাশিত হইয়াছে; তাঁহার বহিরঙ্গা-শক্তি-পরিণাম—এই জড় ব্রহ্মাণ্ড; আর তাঁহার তটস্থশক্তি-পরিণতি—অনন্ত জীবগণ।

যে প্রভুর কিঞ্চিৎ বল পাইলে এই জীবকুল তাঁহার আনুগত্যে পারমার্থিক বলে বলীয়ান্ হন—কৃষ্ণসেবা লাভ করেন, সেই বলদেব প্রভু—সন্ধিনীশক্তিমদ্বিগ্রহ; কৃষ্ণচন্দ্র

—সম্বিদ্বিগ্রহ ; তিনি—জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, তন্মধ্যে সন্ধিনীশক্তি। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের বিচার সুষ্ঠু হওয়ার জন্ত মধ্যবর্তী যাহা থাকে তাহা সৎ। সচ্চিদানন্দবস্তু—বলদেবপ্রভু, সচ্চিদানন্দবস্তু—কৃষ্ণচন্দ্র ; সচ্চিদানন্দবস্তু—বার্ষভানবী—ইহারা সকলেই সচ্চিদানন্দময়বস্তু। “অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন”। সর্ববশক্তিমান্ বলদেব প্রভুতে সকল বিরুদ্ধধর্মের সমাবেশ আছে। চিদ্বস্তু যখন সচ্চিদানন্দময় বস্তুর জ্ঞান গ্রহণের জন্ত ব্যস্ত থাকেন, তখন বহির্জগতের অন্যান্য কথার সহিত তাঁহার সামঞ্জস্য করা সম্ভব নয়। একরূপ করিলে আমরা নানারূপ অমঙ্গলের মধ্যে পড়িয়া যাইব।

আমরা জড়জগতে আছি—তটস্থশক্তিপরিণত জীবকুল আমরা কৃষ্ণবৈমুখ্য-বশতঃ এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। বলের অভাব-হেতু এখানে আমরা প্রত্যেকের দ্বারা আক্রান্ত ; জড়সম্বন্ধ আমাদের নানা ভাবে বিক্ষিপ্ত করিতেছে। বলদেব প্রভুর আনুগত্য ব্যতীত আমাদের গতি নাই। বলদেবপ্রভু চেতনময় বলের প্রদানকারী অচিৎএর নিকট হইতে আমরা যে বল—যে জ্ঞান লাভ করি, তাহা যিনি ধ্বংস করিতে পারেন, তাঁহার নিকট হইতে সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। আমাদের যে বোধশক্তি, যে বল আছে বিচার করিতেছি, তলবকার উপনিষদে উমা-হৈমবতী-সংবাদে ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, পবন, প্রভৃতি দেবগণের সেরূপ বলের নিরর্থকতা ভগবান্ প্রদর্শন করিয়াছেন। এ সমস্তই অচিদ্বল মাত্র। বলদেবের বলে বলীয়ান্ না হইলে এসমস্ত বল ব্যর্থ হইয়া যায়—ইন্দ্রাদি দেব-

বৃন্দের সমস্ত বল ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল, বলদেবের বল লাভ না করায়।

আমাদের বর্তমান বল প্রতিমুহূর্ত্তে নষ্ট হইতেছে। বাস্তব-সত্যের অনুসন্ধানের জন্ত বলদেবের আশ্রয় গ্রহণ করা একান্ত কর্তব্য। আমার অবাস্তব বিষয়ে জ্ঞানলাভের জন্ত অপরের নিকট হইতে যে-সমস্ত পরামর্শ প্রাপ্ত হই, তাহার মূল্য অন্ধকপর্দক-মাত্র। যাহা পরিবর্তনশীল, নশ্বর, এরূপ জ্ঞানের প্রতি কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি আস্থা স্থাপন করেন না। মনোধর্মের দ্বারা পরিচালিত হইয়া যে শ্রেষ্ঠত্ব বিচার আমরা করি—অনিমাদি অষ্টসিদ্ধির প্রার্থী হই, তাহা প্রাকৃত বুদ্ধির পরিচয় মাত্র। আমরা যখন বলদেব প্রভুর আনুগত্যে কার্য্য করি, তখন কৃষ্ণসেবা হয়। বলদেবপ্রভুর একমাত্র কৃত্য—কৃষ্ণসেবা। সেব্য-সেবকের পাঁচ প্রকার সম্বন্ধ। জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়—কান্ত-কান্তা, জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়—পুত্র-পিতামাতা, জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়—বন্ধু, জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়—সেব্য-সেবক, জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়—নিরপেক্ষ শাস্ত্র। সেবক যখন সেব্যর দিকে অগ্রসর হ'ন, তখন তাঁহাকে বলদেবপ্রভুই সাহায্য করেন। বলদেব প্রভুর বল লাভ না করিলে আধ্যাত্মিকতা প্রবল হইয়া নানারূপ মতবাদ সৃষ্ট হয়। তখন—“প্রকৃতে: ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কৰ্ম্মণি সৰ্ব্বশঃ। অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্ত্বাহমিতি মন্বতে॥”—তখন আমাদের বিচার-প্রণালী দুষ্ট হইয়া পড়ে—তখন অহংগ্রহোপাসনা-দ্বারা ‘আমরাই সেই বস্তু’ মনে করি। নিজে অমানী-মানদ হওয়াই

আমাদের স্বাস্থ্য, তাহাতেই আমাদের নাম-ভজনের যোগ্যতা হয়, নতুবা আমাদের যোগ্যতা থাকে না। নামের বদলে শব্দ উচ্চারণ করিয়া আমরা যে অমঙ্গল বরণ করি, তাহা হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় শ্রীগৌরসুন্দর আমাদের জন্ত নির্দেশ করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর গয়া হইতে আসিয়া নবদ্বীপের পুরুষোত্তম সঞ্জয়ের বাড়ীতে ছাত্রগণকে ব্রাহ্মী ভাষায় যে ব্যাকরণ শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাতে সকল শব্দকেই কৃষ্ণরূপে বর্ণন করিয়াছেন। ফোটের বিদ্বদ্রুটি ও অবিদ্বদ্রুটি বলিয়া দুইপ্রকার বৃত্তি আছে। বিদ্বদ্রুটিতে যাবতীয় শব্দ কৃষ্ণ-পাদপদ্যকে লক্ষ্য করে; আর অবিদ্বদ্রুটি দ্বারা ভগবদিতরবস্তু লক্ষিত হয়। কৃষ্ণজ্ঞানের ছুঁতিক্ষে—নানাপ্রকার কাল্পনিক চিন্তাপ্রোতে কৃষ্ণবৈমুখ্যধর্ম উৎপন্ন হইয়াছে। আমরা বলদেব-প্রভুর কৃপায় পুনরায় কেবলজ্ঞানে জ্ঞানী হইতে পারি—“কৈবল্যক-প্রয়োজনম্” বিচারে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি—ভাগবতকে বেদান্তসার বলিয়া জানিতে পারি। সেই বলদেব-প্রভুর সর্ব্বতোভাবে অদ্বয়জ্ঞান কৃষ্ণপাদপদ্যের সেবা ব্যতীত অন্য় কোন কৃত্য নাই। এই বলদাতাপ্রভুর আনুগত্য করা—তাহার নিকট হইতে চিদ্বল সঞ্চয় করাই আমাদের একমাত্র কৃত্য। “নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ”। সেই বলদেব প্রভুর বল ব্যতীত আমাদের কোন সম্বল নাই।

আমরা ত' অচিদ্বল লাভের জন্ত অনেক যত্ন করিলাম, কিন্তু তাহা সমস্তই নষ্ট হইয়া যাইতেছে; কেন নষ্ট হইয়া যায়, তাহার কারণ অনুসন্ধান করা আবশ্যিক। বলদেব প্রভু বিরুদ্ধ-

শক্তি হইতে উদ্ধার করেন, যেমন প্রহ্লাদকে করিয়াছিলেন। মনোধর্মের পিপাসা তিনি মুষলের দ্বারা উৎপাটন করেন। তাঁহার কিঞ্চিৎ অনুগ্রহে সমস্ত মঙ্গল হইয়া যায়। তাঁহার আবার আবির্ভাব কিরূপ? নিঃশক্তিক থাকিবার যোগ্যতা তাঁহার আছে, কাল্পনিক নিঃশক্তিক নহে—সর্বশক্তিমত্তা-বিচার দূরে রাখিয়া কৃষ্ণচন্দ্র যেরূপ লীলাবিশিষ্ট হইয়া থাকেন। যখন সেই বস্তু জ্যেয়রূপে প্রকাশিত হন, তখন আমরা ক্রম বৃদ্ধিতে পারি—বাসুদেব, লক্ষ্মীনারায়ণ, রামসীতা, রুক্মিণী-দ্বারকেশের সেবার ক্রম। জন্ম-স্থিতি-স্বীকার রামচন্দ্রের সেবা-দ্বারা বৃদ্ধিতে পারা যায়। রুক্মিণীশের সেবা-লাভে—দ্বারকা, মথুরাও গোকুলে সর্বত্রই বলদেব প্রভু আমাদের সাহায্য করেন। তাঁহার কৃপায় মানবোচিত ভাব-সমূহ ঈশ্বরে আরোপ করিয়া কদর্থ করার হাত হইতে আমরা রক্ষা পাই। এরূপ কদর্থ গর্হণযোগ্য। প্রাকৃত সাহজিক-সমাজ এটাকে ধর্ম বলিয়া মনে করে। চিজ্জগতের বিকৃত প্রতিফলনে এখানকার সমস্ত উদ্ভূত হইয়াছে। কিন্তু সেইবস্তু যাঁহার বহিরঙ্গাশক্তি হইতে উদ্ভূত হইয়া সত্যের প্রতিফলনকে সত্য বলিয়া অনুভূত করাইতেছে, সেই মূল আকর বস্তু আমাদের আলোচ্য হউক, নচেৎ বৌদ্ধবিচার, অর্হৎ-বিচার ইত্যাদি অবলম্বন করিয়া অষ্টবসুর অশ্রুত উপরিচরবসুর বিচার অবলম্বন না করিলে অক্ষজবিচার হইবে। কিন্তু বলদেব প্রভু অধোক্ষজবস্তু। তিনি অন্তর্যামিসূত্রে অবিচার ধ্বংস করেন। কৃষ্ণের কথা আলোচনাকালে সব সুবিধা হইবে। তখন কৃষ্ণের প্রকাশ-

বিগ্রহের বিষয় উপলব্ধি হইবে। ক্রম-উপলব্ধি হইয়া উন্নত হইতে পারিব। রাবণের সিঁড়ি বাঁধা ছাড়িয়া দিব। জগতের জ্ঞান হইতে inductive process রূপ কাল্পনিক পথ অবলম্বন করিব না। সূর্যের আলোক অক্ষিতে আসিলে তদ্বারা সূর্যকে দেখিব। আলোকে সূর্য কল্পনা করা apotheosis. আমরা কপটতা করিয়া একটা মানুষকে ভগবান্ সাজাইতে দৌড়াইব না। ভগবান্ বলিয়াছেন,—“যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ। তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্ত তে মদনুগ্রহাৎ॥” আমার স্বরূপ, আমার রূপ, গুণ ও লীলা যে প্রকার, সেই সকলের তত্ত্ববিজ্ঞান আমার অনুগ্রহে তুমি প্রাপ্ত হও।

ভগবৎকৃপাক্রমে সেই ভগবদ্বস্ত প্রকাশিত হন। অক্ষজ-জ্ঞানে তাঁহাকে জানিতে পারা যায় না। বলদেব প্রভু ভিন্ন অন্ম কেহ তাঁহাকে জানাইতে পারে না। আমরা নিজ চেষ্টায় সেইবস্তুর জ্ঞান লাভ করিতে অসমর্থ,—“জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাশ্চ নমস্ত এব জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্তাম্। স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্গনোভিযে প্রায়শোহজিত জিতোহপ্যসি তৈপ্রিলোক্যাম্॥” একমাত্র ভক্তিবলেই সর্বসিদ্ধি হইতে পারে।

পরাতত্ত্বি ব্যতীত আমাদের আর উপায় নাই বলদেব প্রভুর অনুগ্রহ ব্যতীত মঙ্গলের পন্থা নাই। আর সমুদয় বিচার অক্ষজ—মানব-জ্ঞান-কল্পিত। ‘প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু-কলেবর। বিষ্ণুনিন্দা নাহি আর ইহার উপর ॥’ নির্বিশেষবাদী মনে করেন,—অক্ষজ জ্ঞানের দ্বারা বর্তমান জড়ীয় অবরতা

অতিক্রম করিয়া চেতনময় জগতে যাইতে পারি এরূপ চিন্তা শ্রোতের অকর্ষণ্যতা বলদেব প্রভুর কৃপায় বৃদ্ধিতে পারা যায়। বলদেব প্রভুর অনুগ্রহ লাভ করিলে চিদ্বল ও অচিদ্বল যে এক একটি আলাদা জিনিষ, তাহা বৃদ্ধিতে পারা যাইবে। বন্ধজীবের হৃদাকাশে—চিদাভাবে—জড়ীয় মনে বস্তুর কোন ক্রিয়াকলাপ নাই। জড়েররূপ—জড়ের চিন্তাশ্রোত সেখানে লইয়া যাইতে হইবে না,—“নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া বা বলুনা শ্রুতেন।” সেই বস্তুটি শ্রীচৈতন্যদেব ব্যতীত অণু কোন জিনিষ নহে। আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী—এই চতুর্বিধ ব্যক্তি নিজ নিজ বৃত্তি পরিত্যাগ করিলে ভক্ত হইতে পারে। দুর্বলতা গ্রহণ করিয়া আত্মবঞ্চনা করা আমাদের কর্তব্য নয়। বাস্তব সত্যের অনুগ্রহই আমাদের একমাত্র মুগ্য। চিদ্বলে বলীয়ান্ হওয়া কর্তব্য। দাস্তিকতা, অহঙ্কার, অচিদ্বলে বলীয়ান্ হওয়া আত্মমঙ্গলের পন্থা নহে। শ্রীগৌরমুন্দের আমাদের এরূপ চিন্তাশ্রোতের অকর্ষণ্যতা দেখাইবার জন্ম বলিলেন,—“তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা ॥ অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥”

সর্বদা বিষ্ণুরই কীর্তন করিতে হইবে। মায়ার কীর্তন করিতে হইবে না। বৈকুণ্ঠরাজ্যে বাস করিতে হইবে—সর্বক্ষণ মায়ায় বিমোহিত হইলেও আমাদের মায়াতীত রাজ্যে বিচরণ করার বলই বলদেব প্রভুর কৃপায় অর্জন করিতে হইবে। যাঁহাদের চিদ্বল, চিদ্বিলাস লাভ হইয়াছে, তাঁহারা বাস্তব সত্যের প্রচারের জন্ম যত্ন করেন। এখানকার অনন্ত-

কোটা ধন, বিদ্যা, জ্ঞান, সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট হইবার দরকার নাই। যাঁহারা এগুলোকে বহুমানন করিতেছেন, আমরা দূর হইতে তাঁহাদিগকে দণ্ডবৎ করি। তাঁহাদের নিজ-মঙ্গল-লাভের জন্ত আদৌ ইচ্ছা নাই। যাঁহারা অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, অসত্যাশ্রয়ী, তাঁদের বিচার-প্রণালী প্রশংসনীয় নহে। আমরা মনুষ্যজন্ম পাইয়াছি—জগতের কোটা কোটা লোকের কথা শুনিতেছি; কিন্তু তাঁহারা মরিবে, তাঁহাদের চিত্তবৃত্তির পরিবর্তন হইবে। খানিকক্ষণ পরে তাঁহারা আর সাহায্য করিতে পারিবেন না। সুতরাং আমরা ইহাঁদের আনুগত্য করিয়া আর প্রতারিত হইব না। যিনি সর্ব্বশক্তিমান—যাঁহার আনুগত্যে আমাদের সর্ব্ব অমঙ্গল দূর হইবে—নিত্যকাল যাঁহার কৃপা আমাদের উপর বর্ষিত হইবে, সেই বলদেব প্রভুর আশ্রয় আমরা গ্রহণ করিব। যদিও বর্ত্তমানে মায়ার অভিভূত হইবার যোগ্যতালাভ করিয়াছি, তথাপি সেই দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে বলদেব প্রভুর কৃপা লাভ করিতে সমর্থ হই তজ্জন্ত বলদেব প্রভুর অনুগতজনের আশীর্বাদই সম্বল। তাহা হইলে স্ফোটের কৃপা লাভ ও স্ফোট বিজ্ঞান লাভে কৃতকৃতার্থ হইতে পারা যাইবে।

স্ফোটের অপ্রাকৃতত্বঃ—যাহা প্রপঞ্চাতীত (Beyond Physical), তাহাই অপ্রাকৃত। সেই অপ্রাকৃত বস্তু চতুর্বিধ ব্যক্তিত্বের সহিত নিত্য বর্ত্তমান। তাহা নিত্য, শুদ্ধ, পূর্ণ এবং মুক্ত। প্রাকৃত বিশেষে যে-সকল নাম-রূপ-গুণাদি আছে, তাহাদের নিত্যত্ব নাই, তাহারা অনিত্য, ক্ষণভঙ্গুর, অশুদ্ধ,

খণ্ডিত ও বদ্ধ আপেক্ষিকতায়ুক্ত। কিন্তু অপ্ৰাকৃত নামের উপাসনা নিত্য। তাহা সৰ্ববিধ মায়িক বন্ধনের হেয়তা হইতে পরিমুক্ত। অপ্ৰাকৃত শ্ৰীনাম—পরিপূৰ্ণ বস্তু। তাঁহাতে সকল শক্তি নিহিত। অর্থাৎ অপ্ৰাকৃত নামই স্বয়ং নামী, অপ্ৰাকৃত নামই রূপী, অপ্ৰাকৃত নামই গুণী, অপ্ৰাকৃত নামই লীলাময়, অপ্ৰাকৃত নামই পরিকরবান্। এই চারিপ্রকার বৈশিষ্ট্য অপ্ৰাকৃত বস্তুতেই নিত্য বর্তমান। অপ্ৰাকৃত বস্তু যখন কৃপা-পূৰ্ব্বক শ্ৰীনামাচার্য্যের শ্ৰীমুখ হইতে আমাদের সেবোন্মুখ কর্ণে অবতীর্ণ হন, তখনই আমরা ফোটাওয়াক অপ্ৰাকৃত শব্দব্রহ্মকে ধারণা করিতে পারি, নতুবা প্ৰাকৃতের সহিত মিশ্ৰিত করিয়া অপ্ৰাকৃতের ধারণা কখনই সম্ভব নহে। প্ৰত্যেক প্ৰাকৃত ইন্দ্ৰিয়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়া অপ্ৰাকৃত চিন্ময় নিত্য ইন্দ্ৰিয়সমূহ আবৃত থাকায় বহিঃজগতের আবরণমুক্ত-দর্শনে যে সেবোন্মুখতা আছে, তাহারই ধারণা গৃহীত হয়। শ্ৰীনামাচার্য্যের কৃপায় শ্ৰীনামই স্ফুটিত হইয়া আমাদের কর্ণকে নিয়মিত করিয়া আমাদের যাবতীয় প্ৰাকৃত ভোগানুকূল ভাবগুলিকে নিরাস করিয়া থাকেন।

নিৰ্ব্বিশেষ বাদিগণের অনুমান ও কল্পনাজাত বিচারে ক্লীবত্বই অপ্ৰাকৃত বা নিগুণের লক্ষণ। নিত্য পরা শান্তির রাজ্যে সৰ্বিশেষত্ব বলিয়া কোন ব্যাপার নাই। সেখানে যাবতীয় ইন্দ্ৰিয়ের গতি, যাবতীয় নাম-রূপ-গুণ স্তব্ধ হইয়াছে। সেখানে সকলই শূন্য ও নিৰ্ব্বিশেষ। ইহা প্ৰাকৃত জগতের অভিজ্ঞতাকে অপ্ৰাকৃত জগতে বহন করিবার দুৰ্ব্বুদ্ধি হইতে

উদিত। তাহারা প্রপঞ্চের অভিজ্ঞতাকে প্রপঞ্চাতীত রাজ্যে চালনা করিয়াছে। তাহারা এই প্রপঞ্চের নাম-রূপ-গুণ-লীলার হেয়ত্ব ও অনিত্যত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া সেই প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা হইতে অনুমান করিতেছ যে, প্রপঞ্চাতীত রাজ্যেও যদি নাম-রূপ-গুণ-লীলার অস্তিত্ব থাকে, তাহা হইলে তাহা প্রাকৃত জগতেরই ঞায় অনিত্য ও হেয় হইয়া পড়িবে। সুতরাং নাম-রূপ-গুণ-লীলা প্রভৃতি প্রপঞ্চেরই ব্যাপার, তাহাদের প্রপঞ্চাতীত অস্তিত্ব নাই। নাম-রূপ-গুণ-লীলার অস্তিত্ব-রাহিত্যই প্রপঞ্চাতীতের লক্ষণ! এইরূপ বিচারে অভিজ্ঞতাবাদোথ অনুমান এবং ব্যতিরেক একদেশী বিচারের আবাস্তবতা রহিয়াছে। ইহাতে বাস্তব জগতের যে অবতারের বিচার বা শ্রৌতপন্থা, তাহা সম্পূর্ণরূপে অনাদৃত হইয়াছে। নিবিশেষবাদীর অনুমান--তেতালার উপরে ব্যাঘ্র নাই! কেননা, যেখানে ব্যাঘ্র, সেখানে মনুষ্যের অবস্থান থাকিতে পারে না। কিন্তু অবতারবাদী তেতালা হইতে নামিয়া আসিয়া বলিতেছেন--তেতালায় ব্যাঘ্র আছে। কিন্তু সেই ব্যাঘ্রের হিংস্র স্বভাব নাই। অবতারবাদীর শ্রৌত উক্তি--তেতালায় যে বাস্তব বিষয় রহিয়াছে, তাহা অভ্রান্ত ও অটুটভাবে জগতে প্রকাশিত করিয়া দিতেছে। বৈষ্ণবগণ--অবতারবাদী, শ্রৌতপন্থী। তাঁহারা আরোহবাদী, তর্কপন্থী নহেন। শ্রীনাম নিজেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইতে পারেন। যাহা নিজেই প্রেরণা দিতে পারে, তাহা সর্বতোভাবে নিরপেক্ষ এবং স্বতঃপ্রবৃত্তি-বিশিষ্ট।

জড়ীয়নাম অপ্রাকৃত নামের বিকৃত হয় প্রতিফলন। অপ্রাকৃতের অবিকৃত অবতার—জড়তা নহে। অপ্রাকৃতের স্বরূপ-প্রতিবন্ধক প্রতিবিস্তৃত নামই-প্রাকৃত নাম-সমূহ। আমরা বর্তমানে তৃতীয় মানের রাজ্যে অবস্থিত। তুরীয়মানে আমাদের প্রবেশাধিকার নাই। অপ্রাকৃতের অসম্পূর্ণ-দর্শন মধ্যস্থিত আবরণ হইতেই উৎপত্তি লাভ করে। উহাই প্রাকৃতদর্শন মাত্র। অপ্রাকৃত শুভ্রতার বাধক প্রাকৃত সবুজ আরণকে নিরাকৃত করিয়া স্বয়ংই স্ব-স্বরূপে প্রকাশিত হইতে পারেন, ইহাই অপ্রাকৃতের যোগ্যতা। প্রাকৃতের সেই যোগ্যতা নাই। শ্রৌত-প্রণালী ও সাধারণ্যে প্রচলিত গণগড্ডলিকার মতবাদ দুইটী ভিন্ন বস্তু। শ্রৌতবিষয়-শ্রবণে সহিষ্ণুতা ও শ্রবণোন্মুখতা আবশ্যিক। শ্রবণোন্মুখতার অভাবেই জগতে নানা অশ্রৌত মতবাদ প্রবিষ্ট হইয়াছে। নাম-সংকীৰ্তনই একমাত্র উপায়। এতদ্ব্যতীত অধোক্ষজ রাজ্যে প্রবেশের অন্ত কোন উপায় নাই। নাম-সংকীৰ্তনই একমাত্র লক্ষ্যের একমাত্র উপায়। নাম-সংকীৰ্তন ব্যতীত দ্বিতীয় উপায় নাই। আর নাম সংকীৰ্তনে যে প্রেমালভ্য হয়, তদ্ব্যতীত অন্ত কোন পরম লক্ষ্যও নাই। এইজন্ত শাস্ত্র বলিয়াছেন—“হরেনাম-হরেনাম হরেনামৈব কেবলম্। কালৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্থথা ॥” অন্য কোন উপায় নাই, নাই, নাই তিনবার নিষেধ করা হইয়াছে। কিন্তু ভক্তিভরে অবিরাম শুদ্ধ নাম গ্রহণ করিলে যাবতীয় প্রতিবন্ধক বিদূরিত হইবে। জড়মিশ্র অক্ষর বা শব্দ গ্রহণ করিলে নাম গ্রহণ হইল না।

যদি আমরা নামের সহিত ঐতিহাসিক, আধ্যাত্মিক বা রূপক কোনপ্রকার সম্বন্ধ সংযুক্ত করি, তাহা হইলে নামের স্বরূপ বুঝিতে পারিব না। চিত্ত বা মন জড়জগতের মলিনতা ও আবর্জনা হইতে নিস্কৃত না হইলে কি করিয়া নাম গ্রহণ করা যাইবে? নাম গ্রহণ কোন প্রকার মানসিক বা শারীরিক ক্রিয়া বিশেষ নহে। নাম গ্রহণের জন্য অথ কোন প্রকার কৃত্রিম উপায়ের আবশ্যকতা নাই। যাহা যাহা আবশ্যক, তাহা শ্রীনাম-কীর্তনই সাধন করিবেন অর্থাৎ নাম কীর্তনই সকল অপ্রাকৃত অনুভূতি আবাহন করিবেন ও তৎসহ বাহ্য অসম্পূর্ণ ধারণা-মুক্ত করাইবেন।

নবম ক্রম

নামভজনে নামাপরাধ, নামাভাস ও নাম—এই তিন প্রকার বিচার আছে। যখন আমরা আমাদের কৰ্ম্মী মনে করিয়া ধৰ্ম্ম, অর্থ, কামলাভের জন্য নাম-গ্রহণের ছলনা করি, তখন আমাদের নামাশ্রয়ের পরিবর্তে নামাপরাধই হয় ও জড়বিচারের মঙ্গল লব্ধ হয় মাত্র। যখন আমরা আমাদের মৌক্ষিকামী মনে করি, তখন নামাভাসের চেষ্টা প্রদর্শিত হইলেও ‘নামাভাস’ মৌক্ষিকাজ্জ্ঞায়ুক্ত হইয়া উদ্ভিত হয় না, তৎফলে স্বাভাবিক বদ্ধবিচার ভোগ হইতে মুক্তি হয়। মৌক্ষিকাক্ষা পরিত্যাগ করিয়া নাম-গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতে করিতে যখন অনর্থের নিবৃত্তি হয়, তখনই ‘নামাভাস’ উদ্ভিত হইয়া থাকে। নামাপরাধ আমাদের কৰ্ম্ম-পুণ্যের পথে

লইয়া যায়। অধর্ম অনর্থ ও কামের অপূরণ অথবা ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই সকল নামাপরাধের ফল। কিন্তু ইহা শুদ্ধ নামোচ্চারণের প্রতিবন্ধক। স্মুতরাং নামাপরাধ হইতে সর্বদা সাবধান থাকিতে হইবে। পবিত্র, অপবিত্র, পুণ্য, পাপ সমস্তই জড়জগতের পরিভাষা ও বিচার। পবিত্রতা ও পুণ্যবুদ্ধিও অপ্ৰাকৃত শ্রীনাম-গ্রহণের প্রতিবন্ধক। ধর্ম-কামনা, পুণ্য-কামনা, পবিত্রতাকামনা বা অধর্মকামনা, পাপকামনা ও অপবিত্রকামনা—সমস্তই অনর্থও নামোচ্চারণের প্রতিবন্ধক। ধর্ম-অর্থ-কাম লাভের জন্য সমাজনীতি পালন করি; বর্ণাশ্রমধর্ম আমাদিগকে পবিত্রতা ও সাধুতা প্রদান করে। কিন্তু এই সকল বিধি—আত্মধর্ম নহে। ঐরূপ বুদ্ধিতে আবদ্ধ থাকিলে শুদ্ধনামোচ্চারণ হয় না। নামাভাসে আমাদের অনর্থমুক্তি হয়। নামাভাস—নামোদয়ের প্রগাবস্থা, নামসূর্য্যের অরুণোদয়স্বরূপ। নানাভাসের পরে আমরা নামের উদয় লক্ষ্য করি। আমরা এখন নামাপরাধে পতিত। কেননা, আমরা নামের সহিত প্রপঞ্চের সম্বন্ধ-সমূহ সংযোজিত করিবার চেষ্টা করিতেছি, আমরা ফলাকাজক্ষী। যখন আমরা নামের নিকট ধর্ম-অর্থ-কামের প্রার্থী হই, তখন নামাপরাধ উদ্ভিত হয়। যখন আমরা কোন প্রকার ইন্দ্রিয়পরায়ণতার ভূমিকায় দণ্ডায়মান হইয়া নামগ্রহণের চেষ্টা দেখাই, তখন তাহা নামাপরাধ হয়। নামোচ্চারণ-প্রণালীকে একমাত্র প্রণালী বিচার করিয়া না করিয়া বহুবিধ প্রণালীর অগ্রতম মনে করা—‘নামাপরাধ’। নাম-গ্রহণ প্রণালীতে লোককে আকর্ষণ করিবার জন্য ঐরূপ

নামের অর্থবাদ কল্পিত হইয়াছে, এইরূপ বিচার—নামাপরাধ। নামাচার্য্য গুরুদেবে মর্ত্যবুদ্ধি, নামকে অনিত্য-জ্ঞান, নাম-মাহাত্ম্য-প্রতিপাদক শাস্ত্রকে অন্যান্য রাজস-তামস শাস্ত্রের সহিত সমজ্ঞান, নামকে ভগবানের স্বরূপ-রূপ-গুণ-পরিকর-বৈশিষ্ট-লীলা হইতে ভিন্ন জ্ঞান, দেহে আত্মবুদ্ধির সহিত-নামোচ্চারণের চেষ্টা প্রদর্শন, নামবলে পাপবুদ্ধি প্রভৃতি—নামাপরাধ।

নামাভাস—বৈকুণ্ঠ-নাম এবং মায়িক নামের মধ্যে তটস্থ জীবের একটি তাটস্থ্য-ভাব আছে। বৈকুণ্ঠ-নামের আভাস—মধ্যবর্তীস্থানে অবস্থিত। একদিকে অপরাধ, অপরদিকে মূর্ত্ত নিরপরাধ, মধ্যবর্তীস্থানে অপরাধ-নির্মুক্তিরূপ নামাভাস অর্থাৎ একদিকে ‘নাম,’ অপরদিকে নামাপরাধ, মধ্যে নামাভাস। নামের সেবা করিতে গিয়া প্রপঞ্চে বা ইরতব্যোমে নামাপরাধ এবং উহার ও পরব্যোমের মধ্যবর্তীস্থানে নামাভাস এবং বৈকুণ্ঠে নাম অবস্থিত। অনর্থযুক্ত অবস্থায় নামাভাস বা নামের অবস্থিতি নাই। অপরাধমুক্ত অবস্থায় এবং নামভজনে যোগ্যতারাহিত্যরূপ সঙ্কল্পজ্ঞানাভাবে যে নামোচ্চারণ, তাহাই নামাভাস-শব্দে উদ্দিষ্ট হয়। প্রাপঞ্চিক জীবের বদ্ধাবস্থায় নাম-গ্রহণ-যোগ্যতা হয় না; নামাভাস করিবার যোগ্যতায় অপরাধ হয় না। এইজন্যই শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেন,—বৈকুণ্ঠনাম সর্ব্বাঙ্গে উচ্চারিত হইবামাত্রই সকল পাপ বিনিষ্ট হয় এবং সর্ব্বপাপের প্রায়শ্চিত্ত সাধিত হয়, তাহার-পর নামগ্রহণের প্রেমোদয় হয়। নামোদয়ের পূর্বে নামাভাস

হয় অর্থাৎ নামাভাসের পরে নামোদয় হয় ; তবে যে নামাভাস হইবার পর জাগতিক দর্শনে মুক্তপুরুষের চরিত্রে বদ্ধভাব প্রাপক্ষিক নয়নে দৃষ্ট হয়, তাহা বাস্তব নহে, উহা ভক্তির পরিপোষক। উহা মুক্তপুরুষের চরিত্রে যখন প্রতিভাত হইতেছে, তখন তাহাকে নামাপরাধের ফল বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে না ; কিন্তু তাই বলিয়া যাবতীয় নামাপরাধী তাহাদের প্রথম উচ্চারিত নামকেই 'নামাভাস'-জ্ঞানে আপনাদিগকে "মুক্তবৈষ্ণব অজামিল" মনে করিয়া স্ব-স্ব অপরাধকেই ভক্তির পরিপোষক জ্ঞান করিবেন না, করিলে নামবলে পাপপ্রবৃত্তি-হেতু নিশ্চয়ই নিরয়ে পতিত হইবেন। শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুরের বিচার-প্রণালী অবলম্বন করিয়া প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের অমঙ্গল অবশ্যস্বাভাবী। তাহা হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-মহোদয় বলেন,—“যদিও অজামিলের প্রথম নামোচ্চারণে সর্বপ্রায়শ্চিত্তকর, সর্বানর্থনাশক নামাভাস সম্বন্ধে শ্রীচক্রবর্তী ঠাকুরের বিচার-প্রণালীতে পরিদৃষ্ট হয় এবং কাল-প্রভাবে বীজ হইতে বৃক্ষের ফলধারণকাল পর্য্যন্ত যে ব্যবধান, তাহা অনন্ত-কালবিচারে নিতান্ত স্বল্প, তথাপি নামাভাসের অব্যবহিত পরেই নামসেবা আরম্ভ না হইয়া আর কিছু সংসাধিত হইলেই তাহাকে ভক্তিপরিপোষক বলিয়া স্বীকার করা হইবে না। সকলেই 'অজামিল' নহেন এবং বহিদৃষ্টিতে অজামিলের কদর্য্যা-নুষ্ঠান অমুক্ত পুরুষের সমদর্শনে দৃষ্ট হইলে শুদ্ধ নামোচ্চারণে বিলম্ব হইয়া যাইবে, সুতরাং প্রথম নামোচ্চারণ তাঁহার

নামাভাস হইলেও নামোচ্চারণের পূর্ববর্তী নামই ভগবৎ-সেবার স্মৃতি বা অনুভব উৎপাদন করিবে। যদিও অজামিলের আদি-নামোচ্চারণরূপ নামাভাসফলে ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া জীবগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য বিষ্ণুদূতগণকে প্রেরণ করিয়াছেন এবং অজামিলের দ্বারা ভগবৎপ্রেরণাক্রমে নানাবিধ পাপাচার নামভজনের অন্তরায়রূপে প্রদর্শিত হইয়াছিল, তথাপি অজামিল ব্যতীত অন্যান্য পরবর্তী সাধকের সেই বিচার-ছলে আপনাদের সহিত অজামিলের মমতা-প্রয়াস এবং আপনাদিগের পাপাচারগুলিকে অপরাধোথ না জানিয়া ভক্তিপরিপোষকরূপে উপলব্ধি-হেতু অমঙ্গলপ্রসূ না হয়, তজ্জন্ত প্রথম নামোচ্চারণ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রেমোদয়-কালের পূর্বপর্যন্ত যে শেষ-নামোচ্চারণকেই 'নামাভাস' সংজ্ঞা দিলে প্রাকৃত সহজিয়াকুলের -সহজবিচারবিষয়ে অসুবিধা হয় না। নামপরাধে ত্রৈবর্গিক ফল-লাভ ঘটে, নামাভাসে মোক্ষ-লাভ ঘটে এবং নামভজনে কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়। “ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ” বা “অনুগ্রহায় ভক্তানাং” শ্লোকটি গ্লোকে 'ভক্ত' শব্দের প্রয়োগে বা “অপি চেৎ সুহুরাচারো” গ্লোকে 'অনগ্রভাক্' শব্দের প্রয়োগে সেবা-বৈমুখ্যকেই ভক্তিরস-জ্ঞানরূপ ভ্রান্তি হইতে রক্ষা পাইতে হইলে জানা উচিত—'অনগ্রভক্ত' শব্দের অর্থচতুর্বর্গানুসন্ধান-প্রিয়তায় আবদ্ধ নহে, পরন্তু তাদৃশ চতুর্বর্গানুসন্ধান হইতে ব্যতিরেকভাবে জীবকুলকে নিষেধ করিবার উদ্দেশ্যেই ভগবদ্দি-চ্ছাক্রমে বিহিত। যদি কেহ স্বীয় অনর্থযুক্ত অবস্থায় আপনাকে

শুদ্ধভক্ত বলিয়া অভিমান করেন, তাহা হইলে তাহার মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।” শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুরের মতে, অজামিলের প্রথম নামোচ্চারণের পরে তাঁহার যে-সকল ছুক্তিয়ার উল্লেখ আছে, ইন্দ্রিয়তর্পণপর সেইগুলি আদরের সহিত গ্রহণীয় বা-অনুকরণীয় নহে; পরন্তু ব্যতিরেক-বিচারে তাহাই তাহাদের পরিহার করা কর্তব্য। মুক্তপুরুষের ঐগুলি ‘দোষের বিষয়’ না হইলেও অমুক্তব্যক্তির পক্ষে উহা কখনই ‘আদর্শ’ হইতে পারে না। অর্থাৎ নামাপরাধ, নামভাস ও পরে শুদ্ধনাম—এক-শ্রেণীর মহাজনের কথা, আবার অপরশ্রেণীর মহাজনের কথা,—প্রথমেই মুক্ত-পর্য্যায়ের নামাভাস ও মুক্তি, তারপর নাম বা শুদ্ধ-সেবা; উভয়ে সমতাৎপর্য্য বিশিষ্ট হইলেও শেষোক্তমতের ‘তাৎপর্য্য এই যে,—সর্ব্বাণ্ড্রে নামাভাস পরে ভোগময়-ধর্ম্মবর্জিত ভগব-দিচ্ছাক্রমে ছুরাচারাদি অপরাধ-প্রতিম অল্পষ্ঠানের হেয়ত্বদর্শন পরিহারপূর্ব্বক উহাকেই ‘ভক্তিপোষক’ বলিয়া জ্ঞান হইলেও উহা ফলোদগমকালোপেক্ষা-মাত্র, তৎফলে ঐ অবস্থা হইতে পরিত্রাণ-কালে তাদৃশ অবস্থার অনধিষ্ঠানে নাম-ভজনরস্তু দৃষ্ট হয়। এতদুভয় মতই পরস্পর এক উদ্দেশ্য বিজ্ঞাপক। অজামিলের নামোচ্চারণকালে অর্থবাদ বা অর্থ-কল্পনারূপ ‘সাক্ষাৎ অপরাধ’ ছিল না; সুতরাং ঐ অপরাধদ্বয়ে অপরাধী অনভিজ্ঞ স্মার্ত্তকুলের বহুজন্মব্যাপী কোটী কোটী নামোচ্চারণের সহিত অজামিলের নামোচ্চারণ কখনই একপর্য্যায়ের বিচারাধীন হইতে পারে না।

নামাভাসের পরে আমরা অপ্ৰাকৃত নামের বিচার দেখিতে

নাই। অপ্রাকৃত কৃষ্ণনাম—চিন্তামণি, পূর্ণ, শুদ্ধ, নিত্য ও মুক্ত বস্তু। অপ্রাকৃত নাম ও নামী অভিন্ন। অপ্রাকৃত নামের দেহ ও অপ্রাকৃত নামের দেহীতে কোন ভেদ নাই। ইহা Subject and Object এর কথা নহে। ইহা প্রকৃত সত্য অধিষ্ঠানের (entity) কথা বাচ্য ও বাচকের কথা। বাচক বস্তু নাম - বাচ্য বস্তু নামী হইতে অভিন্ন। বাচক নামই—বাচ্য নামী। আমরাদিগের নিকট বাচ্য হইতেও বাচক-স্বরূপের অধিকতর উপযোগিতা। কিন্তু বাচকের নিকট কোন প্রকার ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকামনা আমরাদিগকে বাচকের স্বরূপবিজ্ঞান হইতে দূরে নিক্ষেপ করে। ভুক্তিকামনা ও মুক্তিকামনা—ইন্দ্রিয়-তর্পণের কথা। আমার মুক্তিকে আমার স্বার্থপরতা থাকিতে পারে, আপনার তাহাতে কি স্বার্থ আছে? যেখানে কৃষ্ণের পরিপূর্ণ সুখের অনুসন্ধান হয়, কৃষ্ণের কাম-চরিতার্থ হয়, সেখানে শুদ্ধ নামের উদয়। সেরূপ নামের উদয়ে আনুষ্ঙ্গিক-ভাবে আমার যাবতীয় প্রকৃত স্বার্থপরতা এবং অশাস্ত্র জীবেরও শুদ্ধ স্বার্থপরতার যুগপৎ সিদ্ধি হয়। কৃষ্ণের কামের চরিতার্থতা যেখানে নাই, তাহা অভক্তি; নামাশ্রিত ব্যক্তিগণ সেরূপ অভক্তির জন্ম লালায়িত নহেন। ভক্তি আমাদের আত্মার নিত্য বৃত্তি। আমাদের স্বরূপ নির্ণয় আমরাদিগকে ভক্তি ব্যতীত অন্য কোন ইতর সাধন বা সাধ্যে উপনীত করে না। আমি কাষ—আমি বৈষ্ণবের দাসানুদাস, আমি আমাকে ব্রাহ্মণকুলজাত; ক্ষত্রিয়কুলজাত, বৈষ্ণুকুলসম্মত বা শূদ্র, অন্ত্যজ, পঞ্চম, বর্ষ, সপ্তম প্রভৃতি কোন

কুলজাত মনে করি না। আমি আমাকে কামস্কাট্কা, আমেরিকা, ইউরোপ বা ভারতবর্ষের অধিবাসীও মনে করি না। আমি আমাকে সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ বা বানপ্রস্থ—কোন আশ্রমীও জ্ঞান করি না। এগুলি সকলই সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা মাত্র। আমি—আত্মা, চেতন; আমি বিভূচেতন শ্রীকৃষ্ণের দাসানুদাস। পূর্বেকৃত পরিচয়গুলি মায়িক পরিচয় মাত্র। মায়িক পরিচয় আমার উপর প্রভু বিস্তার করিলে আমার মুখে শ্রীনাম প্রকাশিত হইতে পারেন না। কোন প্রকার জড়ীয় অনুষঙ্গ যেন আমাদিগকে অপ্রাকৃত অভিসারে বাধা প্রদান না করে। আমরা যেন জড়-সম্বন্ধের যুপকাষ্ঠে মস্তক প্রদাননা করি। স্থূল বা সূক্ষ্ম শরীরের দ্বারা নামের উচ্চারণ হয় না; কিন্তু কেবল চেতন আত্মার সেই চেষ্টার উদয়েই অর্থাৎ ভগবৎসেবার উন্মেষণ হইতে মনের দ্বারা চালিত হইয়া বহির্জগতে নাম-সেবা সম্ভবপর হয়। “অতঃ শ্রীকৃষ্ণমাদিনান ভবেদ গ্রাহমিদ্ভিয়েঃ। সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুৰত্যদঃ ॥” শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা প্রভৃতি প্রাকৃত চক্ষু-কর্ণ-রসনা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় বা মনের দ্বারা গ্রাহ্য নহেন। জীব যখন সেবোন্মুখ হন, তখন সেই সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ে সর্বশক্তিমান্ স্বয়ংপ্রকাশ নাম স্ফূর্ত্তি লাভ করেন। বর্ত্তমানে আমাদের আত্মা নিদ্রিত, আত্মার প্রতিভূ বা কৰ্ম্মাধ্যক্ষ মন সুপ্ত-প্রভুকে প্রতিমুহূর্ত্তেই বঞ্চনা করিতে চাহিতেছে। সুতরাং মন যাহা কিছু করিবে, তাহা আত্মার স্বার্থে নহে, —নিজের অপস্বার্থে। মন যদি নাম-গ্রহণের ছলনা দেখায়, কিস্বা মনের আজ্ঞাবাহক স্থূলকার্য্যসাধক শরীর যদি নামোচ্চারণের

ব্যায়াম প্রদর্শন করে, তাহা হইলে উহা তাহাদের কোনও না কোন অভিসন্ধিমূলক ইন্দ্রিয়তর্পণমাত্র হইবে। আত্মা তাহার কোন ফল লাভ করিবে না। কিন্তু যখন শ্রীনামাচার্য্য শ্রীগুরুদেবের কৃপায় আত্মার উন্মুখতারূপিত্তি উদিত হয়, তখন আত্মাকে জাগরিত দেখিয়া আত্মার প্রতিভু ও কর্মকর্তা মন এবং স্থূল দেহ—তাহাদের ছুষ্ঠ অভিসন্ধি ও বিমুখতা সংরক্ষণ করিতে পারে না। তাহারাও পরমাত্মার সেবোন্মুখ আত্মার আনুগত্যে যে-সকল কার্য্য করিয়া থাকে, তাহা আত্মা বা পরমাত্মারই নিজ-সুখ-সাধক হইয়া থাকে। শ্রীনামাচার্য্য শ্রীগুরুদেব আমাদিগকে এই সকল কথা জানাইয়াছেন। আমরা কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ শ্রীনামাচার্য্যের উপদেশ গ্রহণ করিলেই মঙ্গললাভ করিতে পারি। যিনি অনুক্ষণ শতকরা শত পরিমাণ কৃষ্ণসেবায়—কৃষ্ণ-সুখ-তাৎপর্য্যে নিখিল চেষ্টা নিয়োগ করিয়াছেন, তিনিই শ্রীগুরুদেব। উৎকৃষ্ট জাগতিক আভিজাত্য, পাণ্ডিত্য, সৌন্দর্য্য, কিম্বা ঐশ্বর্য্য—শ্রীগুরুদেবের গুরুত্বের লক্ষণ নহে। অবৈষ্ণব কখনই ‘গুরু’ হইতে পারে না। ‘বৈষ্ণব’ বলিতে যিনি শতকরা শত পরিমাণ বিষ্ণুর সেবা করেন। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ বিষ্ণুমায়া হইতে প্রসূত। এই অচিৎসর্গের কোন বস্তু, ব্যাপার বা চিন্তা মুহূর্ত্তের জন্ম ঘাঁহাকে বিষ্ণুর পরিপূর্ণ সেবা হইতে বিচ্যুত করিতে পারে না, তিনিই বৈষ্ণব বা গুরুদেব। বিষ্ণু অধোক্ষজ বস্তু। যদি কেহ ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানজাত বস্তুকে বিষ্ণু মনে করিয়া তাহার সেবায় নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে ‘বৈষ্ণব’ বা ‘গুরু’ বলা যাইতে পারে না। বিষ্ণু কখনও আমাদের

ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানের নিকট আত্মসমর্পণ করে না। যদি তিনি আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের নিকট কখনও আত্মসমর্পণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে এই প্রপঞ্চের অগ্ন্যতম বস্তু জ্ঞানে আমরা তাদৃশ প্রভুরই প্রভু বলিয়া নিজত্বের বিচার করিতাম। বিষ্ণুর শ্রীমূর্ত্তি স্বয়ং বিষ্ণুর স্বরূপ হইতে অভিন্ন। অর্চাবতারকে 'কাঠ', 'পাথর' ইত্যাদি মনে করা, কিম্বা কোন কুস্তকার, সূত্রধর, ভাস্কর প্রভৃতির সৃষ্টবস্তু ধারণা করা—বিষ্ণুমায়ার দর্শনে ভোগীরা ভোগ-পিপাসা-মাত্র। যাঁহারা বিষ্ণুমায়ার কুদর্শনের কবল হইতে উদ্ধৃত হইয়া সুদর্শনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাঁহারা শ্রীঅর্চাবতারকে—শ্রীনামকে প্রাকৃত বস্তু জ্ঞান করেন না। তাঁহারা নায়কপূজা বা পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দেন না। বিষ্ণুর বহিরঙ্গা মায়ার কবলিত ব্যক্তিবিশেষকে ঈশ্বর বা গুরুরূপে কল্পনা করা বিচারকে ইংরাজী পরিভাষায় Onthropomorphism বলা হয়। আমরা কখনই বিষ্ণুমায়ার কবলে কবলিত জাগতিক ব্যক্তিবিশেষকে গুরু বা ঈশ্বর মনে করিয়া anthropomorphismএর আবাহন করিব না। পরব্যোম বা পরাকাশের বিচার গ্রহণ করিতে গেলে এখানকার অণু-পরমাণুসমূহ আমাদের অপ্রাকৃত রাজ্যে অভিজ্ঞানের পথে বাধা প্রদান করে। সুতরাং আমরা বস্তুর বাহ্য স্থূল দর্শন ও সূক্ষ্ম দর্শন উভয়কেই নিরাকৃত করিয়া আত্ম-দর্শনের রাজ্যে অগ্রসর হইব। নির্বিশেষবাদীর ত্রিপুটী বিনাশ—জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, এই ত্রিবিধ ব্যাপারের বিনাশ-চেষ্টা আমাদের বিচার্য্য বিষয় নহে। অপ্রাকৃত জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়—এই তিনই নিত্য।

নির্বিশেষবাদিগণ যে জড়জগতের নশ্বর ভাবোথ ত্রিপুটী বিনাশকে তাঁহাদের সিদ্ধি মনে করেন ; ইহা তাঁহাদের জগতের তিক্ত অভিজ্ঞতার ধারণা হইতে গৃহীত। তাঁহারা কল্পিত শান্তির স্বপ্ন দেখিয়া জড়-বৈচিত্র্যের বিপরীত বা প্রতিযোগী অবস্থাকেই শান্তিধাম কল্পনা করেন। জড়জগতে সবিশেষধর্ম অত্যন্ত অশান্তি ও ক্লেশ প্রদান করিতেছে। সুতরাং নির্বিশেষ তার কোন কাল্পনিক ভাব তাহাদিগকে ক্লেশের দাবানল হইতে রক্ষা করিবে—এইরূপ কল্পনায়ই তাহাদের-বিচিত্রতা বিনাশের চেষ্টা বা নির্বিশেষবাদ সৃষ্ট করে। যেমন জগতে দেখিতে পাওয়া যায়, জাগতিক দুঃখ-কষ্টে অত্যন্ত মর্স্মাহত ও জর্জরিত হইলে কেহ কেহ তিক্ত বিচিত্রতার অনুভূতিযুক্ত জীবনকে বিনাশ করিয়া অর্থাৎ আত্মহত্যা দি করিয়া শান্তির আশা করিয়া থাকে। মায়াবাদিগণের বিচারও তাহাই। তাহাদের ‘ঘটাকাশ’ ও ‘পটাকাশের’ বিচার ঐরূপ অজ্ঞতা-বিজ্ঞপ্তিত। ঘটাকাশ বা পটাকাশ কখনই মহাকাশের সহিত একীভূত হইতে পারে না, সমজাতীয়তা লাভ করিয়াও নিজ বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করে ; তবে সেই অপহৃত বৈশিষ্ট্য আমাদের বোধগম্য হয় না। স্থূলতার বিচার তাহা বিশ্লেষণ করিতে না পারিলেও সূক্ষ্ম বিচারকগণ তাহা ধরিতে পারেন। অংশ কখনই অংশী বা সমগ্র বস্তু নহে। ‘ভূতাকাশ’ ও ‘মহাকাশের’ বাগ্‌বৈখরী আমাদিগের বিমুখ বুদ্ধিমত্তাকে অধিকতর বিপথ-গামী করিয়া থাকে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত নাম, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ত্রিপুটী। ত্রিপুটী বিনষ্ট হইলে নামের আর অস্তিত্ব থাকে না—

এই বিচারে শ্রৌত বা অবতার-পথ স্বীকৃত হয় নাই। অনুমান ও শ্রুতির বিকৃত অর্থ হইতে এইরূপ তর্কপথের সৃষ্টি হইয়াছে। আমরা শ্রৌতপথে কেবলমাত্র ব্যতিরেকী বিচারই পাই না, অদ্বয় বিচারও প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাই। শ্রীনামের অনুশীলনের মধ্যে আমরা উপাদেয়তা এবং নবনবায়মান চমৎকারিতার অদ্বয়মুখী বাস্তব বিচার দেখিতে পাই। ব্রহ্মের বিচার কেবলমাত্র ব্যতিরেকী বা নেতি-নেতি বিচারের ভাব-বিশেষ। কিন্তু বিষ্ণুর বিচারে অদ্বয়-ব্যতিরেক-মুখে বেদ্য-বাস্তব বস্তুর বিচিত্রতা ও চমৎকারিতার অনুসন্ধান নিহিত।

নাম-সংকীৰ্ত্তনই সাধন এবং সাধ্য, উপায় এবং উপেয়। যাঁহারা নামসাধন ব্যতীত ইতরসাধন-প্রণালী গ্রহণ করেন, তাঁহাদের উপেয় হইতে উপায় পৃথক্। নির্বিশেষ অনুভূতি বা আত্মহত্যাই উপেয় এবং অত্যাগ্ন যে-কোন ইন্দ্রিয়তর্পণপর কল্পিত মত বা পথ তাহাদের উপায়। লক্ষ্যে উপস্থিত হইবার পরের কৃত্য—শ্রীরামানুজাচার্যের বিচারে আড়াই প্রকার রসে বিষ্ণুর সেবা মুক্ত পুরুষগণের কৃত্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। শান্ত, দাস্ত এবং গৌরব সখ্যরসে তাঁহারা শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা করেন। বিশ্বস্ত সখ্য শ্রীরামানুজাচার্যের সখ্যরসের বিচারে স্থান পায় নাই বলিয়া তদীয় সখ্যরস-বিচারকে অর্দ্ধ-বিচার-মাত্র বলা যায়। দিব্যসুরিগণ মুক্ত হইয়াও নিত্যকাল বিষ্ণুর ঐরূপ উপাসনা করিয়া থাকেন। গোলোক-নির্দাহের আড়াই প্রকার রস এবং গোলোক-পরাদ্ধের পঞ্চরসের পরিপূর্ণতা। নিম্ন হইতে সস্তম-যুক্ত সেবা ব্যতীত উপরাদ্ধস্থিত

দিক্‌টা দৃষ্টির বিষয় হয় না। কিন্তু পরাৰ্দ্ধে আরোহণ করিলে বিশ্রান্তপূর্ণ সেবার দিক্‌টা দর্শনের বিষয় হয়। সখাগণ কিরূপে পরাৎপর ভগবানের স্বন্ধের উপর পদস্থাপন করিয়া উচ্চ তাল-বৃক্ষ হইতে তালফল সংগ্রহ করেন এবং সেই তালফল ক্রমে-ক্রমে নিজেরা আশ্বাদন করিতে করিতে সর্ব্বশেষ উচ্ছিষ্ট পরম শ্রীতিভরে কৃষ্ণকে প্রদান করিতে পারেন, তাহা সম্ভ্রমযুক্ত সখ্য-রসের রসিকগণের নিকট অপরিজ্ঞাত। বালকৃষ্ণের উপাসনায় মাতা-পিতা—কৃষ্ণকে তাঁহার আবির্ভাবের সূত্র হইতেই পূর্ণ শ্রীতি-ভরে সেবা করেন। কিন্তু দাস্ত্র বা সখ্যরসে সেই ভাব পরিদর্শনের যোগ্যতার সম্ভাবনা নাই। সকল ভাবগুলিই প্রেমের বিচিত্রতা হইলেও তটস্থ বিচারে ইহাদেব তারতম্য আছে। আমাদের কোন পূর্বাচার্য্য বলিয়াছেন,—সংসার-ভয়ে ভীত ব্যক্তিগণ কেহ বেদকে, কেহ ধর্ম্মশাস্ত্রকে কেহ বা মহাভারতকে ভজনা করেন—করুন। আমি কিন্তু এই বৃন্দাবনে একমাত্র নন্দের ভজনা করি—যিনি ফোটেবের পরিপূর্ণতম বাচ্য ও বাচক শ্রীকৃষ্ণকে বারান্দায় হামাগুড়ি প্রদান করাইতে পারেন। আবার বালকৃষ্ণের উপাসনা অপেক্ষা কিশোর কৃষ্ণের উপাসনায় ব্রজবধুগণের যে শ্রীতি-পরাকাষ্ঠা দৃষ্ট হয়, তাঁহার কথা সাধারণ ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ বুঝিতে পারেন না। এজন্য আমাদের পূর্বাচার্য্য আরও বলিয়াছেন,—“এই কথা কাহাকেই বা বলিতে পারি, আর ইহাতে কাহারই বা প্রত্যয় হইবে যে, কালিন্দী-তটকুঞ্জে গোপবধু-লম্পট পরব্রহ্ম লীলা করিয়া থাকেন।” এই সকল

কথা সম্ভ্ৰম-সেবায় আসক্ত বুদ্ধির নিকট রুদ্ধ রহিয়াছে। ভগবান্ একজন, বহু নহেন; কিন্তু তিনি তাঁহার অবিচিন্ত্য শক্তিবলে লীলাবৈচিত্ৰ্য প্রকট করিয়া থাকেন। বিষ্ণুঃ স্বয়ং-রূপ অধিষ্ঠানেই কৃষ্ণ।

মুক্তপুরুষগণই অবিমিশ্ৰা ভক্তি যাজন করিতে পারেন। অমুক্ত ব্যক্তিগণের চেষ্টা অভক্তি বা মিশ্ৰ ব্যাপার। ‘মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।’ মুক্তপুরুষগণও স্বেচ্ছায় শরীর পরিগ্রহ করিয়া ভগবান্কে ভজনা করিয়া থাকেন। ভক্তির তিনটী অবস্থা—সাধনাবস্থা, ভাবাবস্থা ও প্রেমাবস্থা। শ্ৰবণ-কীর্তনাদি ভক্তির নববিধ অঙ্গ প্রথমে সাধনভক্তিতেই ক্রীয়মান হয়। শ্ৰদ্ধা-পূর্বক শ্ৰবণ-কীর্তনাদি করিতে করিতে অনর্থসকল যত হ্রাস পাইতে থাকে, ততই শ্ৰদ্ধাবৃত্তি ক্ৰমশঃ নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ও ‘স্থায়ীভাব রতি’ নামে পরিচিত হয়। শ্ৰবণ-কীর্তনাদির অনুশীলনে সেই রতি যত গাঢ় হইতে থাকে, ততই প্রেমাদি নাম ধারণ করে। ক্ৰমশঃ প্রেম-বুদ্ধিক্রমে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব পর্য্যন্ত উন্নত হয়। যেমন ইক্ষুরস যতই গাঢ় হয়, ততই প্রথমে গুড়ত্ব, পরে খণ্ডসারত্ব, শৰ্করাত্ব, সিতোপলত্ব ও উত্তম সিতাবস্থা লাভ করে। এই স্থায়ীভাবে বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী—এই চারিটী ভাব মিলিত হইলে রসোদয় হয়। কৃষ্ণভক্তি-ব্যাপারে স্থায়ীভাবে ঐ সকল সামগ্ৰীযুক্ত কৃষ্ণভক্তিরস হয়। স্থায়ীভাবই রসোদ্দীপন-কার্য্যে মুখ্য আধার। তাহার সহিত বিভাবাদি চারিটী

সামগ্রী সংযুক্ত হয়। বিভাব দুই প্রকার—আলম্বন ও উদ্দীপন। আলম্বন পুনরায় দুইপ্রকারে বিভক্ত—বিষয় ও আশ্রয়। কৃষ্ণ-ভক্তিরসে ভক্তই আশ্রয়—কৃষ্ণই বিষয় এবং কৃষ্ণের গুণসমূহই উদ্দীপন। এইভাবে ফোর্ট রস প্রকাশ করিয়া ভক্ত-ভগবানের লীলা পুষ্টি করিয়া থাকে।

নির্বিশেষবাদিগণ পরাৎপরতত্ত্বকে ক্লীবত্বে আরোপ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। চিন্ময় বিলাস-বৈচিত্র্যের অবতারণা ব্যতীত বিচারের সূচুতা কেবল ক্লীবধারণা-মাত্রে সাধিত হইতে পারে না। Old Testamentএ Jewদিগের It-Godএর ধারণা, কিম্বা মায়াবাদিদিগের ক্লীবব্রহ্মের ধারণা অথবা ভাণ্ডারকার প্রভৃতির একল বাসুদেবের বিচার—জাগতিক সম্বন্ধ ও অনুমানমূলে কল্পিত অপসাম্প্রদায়িক মতবাদ-মাত্র। ইহাপেক্ষা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে শ্রীরামানুজাচার্যের শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণের উপাসনা সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। বিষয়বিগ্রহ নারায়ণ আশ্রয়বিগ্রহ মহালক্ষ্মীর সহিত বৈকুণ্ঠে নিত্যকাল সঙ্গমরসের সেবকগণের দ্বারা সেবিত। মহালক্ষ্মী কখনও জীবকোটের অন্তর্গত নহেন। নির্বিশেষবাদের গন্ধ থাকা পর্য্যন্ত কেহ আস্তিক পদবাচ্য হইতে পারেন না। যাঁহারা বিষ্ণুর নিত্য সবিশেষবিগ্রহত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহারা কখনও আস্তিক সংজ্ঞায় অভিহিত হইতে পারেন না। বৈকুণ্ঠে শতসহস্র মহালক্ষ্মী ভগবান্ বিষ্ণুর সেবায় নিয়ত রহিয়াছেন। বৈকুণ্ঠধাম—নিত্য, বৈকুণ্ঠের সেবকগণ—নিত্য, বৈকুণ্ঠপতি এবং বৈকুণ্ঠপতির সেবকগণের নাম-রূপ-স্বরূপ-গুণ-

ক্রিয়া—সকলই নিত্য। পরাৎপরতত্ত্ব—নিঃশক্তিক নহেন। তিনি সর্বশক্তিমান, তিনি চিদচিৎ শক্তিবিশিষ্ট পরমেশ্বর। শ্রীরামানুজাচার্যের দর্শনে এইরূপ ভাবেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। গোড়ীয়-বৈষ্ণব-দর্শনে চিৎশক্তিকে আরও সুসূক্ষ্ম বিচারে অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ শক্তির মধ্যস্থা তটস্থা শক্তি বলা হইয়াছে। ইহাই এক মাত্র সিদ্ধান্ত। বৈষ্ণবধর্ম 'Cult' শব্দের বাচ্য হইতে পারে না। তাহা কোন মানব-কল্পিত সাম্প্রদায়িক মতবাদে আবদ্ধ নহে। 'অসাম্প্রদায়িক' বলিতে কুসাম্প্রদায়িকগণ যে অসাম্প্রদায়িকতার ধারণা পোষণ করেন, 'বৈষ্ণবধর্ম' তাদৃশ অসাম্প্রদায়িক নহে। শ্রীমত আন্নায়-প্রণালীতে বৈষ্ণবধর্মের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং বৈষ্ণবধর্ম সংসাম্প্রদায়িক।

গীতায় একমাত্র ভগবদ্ভক্তিকেই নিরপেক্ষ উপায় ও উপেয় বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন। কর্ম-জ্ঞান-যোগাদি উপায়ের নিরপেক্ষতা কীর্তন করেন নাই। বদ্ধদশায় কবলিত ব্যক্তি-গণের কর্ম-জ্ঞান-যোগাদিবদ্ধ চেষ্টাকে ভক্তির কৈঙ্কর্যের উদ্দেশ্যে চালিত করিয়া চরমে নির্মূল করিবার জগুই প্রথম মুখে সেই কর্ম-জ্ঞান-যোগাদিকে গৌণভাবে স্বীকার করিয়া উহাদিগের ভক্তিসঙ্গ-পক্ষত্বই সর্বথা প্রদর্শন করিয়াছেন। ভক্তিব্যতীত ঐ সকল চেষ্টার কোন সার্থকতাই নাই। শ্রীগীতা একমাত্র ভগবদ্ভক্তিরই মুখ্যতা অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তিকেই একমাত্র পরম উপায় বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন। ভক্তিকে গীতার সর্বাপেক্ষা সহজ উপায় মাত্র বলা হয় নাই—একমাত্র নিরপেক্ষ উপায়

বলা হইয়াছে। গীতা কর্মবাদের নিরাস করিতেছেন,—
 ন বুদ্ধিভেদং.....তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥ গীঃ ৩।২৬—৩০ ও
 ৯।২৭। যোগের স্বতন্ত্রতা নিরাস করিয়া বলিতেছেন,—
 তপস্বিত্যো.....(৬।৪৬-৪৭), মধ্যাসক্তমনাঃ...(৭।১) এবং
 দৈবী হ্রেষা গুণময়ী...(৭।১৪)। জ্ঞানের স্বতন্ত্রতা নিরাস-পূর্বক
 বলিতেছেন—১২।৫, ১৪।২৬-২৭ ও ১৮।৫৪ শ্লোকে। ভগব-
 ত্তন্ত্রির নিরপেক্ষতা, গুহ্যতমতা এবং সর্ব সাধন নিরাস-পূর্বক
 সর্বতোভাবে আশ্রয়নীয়তা গীতা-শাস্ত্র তারতম্যে কীর্তন
 করিয়াছেন,— ১৮।৬৫-৬৬ ও ৯।১৪, ১০।২-১০ শ্লোকে।

কর্ম-জ্ঞান-যোগ-ধ্যান-ধারণা-ধৃতি-সংযমাদি অতি আনু-
 ষঙ্গিকভাবে নামসংকীর্ণকারী পূর্ব পূর্ব জন্মেই অনুষ্ঠান
 করিয়াছেন। “যাঁহার জিহ্বাগ্রে নাম অর্থাৎ নামাভাস-মাত্র
 উদ্ভিত হইয়াছে, তিনি পূর্ব পূর্ব জন্মে বহু যজ্ঞ, কর্ম, দান,
 ব্রত, তপস্যা, জ্ঞানাভ্যাস, তীর্থে স্নান, বেদাধ্যয়ন, যোগাভ্যাস,
 সংযম—সমস্ত বহু বহু সাধনাই সম্পন্ন করিয়াছেন।” “যাঁহার
 জিহ্বায় নাম উচ্চারিত হয়, তাঁহাকে সাধারণ জাতি-সামান্যে
 দর্শন করিতে হইবে না। তিনি দৈন্যভরে আপনাকে নীচকূলে
 আবির্ভূত করাইয়া নীচকূলজাত ব্যক্তিদিগকে হরিনাম-গ্রহণের
 যোগ্যতার ভরসা প্রদানের জন্য তাঁহার মহাবদান্যতা বিস্তার
 করিতে পারেন। তিনি যে-কোন কূলে আবির্ভূত হউন না
 কেন, সকল মহাগুণ তাঁহার করতলগত—তাঁহার সেবার জন্য
 অপেক্ষায়ুক্ত !

অষ্টম ক্রম

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বলিয়াছেন যে, যাঁহারা পারমার্থিক জীবনের যোগ্যতার জন্য নিষ্কপটভাবে অনুসন্ধান করেন, তাঁহাদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীৰ্তনই একমাত্র পরম উপায়। শ্রীকৃষ্ণ-সংকীৰ্তনে পরমার্থ-জীবন-যাপনের সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগ্যতা লাভ হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাণী এইরূপ,—

“চেতোদৰ্পণমার্জনং ভব-মহাদবাগ্নি-নিৰ্বাপণম্ শ্রেয়ঃ
কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিছাবধুজীবনম্। আনন্দানুধিবর্দ্ধনং
প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং সৰ্ব্বানুস্মপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-
সংকীৰ্তনম্ ॥

ভগবদ্ভক্তির যতপ্রকার অঙ্গ আছে, তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীৰ্তনই একমাত্র প্রধানতম ও পরম প্রয়োজনীয় অঙ্গ। শ্রীকৃষ্ণ-নামের সেবা প্রকৃতপ্রস্তাবে ও সৰ্ব্বতোভাবে সাধন করিতে হইলে আমাদিগকে শ্রীনামপরায়ণ মহাজনগণের পদাঙ্কানুসরণ করিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণনামে সকল জিনিষই পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে—শ্রীকৃষ্ণনামে সৰ্ব্বশক্তি, সৰ্ব্বশোভা, সৰ্ব্ব আকাজক্ষার পরিষ্ফূর্তি এবং সৰ্ব্বসাধনের চরম-ফল ও সিদ্ধি নিহিত আছে। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ, পরিকর, ধাম, লীলার সহিত শ্রীকৃষ্ণের নাম সৰ্ব্বতোভাবে অভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণের নাম-সেবা-দ্বারাই তাঁহার স্বরূপ, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর—সকল বিষয়ই জীবের চেতনের বৃত্তিতে স্ফূটিত হইয়া প্রকাশিত হয়। অপ্রাকৃত শ্রীনামই—নামী, রূপী, গুণী,

লীলাময়রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাম শ্রীকৃষ্ণের নাম-সেবার দ্বারাই পরিপূরিত হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণের নামে আমাদের যাবতীয় ক্রিয়াভিনিবেশ, যাবতীয় প্রবৃত্তি, যাবতীয় চিন্তা, যাবতীয় ধারণা—সকলই নিয়মিত হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের নাম আমাদের জিহ্বাগ্রে উদ্ভিত হইলে আমরা নশ্বর জগতের যাবতীয় কৃত্য, কর্তব্যবুদ্ধি, নশ্বর জগৎ ভোগ করিবার প্রবৃত্তি এবং আমাদের পারিপার্শ্বিক সুবিধা-অসুবিধা প্রভৃতি সমস্তই অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে পারি। আমরা তখন আমাদের নিখিল চেষ্টাকে শ্রীকৃষ্ণের কাম-সেবায় নিযুক্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত নাম-শ্রবণ ও কীর্তন করিতে করিতে জীবন যাপন করিতে পারি।

কৃষ্ণতর বস্তুর নাম বা জাগতিক আভিধানিক শব্দসমূহ আমাদের সম্মুখে আমাদের নিত্যানন্দ লাভের পথে যে-সকল অর্গল আনিয়া দেয়, শ্রীকৃষ্ণনামেই সেই সকল অর্গলও অনায়াসে তিরোহিত হইয়া যায়। সেই শ্রীকৃষ্ণনাম আমাদের যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ, নিখিলচেষ্টা, সর্ব্বপ্রকার অভিনিবেশ, অধ্যবসায়—সকলের উপরে বিজয় লাভ করুন। সকল সাধনের শিরোদেশে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীৰ্তন নৃত্য করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ-নাম কেবল-মাত্র সাধন-ব্যাপার নহেন, তাহা সাধনের ফল সাধ্যবস্তুর বটে। এজন্য যাহাদের সর্ব্ববিধ জাগতিক তৃষ্ণা সর্ব্বতোভাবে নিবৃত্ত হইয়াছে, সেই সকল মহামুক্ত মহামহিম-গণও একায়ন পদ্ধতিতে এই শ্রীকৃষ্ণনামেরই নিরন্তর উপাসনা করেন। সমস্ত বেদের শিরোভাগ ও সারভাগ যে শ্রুতিসমূহ,

তঁাহারাও শ্রীকৃষ্ণনাম-প্রভুর নখশোভাকে নিরন্তর আরতি করিয়া থাকেন। শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু প্রমাণোদ্ধার-মুখে লিখিয়াছেন,—“যেন জন্মশতৈঃ পূর্বং বাসুদেবঃ সমর্চিতঃ। তনুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত ॥” যিনি শত শত পূর্বজন্মে সমাগ্যরূপে বাসুদেবের অর্চন করিয়াছেন, বর্তমান জন্মে তঁাহার মুখেই শ্রীহরির নামসমূহ অনুক্ষণ নৃত্য করিয়া থাকেন। শ্রী-সম্প্রদায় যে অর্চনের কথা পরমাদরের সহিত বরণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ বাসুদেবের অর্চন শত শত জন্ম করিবার পর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের দাসানুদাসগণের মুখে শ্রীকৃষ্ণ-নাম-শ্রবণ-পূর্বক তাহা অনুক্ষণ কীর্তন করিবার রতি লাভ হয়।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু আরও বলিয়াছেন,—“জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মুরারেবিরমিতনিজধর্ম্মধ্যানপূজাদিষত্সম্। কথমপি সকৃদাত্তং মুক্তিদং প্রাণিনাং যৎ পরমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে ॥” যে শ্রীকৃষ্ণনামের সেবায় বর্ণাশ্রমাди নিজ-ধর্ম্মযাজন, ধ্যান, পূজাদির চেষ্টা সহজেই বিরত হইয়া যায়, এইরূপ অপ্রাকৃত আনন্দকন্দম্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নাম পুনঃ পুনঃ জয়যুক্ত হউন। এই নাম যে-কোনরূপে গৃহীত হইলেই অর্থাৎ নামাভাস-মাত্রেই প্রাণিগণের মুক্তিদান করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ-নামই একমাত্র পরম অমৃতস্বরূপ, ইহাই জীবের জীবন—চেতনের পরম ভূষণ।

শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুও বলিয়াছেন,—“যদ্ব্রহ্ম-সাক্ষাৎ-কৃতিনিষ্ঠয়াপি বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ। অর্পৈতি নাম-

স্মরণেন তত্তে প্রারন্ধকশ্চেতি বিরোতি বেদঃ ॥” ‘অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার গ্ৰায় ব্রহ্মধ্যানের দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়াও যে প্রারন্ধ কৰ্ম ভোগ-ব্যতীত বিনষ্ট হয় না, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-নামের আভাস-মাত্রই সেই সকল প্রারন্ধ কৰ্ম অনায়াসে নিশ্চূল হইয়া যায়। ইহাই বেদ পুনঃ পুনঃ তার-স্বরে কীর্তন করিয়াছেন।’ অতএব শ্রীকৃষ্ণের নামই পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ-নামের এমনই স্বভাব যে, উহা একবার কর্ণে প্রবিষ্ট হইলে তিনি জীবের জিহ্বাকে দ্বার করিয়া স্বয়ং আপনাকে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করাইবেন। শ্রীকৃষ্ণ-নামের আবৃত্তিতে আমরা সাতপ্রকার ফল পাইয়া থাকি।

চিত্তদর্পণ মার্জ্জনঃ—আমাদের চিত্ত মুকুরের গ্ৰায় স্বচ্ছ ও বস্তু-প্রতিফলনের যোগ্যতাবিশিষ্ট হইলেও তাহা বর্তমানে জাগতিক অসংখ্য আগন্তুক ধূলিকণার দ্বারা আবৃত রহিয়াছে। আমরা আমাদের চিত্তদর্পণে অবিকৃত নিত্যবস্তুর দর্শন পাইতেছি না। আমাদের চিত্ত সর্বতোভাবে মার্জিত করা আবশ্যিক হইয়া পড়িয়াছে। এই মার্জ্জন-কার্যো কেহ কেহ অষ্টাঙ্গ-যোগাদির প্রণালী অবলম্বন করিবার পরামর্শ দিয়াছেন, কেহ বা প্রায়শ্চিত্তাদি কৰ্ম-প্রণালীর ব্যবস্থা দিয়াছেন, কেহ বা নানাপ্রকার কচ্ছুসাধ্য ব্রহ্ম-তপস্বাদির, কেহ বা জ্ঞান-চর্চাদির দ্বারা চিত্তের ধূলিরাশি বিদূরিত করিবার উপায়-সমূহ গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা সহিষ্ণু ও নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করিতে পারেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন যে, ঐ সকল প্রণালিগুলি—সকলই কৃত্রিমতা ও অসম্পূর্ণতা-দোষে ছুষ্ট।

চেতনের দৰ্পণকে নীরজীকৃত করিবার বা চেতন পর্য্যন্ত পৌঁছিবার সামর্থ্য ঐ সকল কৃত্রিম সাধন-প্রণালীর কোনটীরই নাই। প্রাণায়ামাদির দ্বারা চিত্তকে নিশ্চল করিবার প্রণালীতে চিত্ত বিষয়-মলশূন্য হয় না ; কেবল সাময়িক শুদ্ধভাব প্রকাশিত হয় মাত্র। সুতরাং ঐরূপ চিত্ত বহুক্ৰেশ, কুচ্ছ্রণ প্রভৃতির দ্বারা সাময়িক শুদ্ধভাব অবলম্বন করা সত্ত্বেও পুনরায় কোন কারণে ঈষৎ বিক্ষুব্ধ হইলেই যাবতীয় রোগ আরও দ্বিগুণতর বেগে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ করে। ঐ সকল উপায় কেবল বৃথা কালক্ষেপন করিবার হেতু মাত্র। উহার দ্বারা কখনও চিত্তের মল তিরোহিত হইতে পারে না। এই কথা শ্রীমদ্ভাগবত অসংখ্য স্থানে অসংখ্যভাবে কীর্তন করিয়াছেন,—“যমাদি-ভির্যোগপঠেঃ--(ভাঃ ১।৬।৩৬) “যুঞ্জানানামভক্তানাং” (ভাঃ ১০।৫।১৬০)। অন্তুরায়ান্ (ভাঃ ১১।১৫।৩৩)। “জ্ঞানে প্রয়াস-মুদপাস্ত্ৰ” (ভাঃ ১০।১৪।৩)। “যেহ্মেহরবিন্দাক্ষ” (ভাঃ ১।২।৩২) ইত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণনামের আভাসেই অনায়াসে চিত্তদৰ্পণের যাবতীয় মলিনতা বিনষ্ট হয়। যে-সকল আগন্তুক আবরণ আমাদিগের স্বরূপের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা নিরাকরণে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-নামের আভাসই সর্বশক্তিসম্পন্ন। স্বরূপ-নির্ণয়ের প্রশ্ন ধর্মজগতে একটি সমস্যাপূর্ণ প্রশ্নরূপে গৃহীত হইয়াছে ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব সমস্ত সমস্যার প্রহেলিকা ও বিভীষিকাকে তিরোহিত করিয়া ঐ প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। তিনি জানাইয়াছেন,—স্বরূপনির্ণয়ে সকলেই ‘কৃষ্ণদাস’।

অপ্রাকৃত কৃষ্ণনাম-কীর্তনের দ্বারা অপ্রাকৃত কামদেব কৃষ্ণের অপ্রাকৃত কামের সেবাই স্বরূপ-নির্ণয়ের ফল। কৃষ্ণনাম-সংকীর্তনে চিত্তদর্পণ পরিমার্জিত হইলে জীবের এইরূপ চেতন-স্বরূপ বিকশিত হয়।

ভবমহাদাবাগ্নি নিৰ্ব্বাপন—এই জগৎ আমা-দিগের নিকট যে তিত্ত অভিজ্ঞতা আনয়ন করিয়াছে, তাহাতে আমরা ন্যূনাধিক ঐ তিত্ত অভিজ্ঞতার হস্ত হইতে মুক্ত হইবার জন্ম কোনও না কোনরূপে ব্যগ্র। জগতের ত্রিবিধ ক্লেশে হরি-বিমুখ জীবমাত্রেই নিয়ত তপ্ত হইতেছে। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ক্লেশের কবল হইতে মুক্ত করিবার জন্ম পতঞ্জলি প্রভৃতি যে-সকল ব্যবস্থা দিয়াছেন, তদ্বারা জীবের চেতনতা-বিনাশেরই ব্যবস্থা হইয়াছে। চেতনতা-বিনাশের গ্নায় সর্বাপেক্ষা অনন্ত নিষ্ঠুর দণ্ড, ভীষণ ক্লেশ আর কি হইতে পারে? চেতনতা বিনষ্ট হইলে জীবের জীবন ধ্বংস হইল। চেতনতাই স্বাধীনতার মূল। চেতনতা বিনষ্ট হইলে স্বাধীনতাকেও যূপকাষ্ঠে বলি দেওয়া হইল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব জীবের চেতনতা বা স্বাধীনতা বিনাশের ব্যবস্থা দেন নাই। তিনি জীবের ক্লেশ-মোচনের নামে সর্বাপেক্ষা ত্রুরতা-পূর্ণ ক্লেশে ও নিষ্ঠুরতম দণ্ডে দণ্ডিত করিবার কপটতা প্রদর্শন করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন,—জীব পূর্ণচেতন শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্নাংশ, জীবের নিত্যসত্তা, নিত্যচেতনতা, নিত্য আনন্দ-সম্পদ রহিয়াছে; জীব শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তনে অভিষিক্ত হইলে তদীয় নিত্যসত্তা, নিত্য চেতনতা এবং নিত্য আনন্দের পরিপূর্ণ

বিকাশ নবনবায়মানভাবে সাধিত হইতে পারে। অল্প উপায়ে জীবের চেতনতা এবং স্বাধীনতা স্তব্ধ ও বিনষ্টই হইয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ-নামের আভাসেই আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধি-ভৌতিক ত্রিতাপ অচিরে অনায়াসেই সমূলে নিস্কূলিত হয়। শ্রীকৃষ্ণনামকীর্তনকারীই বিশ্বকে নিত্য ও পূর্ণ সুখের আগাররূপে অনুভব ও দর্শন করিতে পারেন। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তনের আভাসেই মহাদাবাগ্নিতুল্য এই সংসারানল নির্বাপিত হইতে পারে। অগ্ন্যাগ্ন যাবতীয় অভক্তি-উপায়ের আশ্রয়ে ভবমহাদাবাগ্নি কোনমতেই বিনষ্ট হয় না, অপিচ কোন না কোনভাবে লুপ্ত তুষাগ্নির গ্নায় অন্তরে দাহ্যমান থাকিয়া পরিণামে জীবের সর্বনাশ সাধন করে।

শ্রীকৃষ্ণনাম শ্রেয়ঃকুমুদবিকাশক চন্দ্রিকা বিতরণ করিয়া থাকেন,—শ্রীকৃষ্ণনামে সর্বপ্রকার শ্রেয়ঃ প্রস্ফুটিত হয়। আমরা ঋতিতে “শ্রেয়ঃ” ও “প্রেয়ঃ” এই দুইটি শব্দ গুণিতে পাই। যাহাতে আমার ইন্দ্রিয়তর্পণ নিহিত এবং যাহাতে কৃষ্ণেন্দ্রিয় তর্পণ নাই তাহাই ‘প্রেয়ঃ’, আর যাহাতে শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণের পরিপূর্ণতা এবং আমার বহিস্মুখতার আপাত অপ্রিয়তা, তাহাই শ্রেয়ঃ। যাহাদের ‘প্রেয়ঃ’ ও ‘শ্রেয়ঃ পৃথক্ নহে, তাঁহারা মুক্ত। তাঁহাদের জিহ্বাতেই শ্রীকৃষ্ণের নাম নিরন্তর নৃত্য করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্তন ব্যতীত তাঁহাদের পৃথক্ কোন প্রেয়ঃ ও শ্রেয়ঃ বিচার নাই। আমাদের বাস্তব সুখের দ্বারাই সমৃদ্ধ হওয়া উচিত। জগতে যে সুখের কল্পিত সন্ধান হয়, তাহাতে কেবল ক্লেশের

তীব্রতাকে সাময়িকভাবে হ্রাস করিবার চেষ্টা ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। কিন্তু কেবল কষ্টের সাময়িক মোচন বা কষ্টের তীব্রতা লঘুকরণ বাস্তব সুখের স্বরূপ হইতে পারে না। প্রকৃত সুখ—অবসান-রহিত, অপরিবর্তনীয় এবং নিরবচ্ছিন্ন। শ্রীকৃষ্ণনাম শ্রেয়ঃকুমুদ-বিকাশক চন্দ্রিকা বিতরণ করিয়া থাকেন। তীব্র সূর্যালোকে কুমুদের কোমলতা বিনষ্ট হয়; বিশেষতঃ সূর্যের তীব্ররশ্মি চক্ষুর পীড়াদায়ক। কিন্তু চন্দ্রের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না কুমুদ বিকাশের অনুকূল এবং ইন্দ্রিয়ের স্নিগ্ধকারক। শ্রেয়ঃকুমুদ ইতর তীব্র-সাধন-প্রণালী-দ্বারা মলিন হইয়া পড়ে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-সংকীৰ্তনের স্নিগ্ধ চন্দ্রিকায় শ্রেয়ঃকুমুদ বিকশিত ও সম্বর্দ্ধিত হয়। শ্রেয়ঃকুমুদের সহিত শ্রীকৃষ্ণ-সংকীৰ্তনের স্নিগ্ধ চন্দ্রিকার যেরূপ পরম অনুকূল সম্বন্ধ, শ্রেয়ের সহিত অপর সাধন-প্রণালীর সেরূপ সম্বন্ধ নাই। এজন্যই শ্রেয়ঃকৈরব চন্দ্রিকা-শব্দের উল্লেখ। যদিও আমাদের আলোক প্রয়োজন, তথাপি তীব্র আলোক বা তাপ প্রয়োজন নহে। অনুকূল স্নিগ্ধালোকই প্রয়োজন। ইতর সাধন-প্রণালিগুলি আলেয়ার মত আলোক-প্রদানের ছলনায়ুক্ত অথবা হরিসেবাবিমুখ কুচ্ছতার তীব্রতাপযুক্ত। উহাতে শ্রেয়ঃকুমুদ কখনই বিকশিত হয় না। পরন্তু শ্রেয়ঃ লুপ্ত হইয়া পড়ে।

শ্রীকৃষ্ণ-সংকীৰ্তন—বিদ্যাবধুর জীবন-
স্বরূপ। আমরা জ্ঞানার্জনের জগ্গ আকাঙ্ক্ষা-বিশিষ্ট।
অভিজ্ঞতার প্রণালী জাগতিক জ্ঞানার্জনের সেতু, কিন্তু এই

অভিজ্ঞতার প্রণালী নানা দোষদুষ্টি ও অসম্পূর্ণ। অভিজ্ঞতার প্রণালী-দ্বারা আমরা যে জ্ঞানার্জন করি, তাহা চিরস্থায়ী ফল প্রসব করিতে পারে না। যখন আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়, তখন আমাদের আহত প্রচুর জ্ঞান-ভাণ্ডার আমাদের আয়ত্ত থাকে না। অভিজ্ঞতার প্রণালী কিয়ৎকাল পরেই অসম্পূর্ণতা-দোষে দুষ্টি বলিয়া মনে হয়। অভিজ্ঞতার প্রণালী অবলম্বনপূর্ব্বক অর্দ্ধশতাব্দির সাধনার পর আমরা যে জ্ঞান অর্জন করি, সেই জ্ঞানভাণ্ডার শতাব্দির সাধনার পর অসম্পূর্ণ ও ভ্রমাত্মক বলিয়া দৃষ্ট হয়। কিন্তু অপরিবর্তনীয় ও সম্পূর্ণ জ্ঞান-ভাণ্ডারই সুবুদ্ধি-মান্ ব্যক্তিগণের কাম্য। যখন আমরাইগের স্বরূপ-নির্ণয় হয়, তখন আমরা উপলব্ধি করিতে পারি যে, জাগতিক অভিজ্ঞতা-দ্বারা সংগৃহীত ও সঞ্চিত শত শত শতাব্দির জ্ঞানভাণ্ডারও কত দরিদ্র, অসম্পূর্ণ ও ভ্রমাত্মক। ঐ সকল অসম্পূর্ণ জ্ঞান আমাদের কোন সাময়িক প্রয়োজন সাধন করিতে পারে, কিন্তু তাহারা কখনই আমাদের নিত্য আকাঙ্ক্ষা, নিত্যমঙ্গলসাধনে সমর্থ নহে। আমরা কেবল যদি বর্তমানের আপাত প্রয়োজনীয়তাকেই বড় মনে করি এবং তাহা পরিপূরণেই বিব্রত থাকি, তাহা হইলে আমাদেরকে ‘মল্লুয়া’ নামে অভিহিত করা কি সম্ভব? আমাদেরকে নিত্য প্রয়োজনের জন্ত মনোযোগী হইতে হইবে। আমরা আমাদের সর্ব্বশক্তি, চেষ্টা, সামর্থ্য যোগ্যতা—নিত্যপ্রয়োজনের পরিপূর্ত্তি সাধনেই নিয়োগ করিব। আমাদের চেতনের বিকাশ-সাধন

ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় চেষ্টা নশ্বর, তাহারা কিয়ৎক্ষণের জন্য আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অল্পকালের মধ্যেই আত্মগোপন করে। শ্রুতি এইগুলিকে অপরাবিদ্যা নামে অভিহিত করিয়াছেন। আত্মার অপ্রতিহতা আকাজ্জাময়ী বৃত্তিই পরা বিদ্যা। সেই পরা বিদ্যা নিখিল সদজ্ঞানের জননী। শ্রীকৃষ্ণসংকীৰ্ত্তন সেই পরাবিদ্যার জীবাতু-স্বরূপ। পূর্ণজ্ঞান একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-সংকীৰ্ত্তনে লাভ হয়। শ্রীকৃষ্ণনাম—পূর্ণতম সম্বিদ্বিগ্রহ। স্মৃতরাং ব্রহ্মজ্ঞান, পরমাত্মজ্ঞান, বাসুদেব-জ্ঞান, লক্ষ্মী-নারায়ণ-জ্ঞান, কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদকশায়ী, ক্ষিরোদকশায়ীর জ্ঞান, বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রহ্লাদ-অনিরুদ্ধের জ্ঞান, রাম-নৃসিংহাদি অবতারের জ্ঞান, বৈকুণ্ঠ ও গোলোকের যাবতীয় জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণনামেই অনুশূ্যত রহিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণনাম ব্যতীত ইতর শব্দ ইতরব্যোমে বিচরণ করিয়া বহিস্মুখ জীবের নিকট আবৃতজ্ঞান প্রকাশ করিতেছে। ঐ সকল শব্দ আমাদের কর্ণ ব্যতীত চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা ও ত্বক্—এই চারটি পরীক্ষকের পরীক্ষার পাত্রণ্ডে পরিণত হইয়াছে। ইতরব্যোম হইতে যখনই কোন শব্দ আগত হয় তখনই ঐ চারিটি পরীক্ষক ঐ শব্দের সত্যতা-নিরূপণে নিযুক্ত হইয়া থাকে; কিন্তু পরব্যোমাগত শব্দ ঐ সকল পরীক্ষকগণের অধীন নহেন। তাহার ব্যক্তিগত এমন একটি স্বতন্ত্রতা আছে, যাহা ঐ শব্দ সর্ববতোভাবে সংরক্ষণ করিয়া শব্দ-শ্রবণকারীর যাবতীয় ইন্দ্রিয়কে নিয়মিত করিয়া দিতে পারেন। ইতরব্যোমের শব্দ অপরের ভোগের জন্য কল্পিত।

কিন্তু পরব্যোমের শব্দ স্বয়ং ভোক্তা ও সর্বতত্ত্বশ্বতন্ত্র এবং পরিপূর্ণ শক্তিমান। সেই বৈকুণ্ঠ শব্দোচ্চারণই কৃষ্ণসংকীৰ্ত্তন, তাহা কৃষ্ণের সংকীৰ্ত্তন নহে। শ্রীকৃষ্ণনাম—পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণসৎ ও পূর্ণআনন্দস্বরূপ। অতএব শ্রীকৃষ্ণনামের সহিত জড়জগতের মলিনতা মিশ্রিত করিবার চেষ্টা প্রদর্শন করিতে হইবে না। কৃষ্ণনামের প্রভুত্বের বৈশিষ্ট্য আমাদিগের যাবতীয় জ্ঞানের আকরসমূহের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিবে। আমাদের ইন্দ্রিয়ের অতীত যে-সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান আছে, তাহাতে আমাদের ইন্দ্রিয়ের প্রবেশাধিকার নাই। শ্রীকৃষ্ণসংকীৰ্ত্তন ব্যতীত অন্যান্য সাধন-প্রণালিগুলি আরোহবাদের অহমিকার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু অধোক্ষজ বস্তুর সমীপে উপনীত হওয়ার প্রণালী একমাত্র শ্রীনাম-সংকীৰ্ত্তনে প্রতিষ্ঠিত। জড়মিশ্র শব্দ কখনই আমাদিগকে অধোক্ষজ শব্দের নিকট লইয়া যাইতে পারে না। যখন জড়মিশ্র শব্দের সহিত অবিমিশ্র পূর্ণসচ্চিদানন্দ শব্দের একাকার করিবার চেষ্টা প্রদর্শিত হইবে, তখন সেইরূপ অবৈধ প্রাকৃত মতবাদকে আমরা সর্বতোভাবে বর্জন করিব। অধোক্ষজ অবিমিশ্র শব্দ আমাদিগের ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়মিত, সংযমিত এবং পূর্ণ সচ্চিদানন্দের সেবার যোগ্য করিয়া তুলিবে। আমরা তখন পরা বিজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত হইব।

শ্রীকৃষ্ণসংকীৰ্ত্তন—চেতনের আনন্দাস্বাধি-
বর্ধনকারী। আমরা অনেক সময়ই কৃণিক অকিঞ্চিংকর
এবং পরিণামে হৃৎখদায়ক সুখের মায়াগুণ হইয়া পড়ি।

কিন্তু আমাদের চেতনের আকাজক্ষা সর্বদাই নিত্য, পূর্ণ, অখণ্ড চিদানন্দ-সমুদ্রের জন্ত বর্তমান রহিয়াছে। একমাত্র কৃষ্ণনামই আমাদের নিত্যানন্দসাগরের সন্ধান-প্রদান এবং আনন্দসাগরে নিমজ্জিত করাইতে পারেন অথ সাধন-প্রণালী বাস্তব আনন্দ-প্রদানে অসমর্থ। ইতর সাধনের দ্বারা সাময়িক দুঃখনিবৃত্তি বা দুঃখের স্তব্ধ ভাবমাত্র আমাদের নিকট উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু কেবল স্তব্ধভাব বাস্তবতার পর্য্যায় পরিগণিত হইতে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণনাম আমাদের প্রতি পদে পূর্ণ অমৃতের আশ্রয় প্রদান করাইয়া থাকেন। অমৃত কঠিন বস্তু নহে; তাহা তরল, সুস্বাদু, সঞ্জীবক ও অমরত্ব-সাধক। শ্রীকৃষ্ণনাম—অখিলরসময়। শ্রীকৃষ্ণনামে পঞ্চবিধ মুখ্য চিন্ময়রস ও সপ্তবিধ আগন্তুক গোণ-চিন্ময়রস পরিপূর্ণ-মাত্রায় রহিয়াছে। জাগতিক অভিধানগত নাম বিরস ও কুরস বহন করিয়া থাকে। এমন কি, ব্রহ্ম পরমাত্মা, নারায়ণাদি নামেও অখিল চিদ্রস নাই। ঐ সকল অসম্যক, আংশিক ও তটস্থ-বিচারে অখিলরসের ন্যূনতা-জ্ঞাপক। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণনামরস শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের হ্রায় অখিলরস-বিগ্রহ। শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ রসের এইরূপ সংজ্ঞা দিয়াছেন :—
‘ব্যতীত্য ভাবনাবজ্ঞা যশ্চমৎকার ভারভূঃ। হৃদি সন্তোজ্জলে
বাঢ়ে স্বদতে স রসো মতঃ ॥’ প্রাকৃত ভাবনার পথ বা তথাকথিত আধ্যাত্মিক ভাবনার পথ অতিক্রম-পূর্বক অপ্রাকৃত চমৎকারাত্ম্যের আধার-স্বরূপ যে স্থায়িত্ব গুণ, সত্ত্ব,

পরিমার্জিত উজ্জ্বল হৃদয়ে আশ্বাদিত হয়, তাহাই 'রস' বলিয়া বিবেচিত। রস—আশ্বাদনের বস্তু। সেই আশ্বাদন—চিদাশ্বাদন; চিদাশ্বাদন তখনই সম্ভব, যখন আমরা জাগতিক আবর্জনাগুলি সম্পূর্ণভাবে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারি। যখন আমরা শ্রীগুরু-কৃপায় আবর্জনা বা অবরণ-মুক্ত হই, তখনই অখিলরসামৃতবিগ্রহ শ্রীনাম আমাদিগের নির্মূল চেতন-স্বরূপে তাঁহার অপ্রাকৃত রসময় স্বরূপ প্রকটিত করেন। আমরা তখন অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার স্থায় অপ্রাকৃত নামরস আশ্বাদন করিয়া শ্রীনাম-প্রভুর উদ্ভিয়তর্পণ করিতে পারি। আয়েন্দ্রিয়-তর্পণ-ব্যাপারটি—আশ্বাদন নহে, তাহা 'ভোগ' বা 'কাম'। অপ্রাকৃত নামপ্রভু জীবের কাম সহ করেন না। যাহারা আয়েন্দ্রিয়-তর্পণকে 'আশ্বাদন' বলিয়া মনে করে, তাহাদের নিকট অপ্রাকৃত রসনিকেতন শ্রীনাম তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করেন না। তাহারা নামাপরাধকেই 'নাম' মনে করিয়া মনঃক্লান্ত বিকৃত রসের দ্বারা বিক্লিপ্ত হইয়া পড়ে।

শ্রীকৃষ্ণ-সংকীৰ্তনের সন্তোষ ফল-সর্ব্বাঙ্গ-অন্নপন। শ্রীকৃষ্ণ-সংকীৰ্তনই সর্ব্বাঙ্গদ্বারা অপ্রাকৃত কামদেবের সেবার উপায় ও উপায়। ব্রজবধূগণ—ব্রজবধু শিরোমণি শ্রীবার্ধভানবী সর্ব্বাঙ্গ-দ্বারা অখিলরসামৃতমূর্তি শ্রীনন্দনন্দনের যে অপ্রাকৃত কামসেবা করেন, সেই অপ্রাকৃত কামসেবা যাহারা ব্রজবধূগণের আনুগত্যে লালনা করেন, শ্রীকৃষ্ণ-সংকীৰ্তন তাহাদেরই মুখ্যসাধন ও সাধ্য। শ্রীকৃষ্ণ-সংকীৰ্তনে তাহাদের সর্ব্বাঙ্গঅন্নপন বা সর্ব্বাঙ্গা-দ্বারা শ্রীকাম-

দেবের ইন্দ্রিয়-তর্পণ সুষ্ঠুরূপে সাধিত হয়। কৃষ্ণকামসেবারসামৃতসিদ্ধিতে, যাঁহার সর্ব্বাত্মস্নপিত হইয়াছে, সেই মুকুন্দ-প্রার্থা বার্ষভানবীর কুণ্ডে সর্ব্বাত্মস্নপন যাঁহারা আকাজক্ষা করেন, তাঁহারা শ্রীনাম-সংকীৰ্ত্তনকেই একমাত্র সাধনরূপে বরণ করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ-সংকীৰ্ত্তন ব্যতীত পৃথগ্ভাবে স্মরণ-প্রযত্নাদি দ্বারা শ্রীবার্ষভানবীর কুণ্ডে এবং অখিলরসামৃত সিদ্ধিতে কাহারও সর্ব্বাত্মস্নপন হয় না। পৃথগ্ভাবে স্মরণ প্রযত্নাদি—প্রতিষ্ঠাকাজ্জফায়ুক্ত কৃত্রিম ও আনুকরণিক অবৈধ চেষ্টা-মাত্র। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-সংকীৰ্ত্তনেই সর্ব্বাত্মা স্নপিত হয়। সর্ব্বাত্মস্নপনসিদ্ধিতে কেবলমাত্র সন্তম-বিচারে নাভির উদ্ধর্দেশ হইতে শিরোদেশ পর্য্যন্ত উত্তমাস্ত্রের দ্বারাই ভগবানের সেবা চেষ্টা প্রদর্শিত হয় না। নাভির নিম্ন হইতে পদনখ পর্য্যন্ত সর্ব্বচিদঙ্গ-দ্বারা অর্থাৎ সর্ব্বাত্মা-দ্বারা অপ্রকৃত কামদেবের অপ্রাকৃত কামসেবায় যোগ্যতা লাভ হয়।

শ্রীকৃষ্ণনামের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণই আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকার সুযোগ প্রদান করিবে। আমরা সেই একমাত্র উপায় ও উপেয়কেই গ্রহণ করিব। তাহার কারণ, স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব কীৰ্ত্তন করিয়াছেন,—“নান্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-স্তত্রাপিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ। এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মাপি দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥” ভগবানের নিজ সর্ব্বশক্তি অপ্রাকৃত ভগবন্যামেই নিহিত রহিয়াছে। “নিজশক্তি” বলায় তাঁহার বহিরঙ্গা মায়া শক্তি বা ক্রিয়া অপ্রাকৃত শ্রীনামে নাই, ইহাই স্মৃতি হইতেছে। কৃষ্ণের

নিজস্ব যতকিছু শক্তি, তাহা অপ্রাকৃত নামে পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত। সুতরাং পূজা-ধ্যানাদির জন্ম শ্রীনামগ্রহণকারীর পৃথক্ প্রযত্ন নাই। শ্রীহরি-নামে স্থান, কাল, পাত্রেরও বিচার নাই। পূজা, ধ্যান প্রভৃতি সাধনের স্থান, কাল, পাত্রের বিচার রহিয়াছে। যে পরম উপায় ও উপেয়ের স্থান-কাল-পাত্রের বিচার নাই, তাঁহাকে স্থান-কাল-পাত্রের বিচারাধীন অগ্ন্যাগ্ন সাধনের সহিত সমপর্যায়ে গণিত করা ছুর্দেবের লক্ষণ। অপ্রাকৃত নামকে ইতরসাধনের দ্বারা সম্পূর্ণ (?) করিবার চেষ্টাও ছুর্দেবের অগ্ন্যতম চিহ্ন। অপ্রাকৃত নামকে প্রাকৃত শব্দের সহিত সমজ্ঞান-পূর্ব্বক অগ্ন্যাগ্ন কৰ্ম্মাডম্বর, জ্ঞানাডম্বর, যোগাডম্বর ও ব্রতাডম্বরের জন্ম আগ্রহও ছুর্দেবের লক্ষণ।

কৃষ্ণ—অখিল রসামৃতমূর্ত্তি; পঞ্চমুখ্যরস ও তাহাদের পরিপোষক সপ্ত আগন্তুক গোণ-রস কৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়াই পূর্ণরূপে অবস্থিত। এই জড়জগতেও নশ্বর জড়ীয় সম্বন্ধে ঐ সকল রসের হয়ে প্রতিফলন দৃষ্ট হয়। প্রাকৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রেও এই সকল রসের আলোচনা শ্রুত হয়। আমাদের প্রত্যেকেই উক্ত মুখ্য পঞ্চ রসের কোন না কোন একটীতে অপরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। যেখানে জাগতিক সম্বন্ধ, সেখানেই বিশ্রান্ত-বিচার হয়তা সংশ্লিষ্ট করিবে। কিন্তু যেখানে প্রাকৃত সম্বন্ধের বা প্রাকৃত বিষয়-আশ্রয়ের সমাবেশ নাই, যেখানে প্রাকৃত বিভাব, অনুভাবাদি সামগ্রীর কোন প্রসঙ্গ নাই, যেখানে অস্থায়ীভাব বা বিরতি

নাই, সেখানে কখনই হয় রসের প্রসঙ্গ উত্থাপিতই হইতে পারে না। বিশ্বে যে বস্তু যত উন্নত, প্রতিবিশ্বে সেই বস্তুই তত অবনত। বিশ্বে যে বস্তু যত উপাদেয় ও চমৎকার, প্রতিবিশ্বে সেই বস্তুই তত অনুপাদেয় ও অশোভন। সুতরাং স্বরাট লীলা-পুরুষোত্তমের সহিত যেখানে সম্বন্ধ, সেখানে বিকৃত প্রতিবিশ্বজাত কোন হয় রসের প্রসঙ্গ নাই। বিকৃত প্রতিফলিত প্রতিবিশ্বে যাহা অত্যন্ত অবনত, তাহাই অবিকৃত অপ্রাকৃত বিশ্বে উন্নত উজ্জলরূপে সম্প্রকাশিত। যদি প্রাকৃত সম্বন্ধে পঞ্চবিধ রসের অস্তিত্ব দৃষ্ট হয়, তবে অপ্রাকৃত সম্বন্ধে মাত্র আড়াই প্রকার সম্বন্ধ স্বীকার করিলে অপ্রাকৃতের বিচিত্রতা অপেক্ষা প্রাকৃতের বিচিত্রতার সংখ্যাধিক্য মানিয়া লইতে হয়। কিন্তু ইহা শ্রুতির বিরুদ্ধ কথা। অথগু, অনন্ত, নিত্য নবনবায়মান অপ্রাকৃত বৈচিত্র্যের খণ্ড, শান্ত, অনিত্য, একঘেয়ে প্রতিফলন মাত্র—প্রাকৃত বৈচিত্র্য। বিশ্বে যাহা নাই, প্রতিবিশ্বে তাহা প্রতিফলিত হইতে পারে না। বিশ্বে যাহা আছে, প্রতিবিশ্বে তাহাই বিকৃতরূপে প্রতিফলিত হয়, ইহাই নিত্যসিদ্ধ সত্য। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব জানাইয়াছেন যে, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণনামোচ্চারণের দ্বারাই অখিল রসামৃত-মুক্তি নামীর রসসিদ্ধিতে সর্ব্বাঙ্গস্নপন হয়।

আমাদিগকে অবিমিশ্র চেতনের সংস্পর্শ ও সন্ধান লাভ করিতে হইবে—যে চেতনের জগতের সহিত কোন মিশ্রন নাই—যে চেতন আবরণ-রহিত হইয়া তাঁহার নিত্যসিদ্ধা বৃত্তিতে জাগরুক আছেন—যে চেতন বিশ্রান্তভাবে পূর্ণ চেতনের

পূর্ণসেবায় তৎপর হইয়াছেন; কিন্তু যদি কেবল আমরা কৃত্রিম অনুকরণপ্রিয় হই, তবে কোন দিনই মঙ্গলের পথে আরুঢ় হইতে পারিব না। যাঁহাদের সার্বকালিকী সৰ্ব্বাঙ্গময়ী চেষ্টা পূর্ণতম চেতনের সুখতাৎপর্য্যে অবিচ্ছিন্ন-অহৈতুকভাবে নিযুক্ত, তাঁহাদের অনুসরণের দ্বারাই মঙ্গল লাভ হইবে। অপ্রাকৃত রস ভাবনার পথ মনকে অতিক্রম-পূর্ব্বক শুদ্ধ-সত্ত্বোজ্জ্বল চেতনে চমৎকারাতিশয়ের ভাণ্ডারস্বরূপ স্থায়ী ভাব-রূপে সঞ্চারিত হয়। তাহা কৃত্রিমতা বা অনুকরণের দ্বারা লাভ করা যায় না। অনুকরণকারী বিনাশপ্রাপ্ত হয়। আত্মাকে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারের সহিত একাকার করিয়া ফেলিতে হইবে না। পাশ্চাত্য দেশের অনেকেই এবং ভারতীয় কৰ্ম্মজড়-সম্প্রদায়ের অনেকে মনকে আত্মার সহিত একাকার করিয়াছেন, নির্ভেদজ্ঞানী আবার মন হইতে চেতনকে পৃথক্ করিতে গিয়া আত্মার অস্তিত্বই একেবারে অস্বীকার করিয়া ফেলিয়াছেন।

জীব—সনাতন অর্থাৎ নিত্য। মুক্ত দশায় জীব সম্পূর্ণরূপে ভগবদাশ্রিত ও প্রকৃতি-সম্বন্ধশূন্য। বদ্ধদশায় জীব স্থায়ী উপাধিরূপ প্রকৃতিস্থিত মন ও পঞ্চ বাহেन्द्रিয়—এই ছয়টি ইन्द्रিয়কে স্বকীয় তত্ত্ববোধে আকর্ষণ করিয়া থাকে। আমাদের স্বরূপ-নির্ণয় হইলে অর্থাৎ আমরা যে পূর্ণ চেতনের বিভিন্নাংশ, ইহা উপলব্ধি হইলে আমাদের অবস্থান অটুট হয়। তখন আমরা আমাদের নিত্য জীবনের পথে অগ্রসর হইতে পারি।

শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু জগৎকে আশীর্বাদ করিয়া বলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অনপিতচরী বাণী প্রতি-চেতনে সঞ্চরিত হইল, প্রত্যেক ভগবন্তের হৃদয়ে শ্রীচৈতন্য-বাণী স্বরাজ্য-সিংহাসন লাভ করুন। এতদিন শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী লোকে সুষ্ঠুরূপে তাঁহাদের পূর্ণতমা বৃত্তিতে বৃষ্টিতে পারিতেন না, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের বাণীতে ভাগবতী বাণীর মুক্তপ্রগ্রহবৃত্তি—স্ফোটের পূর্ণতম-বিদ্বদ্ভাটিবৃত্তি প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব জীব-হৃদয়ে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিয়া বলিয়াছেন, সমস্ত প্রাকৃত বিচারের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া একমাত্র উদ্বুদ্ধ নির্মল চেতনস্বরূপের অপ্রাকৃত সহজ-প্রীতিময় সর্ব্বাঙ্গীন ভজনের দ্বারাই অখিলরসামৃত-মূর্ত্তির নিকটতম প্রদেশে যাইতে হইবে। অপ্রাকৃত রাজ্যে প্রাকৃত রাজ্যের চিন্তাশ্রোত বা আনুমান বহন করিয়া লইয়া যাইতে হইবে না। নতুবা আস্তিকতার প্রথম সোপানের দ্বারেও প্রবেশাধিকার পাওয়া যাইবে না। যখন দণ্ডকারণ্যবাসী ষষ্টিসহস্র ঋষি শ্রীরামচন্দ্রের রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার আলিঙ্গন-কামনা করিয়াছিলেন, তখন শ্রীরামচন্দ্র তাঁহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণ-লীলার জন্ম অপেক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন। ইহা হইতেও জানা যায় যে, সর্ব্বপ্রকার নৈতিক উপদেশ জগতের গণ্ডিমধ্যেই আবদ্ধ রহিয়াছে। অপ্রাকৃত চেতনরাজ্যে প্রাকৃত নীতি ও দুর্নীতির স্থান নাই। দুর্নৈতিক তাহার পশুত্ব-ভাব লইয়া ধর্ম্মরাজ্যের—পরমার্থ-রাজ্যের দ্বারেই প্রবেশ করিতে পারে না। দণ্ডকারণ্য-বাসী ঋষিগণ তাঁহাদের মাতা-পিতা হইতে যে শরীর লাভ

করিয়াছিলেন, ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র তাহা গ্রহণ করিলেন না। পূর্ণচেতন পরমেশ্বর-বস্তু প্রাকৃত পুরুষ ও প্রাকৃত স্ত্রী-দেহ আকাজক্ষা করেন না। দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিগণ ‘স্ত্রীভেক’ গ্রহণ করিতে পারিতেন, স্ত্রী-সজ্জায় সজ্জিত হইতে পারিতেন, কিন্তু ঐরূপ কৃত্রিমতা-দ্বারা কখনও পূর্ণচেতনের শ্রীতির সঞ্চার হইতে পারে না। ভগবান্ অপ্রাকৃত বস্তু—পূর্ণচেতনবস্তু—অপ্রাকৃত চেতন জীবের অপ্রাকৃত শ্রীতিময়ী সেবায়ই তাঁহার আদর। অক্ষজ কখনও অধোক্ষজের শ্রীতির বা আকর্ষণের বস্তু হইতে পারে না। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণনাম অধোক্ষজ বস্তু। “অধঃকৃতং অক্ষজং বদ্ধজীবানাং ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানং যেন স এব অধোক্ষজঃ।” যিনি বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়জ্ঞান বা ইন্দ্রিয়-তর্পণ সর্বতোভাবে নিরস্ত করেন, তিনিই ‘অধোক্ষজ’ বাস্তব বস্তু।

ইন্দ্রিয়-সমূহ বহির্জগতের কার্যোপযোগী করণবিশেষ। তাহাদের গতির নির্দিষ্ট সীমা আছে। বহিস্মুখিনী ইন্দ্রিয়-বৃত্তি কখনও অপ্রাকৃত সন্ধান করিতে পারে না। বহিস্মুখিনী মেধার দ্বারা যাহা চিন্তনীয় বিষয় হয়, যাহা ধ্যান করা যায়, যাহা স্থির-সিদ্ধান্ত করা যায়, তাহা সকলই প্রাকৃত—মনোধর্ম-বিশেষ। একমাত্র অপ্রাকৃতের চরণে সর্বতোভাবে আত্ম-সমর্পণই ইন্দ্রিয়কে উন্মুখ করিবার উপায়। সেইরূপ সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ে অপ্রাকৃত শ্রীনাম স্বয়ংই স্ফূর্তিপ্ৰাপ্ত হন এবং সেবোন্মুখতার বিকাশের সঙ্গে-সঙ্গে অপ্রাকৃত শ্রীনাম তাঁহার অপ্রাকৃত রূপ, অপ্রাকৃত গুণ, অপ্রাকৃত পরিকর ও অপ্রাকৃত

লীলাসমূহ প্রকাশিত করিয়া থাকেন। যাবতীয় জাগতিক সিদ্ধান্ত-সঙ্গতি অপ্রাকৃত রাজ্যে প্রবেশের মহা বিঘ্ন-স্বরূপ হয়। জাগতিক ধারণা, শ্রায়, সিদ্ধান্ত প্রভৃতিকে অপ্রাকৃত রাজ্যে চালনা করার নামই—তর্কপথ। আর অপ্রাকৃত কথার অবতরণ হইলে তাহাতে কর্ণ-নিয়োগ করা এবং ঐরূপ সেবোন্মুখতার দ্বারা অর্থাৎ প্রণিপাত্ত, পরিপ্রশ্ন ও সেবারুত্তির সহিত অপ্রাকৃত রাজ্যের বার্তার অনুসন্ধান করাই শ্রৌতপথ। শ্রীমন্নহাপ্রভু জানাইয়াছেন,—“দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান, সব—মনোধর্ম। এই ভাল, এই মন্দ—এই সব ভ্রম॥” দ্বিতীয় অভিনিবেশের রাজ্যে—বহিস্মুখ ইন্দ্রিয়ের বিচারপথে যাহা ভাল বা মন্দ বিচার করা যায়, তাহা সকলই মনোধর্ম। এই জড়জগতে আমরা সকল বস্তুকেই সম্ভ্রমযুক্ত আধারে স্থাপন করিয়া তাহাদের শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণ করি, কাজেই যখন আমরা দেখি সেই সম্ভ্রমযুক্ত অবস্থা অতিক্রম করিয়া বিশ্রম-ভাবের অবতারণা হয়, তখনই আমরা তাহাতে শ্রেষ্ঠত্বের বিচার রক্ষা করিতে পারি না; মনে করি, অপ্রাকৃতবস্তুও বোধ হয় সম্ভ্রমতা-রহিত হওয়ায় শ্রেষ্ঠত্বের পদবী হইতে বিচ্যুত হইলেন। যাবতীয় কুণ্ঠধর্ম নিরস্ত বৈকুণ্ঠ কখনই জাগতিক ধারণা ও ধৃতির কবলে কবলিত হইতে পারেন না। জাগতিক তৃতীয়-মানের রাজ্যের অন্তর্গত ধারণা চতুর্থমানের ধারণাকে আক্রমণ করিতে পারে না। যাঁহারা বৈকুণ্ঠ-বিচিত্রতা স্বীকার করেন না, তাহারা নাস্তিক কপিল ও বৌদ্ধের পতাকাবাহক।

পরব্রহ্ম নিত্যশক্তিয়ুক্ত। তাঁহার শক্তির বিচিত্রতা আছে।

তিনি পুরুষোত্তম। বিষ্ণুতেই পূর্ণ বাস্তব জ্ঞান বিরাজিত তাঁহাকে পূর্ণতম প্রতীতির শ্রীতিময়ী উপাসনা ব্যতীত গতান্তর নাই। শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী কোন দেশগত, জাতিগত, সমাজগত বা কালগত নহে। তাহা সকল দেশের, সকল কালের, সকল চেতনের জন্ম একমাত্র অমোঘ কল্যাণকর। এই বাণী-শ্রবণে অনুক্ষণ কোটী ইন্দ্রিয় নিযুক্ত করা আবশ্যিক। তদ্বারা অপ্রাকৃত শ্রীনামেই সর্ব্বশক্তি, সর্ব্বসৌন্দর্য্য ও সর্ব্বচিদ্বিলাস দর্শন করিতে পাইব। ছুর্দেব-বশতঃ মনোধর্ম্মে ধাবিত বলিয়াই একমাত্র অপ্রাকৃত নামে সর্ব্বসিদ্ধি সন্নিহিত থাকিলেও সেই প্রচুর কৃপার ভাণ্ডার পরিত্যাগ করিয়া আমরা অশ্রান্ত কল্পিত নম্বর মন্দোদয়-দয় সাধন ও সিদ্ধির আকাঙ্ক্ষা করি।

শ্রীমন্মহাপ্রভু “তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।” শ্লোকে শ্রীনাম-গ্রহণের বা হরিকীর্ত্তনের প্রণালী বর্ণন করিয়াছেন। বাদবায়ণ-সূত্রের একমাত্র ব্যাখ্যা—সমস্ত শ্রুতির একমাত্র ব্যাখ্যা—ভাগবতের একমাত্র ব্যাখ্যা—“তৃণাদপি সুনীচ” শ্লোক ; অথবা “তৃণাদপি সুনীচ” শ্লোকের যদি ভাষ্য ও টীকা হয়, তাহা হইলে সমস্ত উপনিষদ, সমস্ত সূত্র এবং শ্রীমদ্ভাগবত ঐ শ্লোকেরই ব্যাখ্যাস্বরূপ হইতে পারে।” তৃণাদপি শ্লোকার্থ বৃষ্টিতে হইলে বৈষ্ণব গুরুর চরণে প্রপন্ন হইতে হইবে। বাহিরে কৃত্রিম আঁকুপাঁকু-ভাব, শরীরের ও চেহারার ভঙ্গি এবং অন্তরে নিজেকে ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, গোস্বামী প্রভৃতি আখ্যায় ভূষিত করিবার জন্ম লালায়িত

থাকা ; এইরূপ কপট দৈগ্ধের কস্মরতকে কখনই ‘তৃণাদপি সুনীচতা’ বলা যাইতে পারে না। তৃণ জগতের যাবতীয় বস্তু হইতে নীচ। গো, গর্দভ, কুকুরাদি জন্তু পর্য্যন্ত তৃণের উপর পদক্ষেপে উহাকে বিমর্দিত করিয়া চলিয়া যায়। কিন্তু তৃণের তাহাতে ভ্রক্ষেপও নাই। নামভজনকারীর সেই তৃণ হইতেও সুনীচ হইতে হইবে। অর্থাৎ প্রাকৃত জগতের অতিনীচ বস্তুর অভিমানও ত্যাগ করিতে হইবে। যথা, ভাঃ ১১।২৮।৪—“কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্বৈতস্যাবস্তনঃ কিয়ৎ । বাচোদিতং তদনৃতং মনসা ধ্যাতেমেব চ ॥” দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র জ্ঞান সব মনোধর্ম্ম। এই ভাল, এই মন্দ, এই সব ভ্রম ॥ চৈঃ চঃ ॥ অর্থাৎ যেখানে অদ্বয়জ্ঞান বাধা প্রাপ্ত হইয়া দ্বিতীয় বস্তু মায়ার প্রতীতি উপস্থিত হইয়াছে, সেখানে ভাল, মন্দ, ছোট, বড় যাহা কিছু সব ভুল। যেমন স্বপ্নমধ্যে রাজা হওয়া ও কুটীরবাসী দরিদ্র বলিয়া অনুভব করা একই প্রকারের অমূলক কল্পনা। উভয়ই সমান। তদ্রূপ প্রাকৃত জগতের বস্তুজ্ঞানে নিজকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বর্ণ বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য বা ঐশ্বর্য্যবান্ মনে করা কিংবা নিজকে নিকৃষ্ট শূদ্রাদিবর্ণে অভিমান করা একই কথা। যিনি তৃণাদপি সুনীচ তিনি নিজকে ইহ জগতের বা চতুর্দশ ভুবনের কোনও প্রাকৃত জীব জ্ঞান করেন না। তিনি নিষ্কিঞ্চন অর্থাৎ তাঁহার উক্ত চতুর্বিধ অভিমানের কোনও একটীও তাঁহার হৃদয়ে নাই। নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব সর্ব্বোচ্চ ব্রাহ্মণবর্ণে শোভিত থাকিয়াও জন্মাদি অভিমান-রহিত। নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবের অভিমান এই—

“নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো নাহং বর্নো
ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা । কিন্তু প্রোত্নিখিলপরমানন্দ-
পূর্ণায়তাক্কের্গোপীতর্ভুঃ পাদকমলয়োদাস-দাসানুদাসঃ ॥” অর্থাৎ
আমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ
বা সন্ন্যাসী বর্ণ বা আশ্রমের অন্তর্গত কেহই নহি । আমি
একমাত্র পরমানন্দসাগর গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস-
গণের অনুদাস ।

যিনি জন্ম কর্ম বা বর্ণাশ্রম জাতি প্রভৃতি দ্বারা দেহে
অহংভাব সম্পন্ন নহেন তিনিই হরির প্রিয় । (ভাঃ ১১।২।৫০)
তুণাদপি শ্লোকে সম্বন্ধজ্ঞান-বিশিষ্ট হইয়া অভিধেয় হরিকীর্তনের
প্রণালী উপদিষ্ট হইয়াছে । চৈঃ চঃ সনাতন শিক্ষায়,—“জীবের
'স্বরূপ' হয় কৃষ্ণের 'নিত্যদাস' । কৃষ্ণের 'তটস্থা শক্তি' 'ভেদাভেদ-
প্রকাশ' ॥ ইহাতে সম্বন্ধ জ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে । সেই
সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত হইয়া অর্থাৎ নিজকে প্রাকৃত জগতের কোনও
ক্ষুদ্রতম বস্তুর অভিমানও না রাখিয়া অপ্রাকৃত নিত্যবাস্তব-বস্তু
ভগবানের নিত্যদাসানুদাস অভিমানে হরিকীর্তন করিবার
উপদেশ প্রদান করিয়াছেন । শিক্ষাষ্টকের পঞ্চম শ্লোকে—
“কুপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয়” অর্থাৎ জীবের
স্বরূপ বিভ্রান্ত অবস্থায় জীব নিজকে ইহ জগতের মধ্যে ব্রহ্মা
হইতে তুণ পর্য্যন্ত কোনও না কোনও একটা বস্তুর অভিমানে
ব্যস্ত, কিন্তু ভগবানের কুপায় অবিচা বিদূরিত হইলে জীব
নিজকে বিভূচিৎ ভগবানের পাদপদ্ম-স্থিত ধূলী অর্থাৎ তদীয়
বস্তু বা বিভিন্নাংশ চিৎকণ জীব বলিয়া উপলব্ধি করেন ।

তখনই জীব “তৃণাদপি সুনীচ” হন এবং সর্বদা ভগবৎ পাদ-পদ্মে স্থিত হইয়া সর্বদা হরিকীর্তনের যোগ্যতা লাভ করেন।

সংকুলে জন্ম, ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য ও সৌন্দর্য্যদ্বারা যে সকল পুরুষের প্রাকৃত অহঙ্কার বদ্ধিত হইয়াছে তাহাদের মুখে শ্রীহরিনাম কীর্তিত হন না, কারণ হরিকীর্তন একমাত্র অকিঞ্চনগণেরই গোচরীভূত। “তৃণাদপি” শ্লোক দ্বারা পদ্ম-পুরাণোক্ত দশবিধ নামাপরাধ নিরস্ত হইয়াছে। হরিনাম মুক্তকুলের উপাস্ত্র বস্তু, অকিঞ্চনগণের একমাত্র বিত্ত, পরম-নির্ম্মৎসর সাধুগণের সর্ববিধ কৈতব-বিনিমুক্ত পরমধর্ম্মসম্পদ সুতরাং উহা কপট ভোক্তা বা কপট দৈশ্যযুক্ত ব্যক্তির অধিগম্য নহে। সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত জড়ীয় ছোট বড় যাবতীয় অভিমান নিম্মুক্ত, ভগবানের অনন্ত শরণাগত পুরুষই তৃণাদপি সুনীচ, তিনিই একমাত্র সতত নাম ভজনকারী বৈষ্ণব, বৃক্ষ অপেক্ষা সহগুণ সম্পন্ন, জড় প্রতিষ্ঠায় উদাসীন এবং অপরের প্রতি মানদ।

শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের বাইশ বাজারে প্রহার তরু অপেক্ষা সহনশীলতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বৃক্ষগণ জড়ধর্ম্ম প্রযুক্ত সহ করিতে বাধ্য। কিন্তু সম্প্রস্কুটিত চেতনে এই প্রকার সহন-শীলতা শ্রীনামপ্রভুর কৃপাব্যতীত সম্ভবপর নহে। জাগতিক কোন প্রকার ক্লেশ শ্রীনামপ্রভুর সেবা হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই। “খণ্ড ঋণ যদি হই যায় দেহ-প্রাণ। তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম।” এই উক্তি দ্বারা শ্রীনামভজনে নিষ্ঠার জন্য সহনশীলতা প্রকাশ করিতেছে।

জাগতিক কোন প্রকার সম্মান বা জ্ঞানলাভের পিপাসা থাকিলে জড়ীয়সাধনে ও জড়ীয়বস্তু সংগ্রহের জন্ম বাস্তু থাকিতে হয়। যাঁহার জড়জগতের রহিরঙ্গা মায়াকৃত কোন বস্তু বা সম্পত্তি লাভের আশা থাকে অথবা মায়িক কোন প্রকার কর্তব্য আছে বলিয়া জ্ঞান থাকে ততদিন তাহার অপ্রাকৃত-সাধন—নামভজনের অধিকার হয় না। অতএব নাম ভজনকারী অমানী।

শ্রীনাম ভজনকারী মানদ—কারণ স্বাভাবিক দৈন্ত্য বশতঃ জগতের সকলকে শ্রেষ্ঠ দর্শন করেন—শ্রীহরির সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট ও সেবকজ্ঞানে সম্মান করিয়া থাকেন। “তৃণাদপি সুনীচ” শ্লোকে মধ্যমাধিকারী ভক্তের ও কীর্তনে অধিকার লাভের কথা উপদিষ্ট হইয়াছে। কনিষ্ঠাধিকারী প্রাকৃত ভক্ত, স্বরূপোপলব্ধি না হওয়াতে তাঁহার ভক্তজনে পূজ্য-বুদ্ধি উদ্ভিত হয় নাই। সুতরাং তিনি নামভজনে অধিকারী হইতে পারেন নাই। কিন্তু মধ্যমাধিকারীর স্বরূপ-জ্ঞানোদয় হইয়াছে, তিনি ভগবানের সেবা, ভক্তের প্রতি মৈত্রী, অতত্ত্বজ্ঞ বালিশ-জনে’ হরিকথা উপদেশ দানরূপ কৃপা, বিদেবী জনে উপেক্ষাদি করিতেছেন। তিনি নিজের ভোক্তার অভিমান দূর করিয়া সেবা ও সেবকের প্রতি নিষ্ঠা-বিশিষ্ট। আর মহাভাগবত বা উত্তমাধিকারী অকিঞ্চন। সর্ব্বতোভাবে তৃণাদপি সুনীচ, তরোরপি সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ। তিনি আত্মারাম হইয়াও সতত নাম ভজনানন্দে বিভোর। তাঁহার বস্তু-দর্শন—হরিসম্বন্ধি-দর্শন,

ঈশাবাস্ত-দর্শন। তিনি নিজে ভগবানের সেবক থাকিয়া জগতের সর্বজীবকে সেবায় নিযুক্ত দেখিতে লালায়িত। তিনি সকলকে নামভজনে উদ্বুদ্ধ করেন। বিদেহীকেও প্রভুর ব্যতিরেকভাবে সেবা পুষ্টিকারক বলিয়া সম্মান দান করেন। আমি প্রভুর সেবা করিতে পারিলাম না বলিয়া সর্বদা বিপ্রলম্বভাবে বিভোর। এই অপ্রাকৃত বিপ্রলম্বভাবই তৃণাদপি সুনীচতার, তরোরপি সহিষ্ণুতার, অমানিত্ব ও মানদানের চরম উৎকর্ষ। ইহাতে সন্তোষবাদীর আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা নাই, একমাত্র অদয়জ্ঞান কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা পরিপূর্ণরূপে বিরাজিত। তখন তিনি দেখেন “গাছ-পালা, ঘর-বাড়ী, পশু-পক্ষী সকলেই ভজন করিতেছে। কেবল আমিই ভজন করিতেছি না।

স্ফোট যখন শ্রীগুরুচরণে প্রপন্ন জীবের উপর নিজ শক্তি প্রকাশ করেন সেই শক্তি প্রকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র—‘তৃণাদপি সুনীচাদি’। স্ফোট স্ফুটিত হইয়া নামরূপে হ্লাদিনীশক্তির প্রভাব বিস্তার করিয়া স্বরূপশক্তির ক্রিয়া প্রকাশ করেন। তখন তৃণাদপি শ্লোক রূপধারণ করিয়া নিজমৌন্দর্য্যে শ্রীকৃষ্ণকেও আকর্ষণ করেন এবং তটস্থ জীবকে মায়ার বহিরঙ্গা বৃত্তি হইতে সম্পূর্ণরূপে নিম্মুক্ত করিয়া স্বরূপশক্তির প্রভাবে প্রভাবান্বিত করেন। ক্রমশঃ উত্তরোত্তর হ্লাদিনীর কৃষ্ণ-সুখানুসন্ধানস্পৃহাকে নামভজনকারীর উপর আবেশ করাইয়া সুদর্শনের কৃপায় মহারূপবতী করিয়া রূপানুগ মধ্যে পরিগণিত করেন। যতই স্ফোটশক্তি তাঁহার অসমোর্দ্ধ কৃপা প্রকাশ

করেন ততই ক্রমে আলম্বনের বিষয়াশ্রয় বিজ্ঞান পরিজ্ঞাত করান। তখন বহির্জগতের বস্তুর প্রার্থনা একেবারেই আত্মোভোগ বা ত্যাগের অভিসন্ধি শূন্য হইয়া প্রার্থনা করেন—

“ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী হুয়ি।” অর্থাৎ আত্মেন্দ্রিতর্পণার্থ ধন, জন, সুন্দরী কামিনী, কবিতা—এমন কি, জগতের ধার্মিক-সম্প্রদায় যে মুক্তির জন্ম আকাঙ্ক্ষিত তাহা কিছুই চাই না। হে জগদীশ, আমি চাই তোমাতে অহৈতুকী ভক্তি। তোমার ষোলআনা সুখ যাহাতে তাহারই ইন্ধন করিয়া লও—তোমার সুখেই আমার সুখ হউক। তোমার সেবা করিতে গিয়া যদি অপরের দৃষ্টিতে অসংখ্য দুঃখ এবং অসুবিধাও আমাকে বরণ করিতে হয়, তাহাতেই আমার সুখ। সর্বক্ষণ সকল ইন্দ্রিয়ে তোমার সুখের অনুসন্ধান ছাড়া আমার পৃথক্ অস্তিত্ব নাই, আমার আত্মসুখকে যেন আমি তোমার সুখ বলিয়া মনে করিয়া আত্মবঞ্চনা না করি। বহিস্মুখ মায়িক গুণোক্ত সত্ত্বগুণের প্রকাশ দান, ব্রত ও সত্য-ধর্মাদি যেন কোন প্রকারে আমার প্রতি প্রভুত্ব বিস্তার না করিয়া আমাকে ‘নামভজনেই যে তোমার সুখ, ইহাতে অবিশ্বাস উৎপাদন করাইয়া নামাপরাধী না করে। এই সকল ব্যতীরেকী প্রার্থনার উদয় হয়। আর অদ্বয়ভাবে আলম্বনবিজ্ঞানে পারঙ্গত হইয়া ভগবন্তে সুবিজ্ঞ হইয়া ভগবন্তার সর্বশ্রেষ্ঠতম সত্ত্বা শ্রীব্রজদেবীগণের আরাধ্য নন্দ-তনুজের সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত হয় এবং ব্রজদেবীগণের আনুগত্যে

নিত্যকিঙ্করী অভিমানে সেবা প্রার্থনার উদয় হয়। তৎসহ স্বরূপশক্তি প্রকাশের স্বাভাবিক অচ্ছেদ্য লক্ষণ দৈন্তের উদয় হয়। তখন “আমি পতিত কৃষ্ণসেবা হইতে বিচ্যুত হইয়া ভবারণবে পতিত হইয়া বদ্ধ হইলেও আমি তোমার আশ্রয়া-ভিলাষী” বলিয়া প্রার্থনা হয়। (শ্রীলপ্রভুপাদ)

“ফোট তখন স্বরূপশক্তির মহাসৌন্দর্য ও মাধুর্য আশ্বাদন করাইয়া পরম পরিশুদ্ধ অবস্থায় স্থিত করেন। সাধক তখন নামসংকীৰ্ত্তনের মহাশক্তি ও কৃপালাভ করিয়া তীব্র উৎকণ্ঠা ও বিপুল দৈন্তে ব্যাকুল হইয়া হ্লাদিনীর কৃপাশক্তির আবেশ লাভ করিয়া কৃতার্থ হন। তখন তাঁহার ফোটের কৃপায় সাধুসঙ্গে হরিকীৰ্ত্তনই একমাত্র কৃত্য হইয়া পড়ে। বহু ভাগ্যক্রমে রাগানুগীয় ভক্তজনের কৃপায় ক্রমশঃ অনর্থ-নিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি এবং আসক্তির পর প্রেম-ভূমিকায় আরুঢ় হন। তখন সেই রাগানুগীয় ভজন প্রণালীতে নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকর সমন্বিত শ্রীরাধা-গোবিন্দের ভজনোচিত উৎকণ্ঠারামিকে প্রাপ্ত হন। সাধক-দেহে প্রেম পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে। প্রেমের সাত্ত্বিক বিকার প্রকাশিত হইতে থাকে। ফোটের যতই সুষ্ঠুও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ হইতে থাকে ততই দৈন্ত ও তীব্র উৎকণ্ঠা পরিপক্বাবস্থা লাভ করিলে অনুরাগরূপ স্থায়ীভাবে জন্ম লালসা জন্মে। কিন্তু সাধকদেহে অনুরাগের আবির্ভাবের সম্ভাবনা নাই। ব্রজে গোপীকা-গর্ভে জন্মলাভ করিয়া নিত্য-সিদ্ধা ব্রজদেবীগণের সঙ্গপ্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ এবং তৎপরিকরগণের দর্শন শ্রবণ ও কীৰ্ত্তনাদি দ্বারা ক্রমশঃ স্নেহ, মান, শ্রণয়, রাগ,

অনুরাগ এবং মহাভাবও সেই গোপিকা-দেহে প্রাচুর্ভূত হয়। যেহেতু পূর্ব্বজন্মে সাধক-দেহে উক্ত ভাব-সমূহের উৎপত্তি হওয়া অসম্ভব। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদীয় ভক্তগণের কৃপায় তাঁহাদের মহাবদানাতার পরাকাষ্ঠা-দান-স্বরূপে গৌরলীলায় প্রদত্ত হইয়াছিল; তাহাই অনর্পিতচর কৃপা-বৈশিষ্ট্য। শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ-প্রায়সীগণের অসাধারণ লক্ষণ বর্ণিত আছে—
 “যেসকল ব্রজসুন্দরীগণের শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত, ক্ষণকালও যুগশতের মত বোধহয়, সেই গোপীগণের গোবিন্দ-দর্শনে পরমানন্দ জন্মিয়াছিল।” ব্রজসুন্দরীগণের শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে উক্তি—“তোমাকে দর্শন না করিয়া আমাদের এক-নিমেষও যুগবৎ বলিয়া প্রতীয়মান হয় ” ক্ষণকাল শত শত যুগের স্থায় বোধ হওয়া মহাভাবের লক্ষণ।

এ স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, প্রেমভূমিকাপ্রাপ্ত সাধকের দেহভঙ্গ হইলেই গোপীগর্ভে জন্ম ব্যতীতই অপ্রকট-প্রকাশে গোপিকাদেহ প্রাপ্ত হউক, তদনন্তর সেই দেহেই নিত্যসিদ্ধ গোপিকাগণের সঙ্গপ্রভাবে প্রাচুর্ভূত স্নেহাদিভাবের প্রাপ্তি হইলে দোষ কি? তদুত্তরে—গোপীগর্ভে জন্মব্যতীত এই সখীটী কাহার কন্যা, কাহার বধু, কাহার স্ত্রী ইত্যাদি নর-লীলোচিত স্ত্রী-কন্যাদি ব্যবহার-সামঞ্জস্য লাভ করিতে পারে না।

অপ্রকট-প্রকাশে জন্ম হইলে ক্ষতি কি? তদুত্তরে—
 “প্রাকৃত জগতের অতীত দেশের শ্রীবৃন্দাবনীয় প্রকাশ-বিশেষে সাধক কিম্বা প্রাকৃতজনের, গমন করিতে দেখা যায় না; শুধু

সিদ্ধব্যক্তিরাই প্রবেশ করিতে পারেন। কারণ উক্তধাম কেবল সিদ্ধভূমি। অতএব তথায় স্ব-স্ব সাধন দ্বারাও স্নেহাদি ভাব-সমূহ শীঘ্র ফলপ্রদ হইতে পারে না। অতএব সেই প্রপঞ্চগোচর শ্রীবৃন্দাবনীয় প্রকাশে উৎপত্তির পর শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গের পূর্বেই সেই স্নেহাদিভাব সিদ্ধির জন্ত, যোগমায়া, যাঁহাদের প্রেম প্রাচুর্ভূত হইয়াছে, তাদৃশ ভক্তগণকে শ্রীকৃষ্ণাবতারসময়ে প্রাকৃত-জনগোচর শ্রীবৃন্দাবনীয় প্রকাশে লইয়া যান। সাধকভক্ত, কন্সী এবং সিদ্ধ-ভক্তগণের সেই প্রপঞ্চগোচর শ্রীবৃন্দাবনে প্রবেশ করিতে দেখা যায় বলিয়া উক্ত ধাম সাধক ও সিদ্ধভূমিরূপে অনুভূত হয়। আবার জাতপ্রেম পরমোৎকর্থাবান্ ভক্ত, সাধকদেহভঙ্গানন্তর গোপীদেহ-প্রাপ্তির পূর্ব পর্য্যন্ত কোথায় থাকেন? তদন্তরে—সাধকদেহ-নাশের পরই যিনি বহুকাল অবধি সাক্ষাৎ সেবালাভের অভিলাষে উৎকর্থা-শীল, সেই প্রেমবান্ ভক্তকে ভগবান্ কৃপা পূর্ব্বকই সপরিকর স্বীয় দর্শন এবং উক্ত ভক্ত, স্নেহাদি প্রেমবিলাস সকল লাভ না করিলেও তাঁহাকে তদীয় অভিলষণীয় সেবাদি কিঞ্চিৎ দান করিয়া থাকেন। যেমন পূর্ব্বজন্মে নারদকে দর্শনাদি দিয়াছিলেন। আর চিদানন্দময়, গোপীদেহও দান করিয়া থাকেন। সেই দেহই যোগমায়া, শ্রীকৃষ্ণ পরিকরগণের আবির্ভাব-সময়ে শ্রীবৃন্দাবনীয় প্রকট-প্রকাশে গোপীগর্ভ হইতে প্রাচুর্ভূত করান—এ বিষয়ে নিমিষমাত্রও কালবিলম্ব করেন না। যেহেতু অনবরত প্রকটলীলা চলিতেছেই, তাহার কখনও বিচ্ছেদ নাই। সেই সময়ে যে ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীবৃন্দাবনীয় লীলার

প্রকটন ; সেখানেই, এই ব্রজভূমিতেই, গোপীগর্ভে উৎপাদিত
বুঝিতে হইবে। সুতরাং সাধক প্রেমবান্ ভক্তের দেহভঙ্গের
সমকালেও সপরিকর শ্রীকৃষ্ণের প্রাত্তর্ভাবও সততই আছে।
অতএব মহানুরাগী উৎকর্ষাশীল ভক্তগণের ভয় নাই।
(রাগবত্ন-চন্দ্রিকা)

ইহাতে শ্রীমন্নহাপ্রভুর প্রবর্তিত ভজনকৌশল মধ্যে
বিপ্রলভ্যভাবের প্রচুর প্রকাশ দেখা যায়। ইহার পরে অর্থাৎ
শিক্ষাষ্টাকের শেষ অষ্টমশ্লোকে শ্রীরাধার ভাববৈশিষ্ট্যের কথা
কীর্তন করিতেছেন। “আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মস্মহতাং করোতু বা। যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥” অর্থাৎ এই পাদরতা দাসীকে
কৃষ্ণ আলিঙ্গনপূর্বক পেষণ করুন, অথবা অদর্শন দ্বারা মস্মাহতাই
করুন, তিনি—লম্পট পুরুষ, আমার প্রতি যেক্রমেই বিধান
করুন না কেন, তিনি অপর কেহ নন, আমারই প্রাণনাথ।”
“না গণি আপন-ছুঃখ, সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ, তাঁর সুখ—আমার
তাৎপর্য্য। মোরে যদি দিয়া ছুঃখ, তাঁর হৈল মহাসুখ, সেই ছুঃখ
মোর সুখবর্ষ্য ॥” এই সকল প্রেম-পরাকাষ্ঠার কথা শ্রীমন্নহা-
প্রভুর প্রকটিত অনর্পিত স্বভক্তি-সম্পত্তি শ্রীমন্নহাপ্রভুর কৃপায়
ফোটশক্তি দ্বারাই প্রকাশিত হইয়াছে।

দশম ক্রম

সেই ফোটশক্তি বিদ্বদ্ভক্তিবিবৃতিতে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় তদীয়
সেবার্থে নানা প্রকারে ও নানাভাবে নানাস্থানে প্রকাশিত।

যখন স্বরূপ-শক্তিরসন্ধিতে স্ফুটিত তখন বিদ্বদ্রুচিবৃত্তিতে কৃষ্ণের সেবার্থেস্থানাদিক্রমে ও সেবোপকরণরূপে প্রকটিত। যখন স্বরূপ-শক্তিরসন্ধিতের প্রতি প্রস্ফুটিত তখন 'কৃষ্ণে ভগবত্তা জ্ঞান সন্ধিদের সার'-রূপে ভক্তে ও ভগবানে পরস্পরের মাহাত্ম্যজ্ঞান প্রকাশক রূপে প্রকটিত। যখন স্বরূপশক্তির হ্লাদিনীতে স্ফুটিত যখন প্রেমানন্দ রূপে ভক্ত ও ভগবানের লীলাবিলাসে তৎপর। তটস্থ-শক্তি জীবে স্ফুটিত হইয়া রুচি বৃত্তিদ্বারা জীব সত্তা, জীব-জ্ঞান ও জীবানন্দ রূপে প্রকাশিত। আবার যখন বহিরঙ্গা মায়া শক্তিতে স্ফুটিত হন, তখন অঙ্গরুচিবৃত্তিতে জড়ীয় স্থানাদি, জড়ীয় জ্ঞান ও জড়ানন্দ-রূপে প্রকাশিত। তাহার প্রত্যেকটাই বহু প্রকারে প্রকাশিত হওয়ায় তাহার দিগদর্শন কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে। তন্মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটি মাত্র আলোচিত হইল। আর ত্রকটি স্ফোটের প্রধান প্রকাশ—সঙ্গীতরূপে। ইহা শ্রীকৃষ্ণের রাসে নিত্য মহামাধুর্যময়ী মহাশক্তি প্রকটিত করিয়া ভগবৎসুখতৎপর।

সর্ব চিত্তাকর্ষক এই সঙ্গীত ব্রহ্মা পুরাকালে চারিবেদের সার গ্রহণ করিয়া সঙ্গীতবেদ নামক এই পঞ্চম বেদ রচনা করিয়াছিলেন। ঋক্শুভুসকলের আবৃত্তি হইতে পাঠ্য বা আবৃত্তির, সামগান হইতে গানের, যজুর্বেদ হইতে আভিনয়ের এবং অথর্কবেদ হইতে রসের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া কথিত। ব্রহ্মা, শিব, নন্দী, ভরত, দুর্গা, নারদ, কোহল, রাবণ, বায়ু, রম্ভা প্রভৃতি সঙ্গীতের প্রচারক বলিয়া বিদিত।

সঙ্গীতপারিজাতে—গীত-বাগ্ন-নৃত্য এই তিনের সমষ্টিকে

সঙ্গীত বলা হয়। তন্মধ্যে গীতের প্রাধান্যবশতঃ উহারা সঙ্গীত বলিয়া কথিত। সঙ্গীতশিরোমণিতে—গীত, বাজ ও নৃত্য এই তিনটি সঙ্গীত বলিয়া কথিত। গীত ও বাদ্য এই দুইটাই সঙ্গীত—এইরূপও কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। এই সঙ্গীত পশু, পক্ষী, মনুষ্য, দেবতা-প্রভৃতির চিত্তহারি বলিয়া প্রসিদ্ধ। সঙ্গীতসারে—মার্গ ও দেশী দুই প্রকার সঙ্গীত। তন্মধ্যে মার্গস্বর্গে ও দেশী ভুলোকে আনন্দ-প্রদাতা। ব্রহ্মা ভরতকে, ভরত অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ দ্বারা মহাদেবের সম্মুখে উহা প্রয়োগ করিয়াছিলেন। সেই সঙ্গীত দেশভেদে নানাদেশীয় বলিয়া কথিত হয়। নাদঃ—নাদ ব্যতীত গীত, ষড়্জাদি স্বর ও রাগ-রাগিনী হয় না। অতএব এই জগৎ নাদময়। সঙ্গীতদামোদরে—নাদতত্ত্ব ব্যতীত তত্ত্বজ্ঞানের পৃথক্ সত্তা নাই, নাদজ্ঞান ব্যতীত শিবকে জানা যায় না, জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্ম নাদময়, স্বয়ং হরিও নাদরূপী বা শব্দ ব্রহ্মস্বরূপ। হনুমন্মতে—সরস্বতীও নাদ সমুদ্রের পরপার এখনও পৌঁছিতে পারেন নাই। তাই ঐ সমুদ্রে নিমগ্ন হইবার ভয়ে বক্ষে বীনার তুঙ্গ বহন করিতেছেন। সঙ্গীত-সারে—ন-কারের অর্থ প্রাণবায়ু, দ-কারের অর্থ অগ্নি, যেহেতু এই দুই হইতে উৎপন্ন হয়, সেইজন্ম ইহাকে নাদ বলে। অর্থাৎ নাদ প্রাণ ও অগ্নি হইতে উৎপন্ন। সঙ্গীত-মুক্তাবলীতে—যাহা আকাশ-অগ্নি-বায়ু হইতে উৎপন্ন হইয়া নাভির উর্দ্ধস্থানে বিচরণপূর্ব্বক মুখে প্রকাশিত হয় তাহা নাদ বলিয়া কথিত। সেই নাদ প্রাণিজাত, অপ্ৰাণিজাত ও উভয়জাত হয়। প্রথম জীবদেহজাত, দ্বিতীয় বীণাজাত এবং

তৃতীয় বংশাদি-জাত, এইরূপে নাদ তিন প্রকার। প্রয়োগ-স্থলে পণ্ডিতগণ এই নাদকে তিন প্রকার বলিয়া থাকেন। ‘মন্দ্র’ হৃদয়ে, ‘মধ্য’ কণ্ঠে এবং ‘তার’ তালুতে অবস্থিত। ইহাদের মধ্যে পরবর্তীটী তৎপূর্ববর্তীটী হইতে দ্বিগুণ সময়বিশিষ্ট। ঠাঁহারা ঋতি-স্মৃতি প্রভৃতি, সাহিত্য ও নানা শাস্ত্রে অভিজ্ঞ হইয়াও সঙ্গীত-বিদ্যা জানেন না, ঠাঁহারা দ্বিপাদ পশু। জ্ঞান, যজ্ঞ, স্তব প্রভৃতি সকল সাধনই ধর্ম-অর্থ-কা মরূপ ত্রিবর্গফল প্রদান করে। একমাত্র সঙ্গীত-বিজ্ঞান ধর্মার্থকামমোক্শরূপ চতুর্বর্গ-ফল প্রদান করে। সঙ্গীতদামোদরে বিশেষ ভাবে উক্ত হইয়াছে—রম্য সঙ্গীতে বাহার চিত্তে সুখের উদয় হয় না, সে এই সংসারে মনুষ্য মধ্যে গো-সদৃশ এবং বিধাতা কর্তৃক বঞ্চিতই। হরিণ, পক্ষী এবং সর্পও গানের দ্বারা বলপূর্বক বন্ধনদশা প্রাপ্ত হয়, শিশুগণও রোদন করে না, গান অতীব বিপুলানন্দবর্ধক, অভীষ্টফলদায়ক, বশীকরণ, সর্বচিত্তহারী ও মুক্তির বীজস্বরূপ। সঙ্গীতসারে—ধাতু-মাতু-সহিত গীত চিত্তরঞ্জক হয়। গীতের অবয়বকে ‘ধাতু’ এবং গীতের রাগাদিকে ‘মাতু’ বলে। নারদসংহিতায় গীত ধাতু-মাতু বিশিষ্ট হয়—এইরূপ কথিত হয়। তার মধ্যে নাদাত্মক গীতকে ‘ধাতু’ বলা হয়। নাদ হইতে ঋতি জন্মে, ঋতি হইতে ষড়্জ্, প্রভৃতি স্বর, সেই . সকল স্বর হইতে মূচ্ছ’না এবং মূচ্ছ’না হইতে গ্রাম-সমুত তাল বা তান উৎপন্ন হয়। নাদ, ঋতি, স্বরগ্রাম, মূচ্ছ’না, তাল, বর্গ, গ্রহস্বর, গ্রাসস্বর, অংশস্বর ও জাতি এই ক্রমে উপদিষ্ট

হইয়াছে। সেই নাদ বায়ুসঞ্চালিত হইয়া দ্বাবিংশ শ্রুতিতে পরিণত হয়। দ্বাবিংশ নাড়ী বক্র ও উর্দ্ধভাবে হৃদয় স্থানকে আশ্রয় করিয়াছে; যতসংখ্যক নাড়ী শ্রুতিও ততসংখ্যক বলিয়া কথিত। সেই সকল শ্রুতি ক্রমে ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর হইয়া বীণা প্রভৃতি যন্ত্রেই লক্ষিত হয়, কেন না, কফ প্রভৃতি দোষযুক্তকণ্ঠে তাহাদের প্রকাশ হয় না। ষড়্জ, মধ্যম ও পঞ্চম স্বরে প্রত্যেকটিতে চারিটি করিয়া শ্রুতি; ঋষভে ও ধৈবতে তিনটি করিয়া এবং গান্ধীর ও নিষাদে দুইটি করিয়া শ্রুতি আছে। ষড়্জস্বরে—নান্দী, বিশালা, স্মুখী, বিচিত্রা এই চারটি; ঋষভে—চিত্রা, ঘনা ও চালনিকা এই তিনটি; গান্ধারে—সরসা ও মালা এই দুইটি; মধ্যমে—মাধবী, শিবা, মাতঙ্গিকা ও মৈত্রেয়ী এই চারিটি; পঞ্চমে—বালা, কলা, কলরবা, শার্ঙ্গরবী এই চারটি; ধৈবতে—জায়া, রসা ও অমৃতা এই তিনটি; নিষাদে—মাত্রা, মধুকরী এই দুইটি; এইরূপে দ্বাবিংশতি শ্রুতি স্বরের উৎপাদিকা বলিয়া কথিত হয়। কোহলীতে আছে, প্রজাপতির মুখ হইতে বিনির্গত সিদ্ধি, প্রভাবতী, কান্তা, সুভদ্রা এই মনোহারিণী শ্রুতিচতুষ্টয় ষড়্জ স্বর উৎপাদন করে। ব্রহ্মাও শ্রুতিস্থানে হৃদয়াভ্যন্তরে উৎপন্ন স্বরসকল তত্ত্বতঃ বলিতে অসমর্থ। গভীর জলে বিচরণকারী মৎস্যের গতি লক্ষিত হয় না।

যাহা শ্রুতিস্থানে হৃদয়াভ্যন্তরে ধ্বনিত হইয়া চিত্তরঞ্জক হয় তাহার নাম 'স্বর'। এই ব্যাখ্যানুসারে স্বরশব্দের যোগরূঢ় নির্দিষ্ট হয়। অথবা—যেহেতু ইহার শ্রোতার মনোরঞ্জন করে

অতএব তাহাদের 'স্বর'-সংজ্ঞা। এইস্থলে ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ—এই সপ্তস্বর কথিত হয়। ইহাদের স-রি-গ-ম-প-ধ-নি এইরূপে নানান্তরও আছে। মন্দ্র-মধ্য-তার-ভাব আশ্রয়ে ইহারা তিন প্রকার। মন্দ্র হৃদয়ে, মধ্য কণ্ঠে এবং তার মস্তকে উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে পর-পরটী পূর্ব-পূর্ব অপেক্ষা দ্বিগুণ উচ্চ। যেহেতু এই স্বর নামিকা, কণ্ঠ, বক্ষঃ, তালু, জিহ্বা, দন্ত—ইহাদিগকে স্পর্শপূর্বক এই ছয় স্থান হইতে উৎপন্ন হয়, অতএব হই। ষড়্জ বলিয়া কথিত। কিন্তু দামোদরের মত অন্যপ্রকার, যথা—নাভি, হৃদয়, পার্শ্বদ্বয়, নাড়ী ও মস্তক এই ছয়স্থানের বায়ু সংমূর্চ্চিত হইয়া ষড়্জ স্বর উৎপন্ন করে। যখন বায়ু নাভিমূল হইতে উথিত হইয়া বৃষভের শ্রায় ধ্বনি উৎপাদন করে এবং সহজে মুখবহির্গত হয় তখন তাহা ঋষভ-স্বর বলিয়া কথিত হয়। যে হেতু নাভি হইতে উথিত বায়ু নাসিকা ও কর্ণকে সঞ্চালিত করিয়া সশব্দে নির্গত হয়, সেইজন্ত তাহা “গান্ধার” বলিয়া কথিত। ‘মধ্যম’-স্বর স্বভাবতঃ গম্ভীর ও কিছু উচ্চ। ইহা শরীরের নাভিমূল ও মধ্যস্থান হইতে উৎপন্ন হয়। প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান—এই পঞ্চ প্রাণ, ইহাদের সম্মিলনে পঞ্চম-স্বরের উৎপত্তি হয়। এই পঞ্চ প্রাণের স্থান নির্দেশ এইরূপ—হৃদয়ে প্রাণ, গুহাদেশে অপান, নাভিস্থলে সমান, কণ্ঠদেশে উদান এবং সর্বশরীর ব্যাপিয়া ব্যান অবস্থিত। যে স্বর নাভির অধোভাগে গিয়া বস্তিদেশে স্পর্শ করতঃ পুনরায় উর্দ্ধগতি হইয়া যেন সবেগে কণ্ঠস্থানে উপস্থিত হয় তাহা ধৈবত-স্বর।

যেহেতু এই সকল ষড়্জ প্রভৃতি মনোহর স্বর এই স্বরে অবস্থান করে, সেই কারণে এই স্বর জগতে নিষাদ বলিয়া কথিত। ময়ূর ষড়্জ, চাতক ঋষভ, ছাগ গান্ধার, বক মধ্যম, কোকিল পঞ্চম, ভেক ধৈবত, হস্তী নিষাদ স্বর প্রকাশ করে। ইহা ব্রহ্মা প্রভৃতির সম্মত। দামোদর বলেন—ময়ূর, ঋষভ, ছাগ, কোকিল, অশ্ব ও হস্তী—ইহারা ক্রমান্বয়ে এই সকল অতি ছুরায়ত্ত স্বর উচ্চারণ করিয়া থাকে।

সেই সকল স্বর বাদি-সম্বাদি-বিবাদ্যানুবাদী এই চারি নামে আবার চারি প্রকার। তন্মধ্যে যে স্বর কার্যকালে প্রচুরভাবে প্রযুক্ত হয় এবং রাগের স্বরূপ নির্দেশ করে তাহা 'বাদী'। পঞ্চমের সমান শ্রুতিবিশিষ্ট স্বর 'সম্বাদী'; তাদৃশ স্বর কখনও বা সম্বাদী হয় না। গান্ধার ও নিষাদ ঋষভ-ধৈবতের বিবাদী এবং ঋষভ-ধৈবতও উহাদের বিবাদী। এতদবশিষ্ট অনুবাদী। ইহা দত্তিলাচার্যের অভিমত। বাদী স্বর—রাজা, সম্বাদী স্বর—পাত্র, বিবাদী স্বর—শত্রু এবং অনুবাদী স্বর রাজাও পাত্রের অনুচর। স্বরসকলের অতিসূক্ষ্মভাবে সংযোজনের নাম 'গ্রাম'। উহা স্থান ও শ্রেণীভেদে ত্রিবিধ। ষড়্জ ও মধ্যম গ্রাম পৃথিবীতে এবং গান্ধার গ্রাম দেবলোকে প্রচলিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। স্বরসমূহাত্মক তিনটি গ্রাম। তাহাদের ষড়্জ, মধ্যম ও গান্ধার এই তিন সংজ্ঞা। ইহারা মূচ্ছনার আধারস্বরূপ। গ্রামত্রয়মধ্যে ষড়্জ গ্রাম উত্তম। অগ্নেও বলেন,—স-রি-গ-ম-প-ধ-নি—ইহা ষড়্জ গ্রামের মূচ্ছনা, ম-প-ধ-নি-স-রি-গ—ইহা মধ্যমগ্রামের মূচ্ছনা এবং

গ-ম-প-ধ-নি-স-রি—ইহা গান্ধার গ্রামের মূচ্ছ'না। জাতি ও শ্রুতি প্রভৃতির সহিত স্বর 'গ্রাম' সংগঠন করে। যখন স্বর সংমূচ্ছিত হইয়া রাগে পরিণত হয়, ভরতাদি মুনিগণ সেই গ্রামোৎপন্ন রাগকে 'মূচ্ছ'না' নামে অভিহিত করেন। গ্রামোৎপন্ন, সপ্তস্বরবিশিষ্ট সেই মূচ্ছ'না তিন গ্রামে সংখ্যায় মোট একবিংশতি। ললিতা-মধ্যমা-চিত্রা-রোহিনী-মতঙ্গজা-সৌবীরা-বর্ণমধ্যা-ষড়্জমধ্যা-পঞ্চমী-মৎসরী-মৃদুমধ্যা-শুদ্ধাস্তা-কলাবতী-তীত্রা-রৌদ্রী-ব্রাহ্মী-বৈষ্ণবী-খেচরী-বরা-নাদবতী-বিশালা এই একুশটি মূচ্ছ'না গ্রামত্রয়ে প্রসিদ্ধ—মহাদেব এইরূপ বলেন। শিবের সম্মুখে মূচ্ছ'না গান করিয়া ব্রহ্মঘাতীও পাপ হইতে বিমুক্ত হয়।

স্বরের আরোহণ-মুখে মূচ্ছ'নাসকলই শুদ্ধ "তাল" হয়। এই বিষয়ে দামোদর অশ্বরূপ বলেন, যথা—যাহার দ্বারা মূচ্ছ'নার শেষভাগের আশ্রয়ে স্বরপ্রয়োগের বিস্তার হয় তাহারাই সপ্তস্বরসমুদ্ভূত উনপঞ্চাশৎসংখ্যক 'তান'। তান হইতেই পৃথক্ পৃথক্ কুটতান সকলের উৎপত্তি। সে-সকল কুটতানের ভেদ অনেক প্রকার। গ্রাম, মূচ্ছ'না ও তানের বহু ভেদ তাহা অপ্ৰাসঙ্গিক ও অজ্ঞেয় বলিয়া কথিত হইল না। উক্ত কারণে তালাধিকারে উক্ত হইয়াছে যে, ঐ সকল তাল সংখ্যায় পাঁচ হাজার তেত্রিশ। অগ্নিষ্টৌমিক তালে শিবের স্তব করিলে শিবত্বপ্রাপ্তি হয়। শাস্ত্রে শুদ্ধ তালের অগ্নিষ্টৌমাদি ভেদ কথিত আছে। কিন্তু প্রয়োগাভাবহেতু উল্লিখিত হইল না। তাহারা মূর্ত্তিমান হইয়া শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে বিলসিত।

গানকার্য্য-সম্পাদনে ব্যবহৃত স্বরকে “বর্ণ” কহে। সেই বর্ণ স্থায়ী, আরোহী, অবরোহী ও সঞ্চারী ভেদে চারি প্রকার। তাহাদের প্রত্যেকের লক্ষণ কথিত হইতেছে—একই স্বরের যদি থাকিয়া প্রয়োগ হয় তাহা হইলে তাহার নাম—স্থায়ী। পরবর্ত্তী দুইটি—নামের অনুরূপ অর্থ বিশিষ্ট। অর্থাৎ যাহা আরোহণ করে তাহা আরোহী, যাহা অবরোহণ করে তাহা অবরোহী। এক একটা স্বরে থাকিয়া থাকিয়া পুনঃ প্রয়োগ হইলে সে স্বরকে স্থায়ী বর্ণ জানিবে। পরবর্ত্তী দুইটি সার্থক-নামা। ইহাদের অর্থাৎ স্থায়ী আরোহী অবরোহীদের মিশ্রণে সঞ্চারী বর্ণ হয়। রচনার বৈশিষ্ট্যে বর্ণ সকল অলঙ্কার হয়। স্থায়ী বর্ণের ছাব্বিশ, আরোহীর দ্বাদশ, সঞ্চারীর দ্বাদশ, অবরোহীর দ্বাদশ—মোট বাষট্টি প্রসিদ্ধ অলঙ্কার কথিত আছে। স্বরজ্ঞান হইলে অভ্যাস দৃঢ় ও আনন্দ লাভ হয়। অলঙ্কারের প্রয়োজনে বর্ণজ্ঞানের বৈচিত্র্য প্রয়োজনীয়। অতএব সঙ্গীতপারিজাতে কথিত আছে—অলঙ্কার ব্যতীত রাগ বিস্তার লাভ করিতে পারে না। সঙ্গীতপারিজাতে—যাহাতে এক স্বরে আরম্ভ করিয়া অগ্রবর্ত্তী স্বরে যাইয়া পুনঃ পূর্ব্ব-স্বরের আলাপ হয়, তাহাকে সঙ্গীতবিশারদ হনুমান্ ‘ভদ্র’ নামক অলঙ্কার বলিয়াছেন। এই অলঙ্কারে এক একটা স্বরের হানি করিয়া ক্রম সম্পাদিত হয়। যেমন—সরিস, রিগরি, গমগ, মপম, পধপ, ধনিধ, নিসনি সরিস ॥

যাহাতে মূচ্ছনার আদিস্বর হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক স্বরকে অবস্থিতি পূর্ব্বক দীর্ঘ করিয়া ক্রমে আরোহণ হয় তাহা

‘বিস্তীর্ণ’ নামে অভিহিত হয়। যথা—সা রী গা মা পা ধা নী সা। সৰ্ব্বজ্ঞ হনুমান্ পূৰ্ব্ব দুই স্বরকে হ্রস্ব এবং তৃতীয় স্বরকে দীৰ্ঘ করিয়া ‘সন্ধিপ্ৰচ্ছাদন’ নামক অপর এক অলঙ্কার বলিয়াছেন। যথা—সরিগা, রিগমা, গমপা, মপধা, পধনী, ধনিসা ॥ আদি স্বর চারিবার, দ্বিতীয় স্বর দুইবার, তৃতীয় ও চতুর্থ স্বর একবার মাত্র আলাপ করিয়া হনুমান্ ‘উদ্বাহিত’-নামক অলঙ্কার বলিয়াছেন। যথা—স স স স রি রি গ ম, রি রি রি রি গ গ ম প ; গ গ গ গ ম ম প ধ , ম ম ম ম প প ধ নি, প প প প ধ ধ নি স। এই দ্বাদশটি আরোহীর অলঙ্কার স্বরের অবরোহক্রমে অবরোহি বর্ণের অলঙ্কার হইয়া থাকে। যোহেতু সৰ্ব্বত্র সঞ্চাৰিত অতএব ‘সঞ্চারী’ বলিয়া কথিত। প্রথম স্বরদ্বয় তিনবার আবৃত্তি করিয়া তারপর ক্রমে তৃতীয় ও দ্বিতীয় স্বর উল্লেখ করিয়া পণ্ডিতগণ ‘প্রসাদ’-নামক অলঙ্কার বলিয়াছেন। যথা—সরি সরি সরি গরি, রিগ রিগ রিগ মগ, গম, গম গম পম, মপ মপ মপ ধপ, পধ পধ পধ নিধ, ধনি ধনি সনি ॥ যাহাতে প্রথম হইতে তিনিটি স্বরের ক্রমান্বয়ে উল্লেখ হয়, পণ্ডিতগণ তাহাকে ‘গ্রাহ্ণেপ’ অলঙ্কার বলিয়াছেন। যথা—“সরিগ রিগম, গমপ, মপধ, পধনি, ধনিস ॥ “সরিগ, সরিগম—এইরূপ স্বরবিছ্যাসে ‘কোকিল’ অলঙ্কার হয়। যথা—সরিগ, সরিগম, রিগম রিগমপ, গমপ গমপধ, মপধ, মপধনি, পধনি পধনিস ॥ সে স্বর গীতের প্রারম্ভে প্রযুক্ত হয় তাহাকে ‘গ্রহস্বর’ বলে (সং পাঃ)। যে স্বর গানে রাগপ্রকাশক, অপর স্বর সকল যাহার অনুগামী, যাহা গ্রহস্বরের কারণ, ন্যাসাদি

স্বরের প্রয়োগ অপেক্ষা সর্বত্র যাহার আধিক্য সেই রাজতুল্য স্বর অংশী ও বাদী। ‘বাদী’—রাগাদির নিরূপক। যাহা স্বয়ং গ্রহভাব প্রাপ্ত—ইহা দ্বারা গ্রহস্বরের কারণত্ব সূচিত। সঙ্গীত-পারিজ্ঞাতে, যথা—রাগ সকলের জীবন-স্বরূপ স্বরকে পণ্ডিতগণ ‘অংশস্বর’ বলেন। অত্রও—প্রয়োগে যাহার বাহুল্য তাহাকে ‘অংশস্বর’ কহে। যাহা:গীতের সমাপ্তি করে তাহা ‘শ্রাসস্বর’। যাহা হইতে রাগের জন্ম, সঙ্গীতশাস্ত্রে তাহা রাগের জাতি, তাহা রাগের মাতাও বটে। শুদ্ধ, বিকৃত, এই দুইয়ের মিলনে সঙ্কীর্ণ—সেই জাতির এই তিন প্রকার আখ্যা। শুদ্ধা জাতি সাতটী; ষড়্জাদিস্বরে তাহাদের সংজ্ঞা হয়। শুদ্ধা জাতিই বিকৃতজাতি হয়, বিকৃত জাতির মিশ্রণ হইতে সঙ্কীর্ণ-জাতির উদ্ভব হয়। এই প্রকারে জাতি দুই প্রকার—ইহা কাহারও অভিমত। হরিনায়ক তাই বলেন—শুদ্ধ ও বিকৃতির মিলনে জাতি অষ্টাদশ প্রকার বলিয়া কথিত এবং তাহারাই রাগসকলের উৎপত্তির কারণ। এই মতই প্রধান বলিয়া প্রতীত হয়। কারণ, প্রাচীন আচার্য্যগণ ইহা স্বীকার করিয়াছেন।

ষাড়্জ, আর্ষভী, গান্ধারী, মাধ্যমী, পাঞ্চমী, ধৈবতী, নৈষাদী,—এই সাতটী শুদ্ধা জাতি। ষড়্জ কৈশিকী, ষড়্জ-মধ্যমা, গান্ধারপঞ্চমাস্ত্রী, ষড়্জা, ধৈবতী, কান্স্রাবরী, নন্দয়ন্তী, গান্ধারোদীচ্চরা, মধ্যমোদীচ্চরা, রক্তগান্ধারী ও কৈশিকী—এইরূপ একাদশ বিকৃত জাতি ভরতাদি বলিয়াছেন। অনন্তর শুদ্ধ, সিদ্ধ ও বিকৃত জাতির উৎপত্তিহেতু কহিতেছি,—ষড়্জ-

গান্ধারের যোগে ষড়্জকৈশিকী, ষড়্জ-মাধ্যমের যোগে ষড়্জমধ্যমা, গান্ধার পঞ্চমের যোগে গান্ধারপঞ্চমী উৎপন্ন। এইরূপে হেতু নির্দিষ্ট হয়। শ্রুতি হইতে জাতি পর্য্যন্ত বীণাতেই জ্ঞাত হওয়া যায়, অণ্ড্র নহে। ত্রিজগতবাসী জীবের চিত্ত যাহার দ্বারা রাগযুক্ত হয়, তাহাকে 'রাগ' কহে।

নারদপঞ্চমসংহিতায় আছে—শ্রীকৃষ্ণ রাসে মুরলীর শব্দে সকলের মোহ উৎপাদনপূর্বক সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বস্থিত ষোল হাজার গোপিনী প্রত্যেকে গান আরম্ভ করিলেন। সেই গান হইতে ষোল হাজার রাগের উৎপত্তি হইল। এই সকলের মধ্যে ছত্রিশটি রাগ এই জগতে প্রসিদ্ধ আছে। সেই সকলও মেরুর চতুর্দিকে বর্তমান আছে—ইহা কেহ কেহ বলেন। ভৈরব, বসন্ত, মালবকৌশিক, শ্রীরাগ, মেঘ, নটনারায়ণ—এই ছয়টি রাগ ও ইহারা পুরুষ। ভৈরবী, কৌশিকী, বিভাষ, বেলাবলী, বঙ্গালী—এই রাগিণীগণ ভৈরব-পত্নী। আন্দোলিতা, দেশাখ্যা, লোলা, প্রথমমঞ্জরী, মল্লারী—ইহারা বসন্তের অনুগত রাগিণী। গৌরী, গুণকরী, বরাড়ী, ক্ষমাবতী ও কর্ণাটী—এই সকল রাগিণী মালবকৌশিকের প্রিয়া। গান্ধারী, দেবগান্ধারী, মালবশ্রী, আশাবরী, রামকিরী—ইহারা শ্রীরাগের প্রিয়া রাগিণী। ললিতা, মালসী, গৌরী, নাটী, দেবকিরী—ইহারা মেঘরাগের প্রিয়তমা রাগিণী। তারামণী, সুধাভীরী, কামোদী, গুর্জরী ককুভা—এই রাগিণীগণ নটনারায়ণের প্রিয়তমা। ছয় রাগ ও ছয়ত্রিশ রাগিণী সুন্দর দেহবিশিষ্ট। শিবশক্তির মিলিতরূপই রাগ। ইহা পরম

প্রেমরসের সমুদ্র। ইহার শ্রবণে শ্রীহরি প্রেমবিগলিত
হয়েন।

মালব, মল্লার, শ্রীরাগ, বসন্ত, হিন্দোল, কর্ণাট—এই ছয়টি
পুরুষ রাগ বলিয়া কথিত। ধানসী, মালসী, রামকেরী, সিন্ধুড়া,
আশাবরী ও ভৈরবী—ইহারা মালব-রাগের পত্নী। বেলাবলী,
পূরবী, কানড়া, মাধবী, কোড়া, কেদারিকা—ইহারা মল্লার
রাগের পত্নী। বেলোয়ারী, গোড়ী, গান্ধারী, সুভাগা, কৌমারীও
বৈরাগী—ইহারা শ্রীরাগের প্রিয়তমা। তোড়ী, পঞ্চমী, ললিতা,
পঠমঞ্জরী, গুর্জরী ও বিভাষা—ইহারা বসন্তরাগের প্রিয়তমা।
মায়ুরী, দীপিকা, দেশকারী, পাহিড়া, বরাড়ী, মারহট্টা—ইহারা
হিন্দোলরাগের স্ত্রী। নটিকা, ভূপালী, রামকেরী, গড়া,
কামোদী ও কল্যাণী—ইহারা কর্ণাটরাগের প্রিয়তমা।
নানাদেশে পৃথক্ পৃথক্ নামে প্রসিদ্ধ রাগসকলের যথাযথ
স্বরূপনির্দেশ করিতে বীণাপাণি আদি কেহই সমর্থ নহে।
তন্মধ্যে সেই সকল রাগ তিন প্রকার—সম্পূর্ণ, ষাড়ব ও ঔড়ব।
যে সকল রাগ সাতটি স্বরে উৎপন্ন হয় তাহারা “সম্পূর্ণ”।
শ্রীরাগ, নট, কর্ণাট, গুপ্তবসন্ত, শুদ্ধভৈরব, বঙ্গালী, সোমরাগ,
আম্রপঞ্চম, কামোদ, মেঘরাগ, জাবিড়, গোড়, রবাটী, গুর্জরী,
তোড়ী, মালবশ্রী (মালসী), সৈন্ধবী (সিন্ধুড়া), দেবক্রী,
রামক্রী, প্রথমমঞ্জরী (পঠমঞ্জরী), নাট, বেলাবলী, গৌরী—
ইত্যাদি রাগ সম্পূর্ণ বলিয়া কথিত। সঙ্গীতসারে কথিত আছে
—নাট, ঘটরাগ, নটনারায়ণ, ভূপতি (ভূপালী), শঙ্করাভরণ—
ইহারা পূর্ণরাগ বলিয়া প্রসিদ্ধ। কোহল বলেন—পূর্ণরাগের

গানে আয়ুঃ, ধর্ম, যশঃপ্রচার, বুদ্ধি, সুখ, ধন ও রাজ্যের ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া থাকে ।

যে সকল রাগ ছয়টি স্বর হইতে উৎপন্ন তাহাদিগকে 'ষাড়ব' কহে । গোড়, কর্ণাটগোড়, দেশী, ধনাসিকা (ধানশ্রী), কোলাহলা, বল্লালী, দেশ, শাবরী (আশাবরী), খম্বাবতী (ক্ষমাবতী), হর্ষপুরী, মল্লারী, হুংচিকা—ইত্যাদি রাগ হরিনায়কের মতে ষাড়ব বলিয়া কথিত । সঙ্গীতসারে ষাড়বগণনায় শ্রীকণ্ঠ, ভৌলী, তারা, ষালগ, গোড়, শুদ্ধাভীরী, মধুকরী, ছায়া, নীলোৎপলা—ইহাদের উল্লেখ আছে । পূর্বাচার্য্যগণ সংগ্রামে বীরত্ব, রূপ, লাবণ্য ও গুণের খ্যাতি ষাড়বরাগের গানফল বলিয়া কহিয়াছেন । যাহারা পঞ্চ স্বরে উৎপন্ন তাহারা 'ঔড়ব'-নামে খ্যাত । মধ্যমাদি, মল্লার দেশপাল, মালব, হিন্দোল, ভৈরব, নাগধ্বনি, গোণ্ডকুতি (গুণকিরী), ললিতা, ছায়া, তোড়ী, বেলাবলী, প্রতাপসিন্ধু—ইত্যাদি লোকচিত্তরঞ্জক রাগসকল ঔড়ব । (আদিপদের দ্বারা তুরস্ক, গোড় প্রভৃতিও বুঝিতে হইবে । ইহার ফল বিষয়ে কোহল বলেন— ব্যাধিনাশ কার্য্যে, শত্রুনাশে, ভয়শোক দূর করিতে, গ্রহশান্তির প্রয়োজনে অনুষ্ঠিত ব্যাপারে প্রধানতঃ ঔড়ব রাগসকল গান করিবে । এই বিষয়ে হরিনায়ক বলেন—এই তিন শ্রেণীর রাগসকলের পরস্পর মিশ্রণে বহুপ্রকার নাম হইয়া থাকে । তন্মধ্যে শ্রুতিমধুর কতকগুলিকে 'সঙ্কীর্ণ' বলা হয় ।

দেশ-নামিকা ও মল্লারী-নামিকার অংশদ্বয় হইতে এই "পৌরবী" সংজ্ঞা হইয়াছে । বারাটী ও নাটকর্ণাট হইতে এই

‘মধুর কল্যাণী’ নাম উৎপন্ন হইয়াছে। তোড়ী ও ধনাসী হইতে ‘সারঙ্গ’ উৎপন্ন। শ্রীরাগ ও গৌড়রাগ হইতে ‘গৌরী’র উৎপত্তি। নাট ও মল্লারের অংশদ্বয় হইতে ‘নটমল্লারিকা’ উৎপন্ন হইয়াছে। দেশ ও শাবরীর যোগে ‘বল্লবীর’ উৎপত্তি কথিত। কর্ণাট ও ভৈরবের অংশদ্বয় হইতে সকম্পা ‘কর্ণটিকা’র উদ্ভব। সৌন্দর্যী ও তোড়ীর যোগে ‘সুখাবরী’ উৎপন্ন। মল্লার, সৈন্দর্যী ও তোড়ীর যোগে ‘আশাবরীর’ উৎপত্তি। গুজ্জরী ও দেশীর যোগে ‘রামকেলি’ উৎপন্ন। সঙ্কীর্ণ লক্ষণের আরও বহু আছে। যে-দেশে যে-সকল সঙ্কীর্ণরাগ যেরূপ শ্রুত হয়, বিজ্ঞগণ তাহাদিগকে সেইরূপই জানিবেন। গানে রাগিনীসকলের নির্দিষ্ট সময়ের ব্যতিক্রমে নিশ্চিতই সর্বনাশ আনয়ন করিয়া থাকে। কিন্তু সম্মিলিতভাবে গানে, রাজার আদেশক্রমে ও রঙ্গস্থলে ঐরূপ ব্যতিক্রম দোষকর হয় না। যাহারা অর্থলোভে, অজ্ঞাতবশতঃ ও শোকে কাল ব্যতিক্রমপূর্বক গান করে সুরমা গুজ্জরী রাগিনী তাহাদের সেই দোষ নষ্ট করে বলিয়া কথিত হয়। বসন্ত, রামকেলি ও সুরমা গুজ্জরী সর্বকালেই গীত হইয়া থাকে। তাহাতে কোন দোষই উৎপন্ন হয় না। রাত্রিতে দশদণ্ডের পরবর্ত্তিকালে সকল রাগিনীরই গানের বিধি আছে।

অনিবদ্ধ ও নিবদ্ধ—গান এই দুইপ্রকার কথিত হয়। রাগের আলাপ মাত্রকে অনিবদ্ধ কহে। বন্ধন বা রচনাহীন বলিয়া আলাপকে অনিবদ্ধ বলা হয়। রাগের প্রকাশকার্যকে ‘আলাপ’ বলিয়া থাকে। নারদসংহিতায়—যেমন ছঙ্কার হইতে ওঙ্কাররূপে বেদের প্রকাশ, সেইরূপ ছঙ্কার হইতে তা-না-

প্রভৃতি শব্দ ধীরে ধীরে উথিত হয়। তা-শব্দে গৌরী, না-শব্দে হর, আ-শব্দে হরি, রি-শব্দে ব্রহ্মা কথিত হন। এইরূপে আ-ত-না-রি-শব্দে হর প্রভৃতি সকলেরই প্রকাশ উদ্দিষ্ট হইয়া থাকে। হরিনায়ক বলেন—সঙ্গীতজগৎ স-রি-গ-মাদি সমন্বিত গমকের বিচিত্রতায়ুক্ত ও নানা ভঙ্গির দ্বারা মনোহর রাগ-প্রকাশকে ‘আলাপ’ কহেন।

বর্ণালঙ্কার দুইপ্রকার—অর্থহীন ছন্দাঙ্গাদি শব্দ এবং সঙ্গীত শাস্ত্রোক্ত স-রি-গ-ম প্রভৃতি বর্ণালঙ্কার। আলাপের বহুপ্রকার ভেদ আছে। ধাতু ও অঙ্গে বদ্ধ গীতকে ‘নিবন্ধ’ কহে। সেই নিবন্ধ শুদ্ধ, ছায়ালাগ ও ক্ষুদ্র—এই তিন প্রকার। আলাপ, ধাতু ও অঙ্গের সংযোগে ‘শুদ্ধ’ কথিত হয়। এ স্থলে সাম্প্র-দায়িকগণ বলেন—আলাপ-অর্থে ‘সার্থকপদ’। হরিনায়ক কিন্তু অক্ষরবর্জিত গমকের আলাপকে আলাপ কহিয়াছেন। শুদ্ধ, শালগ্ ও সঙ্কীর্ণভেদে গীত ত্রিবিধ বলিয়া কথিত। তন্মধ্যে ক্ষুদ্র গীতই সঙ্কীর্ণশব্দে নির্দিষ্ট হইয়াছে।

হরিনায়ক বলেন—প্রবন্ধ, বস্তু ও রূপক—নিবন্ধের এই তিন প্রকার সংজ্ঞা আছে। যে বন্ধন চারিধাতু ও ছয় অঙ্গে রচিত হইয়া প্রকৃষ্ট হয় তাহাকে ‘প্রবন্ধ’ কহে। ইহাতে ‘শুদ্ধ’ গীতই প্রবন্ধ বলিয়া কথিত হইল। তিন ধাতু ও পঞ্চ অঙ্গে রচিত বন্ধকে ‘বস্তু’ এবং দুই ধাতু ও দুই অঙ্গে রচিত বন্ধকে ‘রূপক’ বলে। প্রবন্ধ অর্থাৎ গীতের অবয়বকে ধাতু কহে। উদ্গ্রাহ, মেলাপক, ক্রব ও আভোগ এই ক্রমে সেই ধাতু

চারি প্রকার। প্রথমভাগ—উদ্গ্রাহ, তারপর—মেলাপক, তারপর স্থিরত্বহেতু—ধ্রুব, শেষ ভাগ—আভোগ বলিয়া কথিত। শিরোমণিতে আছে—পূর্বাচার্য্যগণ গীতের প্রথম পাদকে উদ্গ্রাহ, মধ্যপাদকে নিশ্চলতাহেতু ধ্রুব এবং শেষপাদকে আভোগ কহিয়াছেন। হরিনায়ক বলেন—ধ্রুব ও আভোগের মধ্যে অবস্থিত অপর ধাতুর নাম—অন্তরা। আভোগে কবির ও নায়কের নামের উল্লেখ হয়।

প্রবন্ধ বা গীতের ছয়টি অঙ্গ, যথা—স্বর, বিরুদ্ধ, পদ, তেনক, পাঠ, তাল। স-রি-গ-ম প্রভৃতিকে ‘স্বর’ কহে; যাহা গুণের উল্লেখ করে তাহাকে ‘বিরুদ্ধ’ কহে; গুণব্যতীত অণুবাচক যাহা তাহা ‘পদ’ বলিয়া কথিত হয়; তেনা—ইহার দ্বারা ‘তেন’-শব্দ, ইহা মঙ্গলবাচক বলিয়া নিরূপিত; ধাং ধাং ধুগ ধুগ প্রভৃতি বাগ্মাক্ষর সমূহকে ‘পাঠ’ বলে; আদি যতি প্রভৃতিকে ‘তাল’ বলে। সঙ্গীতপারিজাতে—পদ, তাল, স্বর, পাঠ, তেন, বিরুদ্ধ—এই ছয়টিকে মনীষিগণ গীতের অঙ্গ বলিয়াছেন। তন্মধ্যে বাচকশব্দ পদ, চচ্চৎপুটাদি তাল, ষড়্‌জ-প্রভৃতি—স্বর, বাত্ব হইতে উদ্ভূত অক্ষর—পাঠ; মঙ্গলার্থ—তেন এবং গুণনামযুক্ত শব্দ বিরুদ্ধ। প্রবন্ধ বা গীতের ভরতমুনি-সম্মত পাঁচটিমাত্র জাত হয়—মেদিনী, নন্দিনী, দীপনী, পাবনী ও তারবলী। এই সকল জাতির লক্ষণ কথিত হইতেছে। প্রাচীন সঙ্গীতজ্ঞগণ ছয় অঙ্গবিশিষ্ট গীতকে মেদিনী, পাঁচ অঙ্গবিশিষ্টকে নন্দিনী, চারি অঙ্গবিশিষ্টকে দীপনী, তিন অঙ্গবিশিষ্টকে পাবনী এবং অঙ্গদ্বয়যুক্তকে

তারাবলী বলিয়াছেন। একাঙ্গ প্রবন্ধ হয় না। সঙ্গীত-পারিজাতে উক্ত প্রকার বর্ণন করিয়াছেন।

উত্তম কবি এক তালে, দুই, তিন বা বহু বাদ্যের সহিত ইচ্ছানুরূপ গীতসকল নিশ্চয়ই রচনা করিতে পারে। বহুতালবিশিষ্ট প্রবন্ধ এক বা বহু রাগে বাদ্যাক্ষর প্রভৃতির বিধানপূর্বক রচনা করিবে। উহার ভেদ বহুতর। কথিত আছে যে, রাগের, তালের, বাদ্যের বিশেষতঃ প্রবন্ধগীতের অবধি এই জগতে নাই।

ভরতমুনি-কথিত এলা প্রভৃতি ছুঃসাধ্য প্রবন্ধসকল আছে। তন্মধ্য হইতে পণ্ডিত হরিনায়ক ছাব্বিশটি বলিয়াছেন। যথা,—পঞ্চতালেশ্বর, বর্ণেশ্বর, অঙ্গচারিণী, স্বরার্থমাতৃকা রাগ-কদম্বক, স্বরাদ্যকরণ' তালার্ণব, শ্রীরঙ্গ, শ্রীবিলাস, পঞ্চভঙ্গি, পঞ্চানন, মাতিলক, সিংহনীল, ত্রিভঙ্গি, হংসনীল, হরিবিলাস, সুদর্শন, স্বরাঙ্গ, শ্রীবর্দ্ধন, হর্ষবর্দ্ধন, বীর, শ্রীমঙ্গল, লাহড়ী, নবরত্ন, সরভনীল, কণ্ঠভরণ—এই ছাব্বিশটি। চন্দ্রপ্রকাশক প্রভৃতি আরও অল্প ছয় প্রকার আছে।

যে প্রবন্ধে স-রি-গ-ম প্রভৃতি স্বরাক্ষরদ্বারাই ইষ্টার্থ ব্যক্ত হয় তাহাকে স্বরার্থ কহে। শুদ্ধ ও মিশ্রভেদে উহা দুই-প্রকার। যাহা শুদ্ধ-প্রবন্ধের ছায়াতে সংলগ্ন হয় তাহাকে 'ছায়ালগ্ন' বলে। তাল, বাদ্য প্রভৃতির যোগে শৃঙ্খলিত হইয়া উহা চিত্তরঞ্জক হয়। বহুতালের একত্র গুণফলকে 'শৃঙ্খল' কহে। ছায়াতে সংলগ্ন হয় অর্থাৎ শুদ্ধ প্রবন্ধের যৎকিঞ্চিৎ লক্ষণাবিত হইয়া ইহা উৎপন্ন হয়। উক্ত শুদ্ধপ্রবন্ধের রূপের

ছায়ামাত্রও যদি কোন প্রবন্ধে থাকে, তাহাকে ভরত প্রভৃতি মুনিগণ ‘ছায়ালগ’ বলিয়া থাকেন। ইহার ‘সালগ’ এই নামান্তরও আছে। তাই হরিনায়ক বলেন—যাহা ছায়লগ-শূড় তাহাই সাগল। সঙ্গীত দামোদর ও পঞ্চমসার-সংহিতার আছে—ধ্রুবক, মণ্ডক, প্রতিমণ্ড, নিশারুক, বাসক, প্রতিতাল, একতালী, যতি, ঝুমরি—ইহারা সাগল-শূড়ের ভেদ। ধ্রুবক ষোল প্রকার, মণ্ডক ছয় প্রকার, প্রতিমণ্ড পাঁচ, নিশারুক সাত, বাসক চারি, প্রতিতাল চারি একতালী তিন, যতি চারি, এবং ঝুমরি এক প্রকার। কেহ কেহ বলেন—চর্চরীকাদি অপর দশ প্রকার সালগ আছে। এইরূপে উনবিংশতি প্রকার সালগ প্রসিদ্ধ। আদি, যতি, নসারু, অঙ্ক, ত্রিপুট, রূপক, ঝম্প, মণ্ড, ও একতালী—এই নয় প্রকার তাল কথিত আছে। এই নয় তালে রচিত হইলে তাহাকে ‘শূড়’ কহে। এই প্রকার শূড়—গানে বাদ্যে ও নৃত্যে চিত্তরঞ্জক হয়।

তাল ৪—যেমন কর্ণধার ব্যতীত নৌকার শুদ্ধগতি হয় না। তদ্রূপ তাল ব্যতীত গীতাদির গতি শুদ্ধি হয় না। সেই তাল-শব্দের বহু প্রকার ব্যুৎপত্তি আচার্য্যগণ বলিয়াছেন। তাল সম্বন্ধে হরিনায়ক বলেন যেহেতু ইহা সময়ের সমতা বিধানপূর্ব্বক ও অধিক রঞ্জকতাদ্বারা সঙ্গীতের স্থিরতা সম্পাদন করে, অতএব ইহা ‘তাল’ বলিয়া কথিত। সঙ্গীতসারে আছে—ত-শব্দে শিব এবং ল-শব্দে শক্তিকে বুঝায়। অতএব শিবশক্তির যোগে তালের উৎপত্তি। তলি-ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয় করিয়াও তাল-শব্দ নিষ্পন্ন হইতে পারে। অথবা ত-কার ও ল-কারের যোগে

তাল-শব্দ হইয়াছে। রত্নমালায়—ত-কার কার্ত্তিকৈয়কে, অ-কার বিষ্ণুকে, ল-কার বায়ুকে নির্দেশ করে। অতএব তালে ঐ সকল দেবতা অবস্থিত আছেন। বাচস্পতি বলেন— হস্তাঙ্গুলির প্রসারণ ও আকুঞ্চন প্রভৃতি যে কার্য্য তাহার দ্বারা কালের পরিমাণ হয় বলিয়া উহা শাস্ত্রে তাল বলিয়া কথিত। একাধিক শত তালের নাম—চঞ্চুপুট, চাচপুট, ষট্‌পিতা-পুত্রক, সম্পাক্ষেপ্তক, উদঘট্ট, আদিতাল, দর্পণ, চর্চরী সিংহনৌল, কন্দর্প, সিংহবিক্রম, শ্রীরঙ্গ, রঙ্গলীল, রঙ্গতাল, পরিক্রম, প্রত্যঙ্গ, গজলীল, ত্রিভিন্ন, বীরবিক্রম, হংসলীল, বর্ণলীল, রাজচূড়ামণি, রঙ্গদ্যুত, রাজতাল, সিংহবিক্রীড়িত, বনমালী, বর্ণতাল, রঙ্গপ্রদীপ, হংসনাদ, সিংহনাদ, মল্লিকামোদ, শরভনৌল, রঙ্গাভরণ তুরগলীল, সিংহনন্দন, জয়শ্রী, বিজয়ানন্দ, প্রতিতাল, দ্বিতীয়ক, মকরন্দ, কীর্ত্তিতাল, বিজয়, জয়মঙ্গল রাজবিষ্ণাধর, মণ্ড, জয়তাল, কুড়ুকক, নিঃশারুক, ক্রীড়া, ত্রিভঙ্গি, কোকিলপ্রিয়, শ্রীকান্ত, বিন্দুমালী, সমতাল, নন্দন, উদাক্ষণ, মল্লিকা, চেক্ষিকা, বর্ণমণ্ডিকা, অভিনন্দ, অন্তরক্রীড়া, লঘুতাল, দীপক, অনঙ্গতাল, বিষম, সান্দীকুন্দ, মুকুন্দ, একতালী, কঙ্কাল, চতুস্তাল, খংখুড়ী, অভঙ্গ, রাজঝঙ্কার, লঘুশেখর, প্রতাপশেখর, জগবাম্প, চতুমুখ ঝঙ্কার, প্রতিমণ্ড, তৃতীয়ক, পার্বতীলোচন, সারঙ্গ, নন্দিবর্দ্ধন, লীলাবিলোকিত, ললিতাপ্রিয়, জনক, লক্ষ্মীশ, রাগবর্দ্ধন এবং উৎসব। সঙ্গীতদামোদর প্রভৃতি কোন কোন গ্রন্থে অন্তরূপ নামও দেখা যায়। ঋষিগণের নানামতবশতঃ নামের বিকল্পে কি ক্ষতি ?

অনুক্রম, ক্রম, লঘু, গুরু, প্লুত—এই ক্রমে তালের পাঁচটি অঙ্গ আছে। অনুক্রম ব্যতীত অপর সকলের সাক্ষেতিক সংজ্ঞা যথাক্রমে দ, ল, গ ও প। তন্মধ্যে লঘু একমাত্রাবিশিষ্ট, গুরু দুইমাত্রা, প্লুত তিন মাত্রা, ক্রম অর্দ্ধমাত্রা অনুক্রম ক্রমের অর্দ্ধমাত্রা। অনুক্রমের অপর নাম 'বিরাম'। অনুক্রমাদির আকারিক চিহ্ন যথা,—লঘু (i) গুরু (৬) প্লুত (iii)। উচ্চ চারি অঙ্গুলিতে ক্রম হয়। অষ্টাঙ্গুলিতে লঘু, ষোল অঙ্গুলিতে গুরু এবং চব্বিশ অঙ্গুলিতে প্লুত হয়। কিঞ্চিৎ করসঞ্চালনে অনুক্রম হয়। 'সশব্দ' ও 'নিঃশব্দ'-ভেদে তালের দুইপ্রকার 'ধরণ' আছে। উচ্চ আঘাতকে 'সশব্দ' কহে। লঘুতালঙ্গে একটীমাত্র 'নিঃশব্দ'। গুরুতালঙ্গের দুইটী আঘাত—একটী সশব্দ, অপরটী নিঃশব্দ। লঘুর সেই নিঃশব্দটীও অর্দ্ধ হয়, তখন অর্দ্ধনাদহেতু তাহাকে 'ক্রম' কহে। প্লুততালঙ্গে একটী আঘাত 'সশব্দ' তারপর দুইটী আঘাত 'নিঃশব্দ'। তন্মধ্যে একটী উর্দ্ধে ও অপরটী অধোভাগে পতিত হয়। তালের প্রভেদ অনন্ত প্রকার শ্রীরাসমণ্ডলে সকলে মূর্ত্তিমন্ত হয়।

তাল-ধাতুযুক্ত বাক্যমাত্রকে 'ক্ষুদ্র বলা হয়। সেই ক্ষুদ্র-গীত চারিপ্রকার। সেই সকল ভেদমধ্যে প্রথম চিত্রপদা, তারপর চিত্রকলা, ধ্রুবপদা ও পঞ্চালী। যে ক্ষুদ্রগীতে কেবল পদের বৈচিত্র্য দৃষ্ট হয়, ধাতু প্রভৃতির বিচিত্রতা নাই, তাহাকে চিত্রপদা-নামে জানিবে। এস্থলে পদবৈচিত্র্যশব্দে কোমল অনুপ্রাস ও প্রসাদাদিগুণবিশিষ্টতা বুঝিতে হইবে। যদি উদ্গ্রাহ ও আভোগে মাত্রা সমান কিন্তু ধ্রুবপদে ন্যূন হয় এবং

তিন হইতে আট পর্য্যন্ত পাদসংখ্যা হয়, তাহাকে ‘চিত্রকল’ বলিয়া জানিবে।

গীত—দিব্য, মানুষও দিব্য-মানুষ, এই তিনপ্রকার। সংস্কৃত-ভাষায় রচিত গীত—দিব্য ; প্রাকৃতভাষায় রচিত গীত—মানুষ ; সংস্কৃত-প্রাকৃত-মিশ্রিত ভাষায় রচিত গীত—দিব্য-মানুষ। কেহ কেহ দেশবিশেষজাত ভাষার রচিত গীতকে ‘মানুষ’ বলিয়া থাকেন। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশ, দেশী ভাষার উৎপত্তিস্থল। যে যে দেশে যে ভাষা সকলের বিশেষ প্রিয়, তাহা সেই সেই দেশবাসী লোকের কথা হইতে সংগ্রহ করিয়া গীতে সংযোজন করিবে।

কোহলীয়ে—সম, অর্দ্ধসম ও বিষম—এই ভাবে গীত ত্রিবিধ। সমান মাত্রায়ুক্ত চারি চরণে গীতের ‘সম’-সংজ্ঞা হয়। যে গীতের প্রথম ও তৃতীয় এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণ সমান তাহাকে ‘অর্দ্ধসম’ কহে। যাহার চারি চরণই মাত্রাসংখ্যায় পৃথক্ পৃথক্ হয়, ভরতাদি মুনিগণ তাহাকে ‘বিষম’ কহিয়া থাকেন।

গীতের গুণঃ—গ্রহ, লয়, যতি, বিচিত্রমান, ধাতুর পুনরুক্তি, নবনবতা, মাত্রার অনেকার্থতা, রাগের সুরম্যতা, গমক, অর্থের বিশুদ্ধতা, তেন্না, পাঠ ও স্বরের বিবিধভাবে সংযোজন। গুণ-অলঙ্কার-রসযুক্ত বাক্যের সমাবেশ-বিধান ইহাই পূর্বেবাক্ত সক গুণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যিক। তাল গানের গতির সমতা বিধানকারক। তাহার তিনটী ‘গ্রহ’। তাহারা সকল গীত-শাস্ত্রে অনাগত-অতীত-সমনামে অভিহিত। যখন গীতারস্তুর

পূর্বের দুইটি অক্ষর উচ্চারণ করিয়া তালের স্থাপন হয়, তখনই 'অনাগত-গ্রহ' কথিত হয়। এ স্থলে গীতের আদিত্যে যে অক্ষর অধিক উচ্চারিত হয়, তাহা 'অনাগত'। অর্থাৎ তাহা তাল মধ্যে কখনও গৃহীত হয় না। যখন গীতের উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই তালের সঙ্গতি হয় তখন সমকালে উদয়হেতু 'সমগ্রহ' কথিত হয়। তালের যে অংশ পরে পড়িবে, যদি তাহা পূর্বের স্থাপন করিয়া তাল গৃহীত হয়, তখন 'তালগ্রহ' হয়। বাচস্পতি বলেন— গীত ও বাণের পদস্থাপন-কার্যের, তদ্রূপ ক্রিয়া ও তালের পরস্পর সমতা—লয়,—পণ্ডিতগণ এইরূপ বলেন। হরিনায়ক বলেন— গানক্রিয়ার মধ্যে বিশ্রামকে 'লয়' বলেন। দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিত-ভেদে উহা তিনপ্রকার বলিয়া প্রাজ্ঞগণ বলেন। দ্রুতলয়ের একমাত্রা, দ্বিগুণ বিশ্রামে মধ্য-লয়, দ্রুতের দ্বিগুণে বিলম্বিত-লয়। এই সকল লয় সকল তালেই— অবস্থিত। লয়প্রবর্তনের নিয়মই 'যতি'। শ্রোতাবহা, সমা ও গোপুচ্ছিকা—এই তিন প্রকার যতি হয়।

সঙ্গীতশাস্ত্রে বিশ্রান্তিকারিণী তালক্রিয়াকে 'মান' কহে। তালের বিশ্রামকারক বলিয়া মান তালের সমাপ্তিজ্ঞাপক। যখন মান ধ্রুবপদে দ্বিতীয় কলায় পড়ে তখন সেই তালের তালজ্ঞসম্মত 'বর্দ্ধমান আবর্ত' সংজ্ঞা হয়। যখন মান ধ্রুবপদে শেষ কলায় পড়ে তখন মনীষিগণ উহাকে 'হীমমান আবর্ত' বলিয়া থাকেন। কর্ণপ্রিয়, যতিস্থ, ভঙ্গযুক্ত, সুখাবহ, মন্দ্রমধ্য, অতারাঢ্য—এই সকল রাগরম্যতার গুণ ॥

শ্রোতৃবর্গের চিত্তের আনন্দপ্রদ স্বরের কম্পন—'গমক'।

তাহার পঞ্চদশ প্রকার ভেদ কথিত হইতেছে। যথা—তিরিপ, স্কুরিত, কম্পিত, নীল, আন্দোলিত, বলি, ত্রিভিন্ন, কুবল, আহত, উন্মামিত, প্লাবিত, হৃকৃত, মুদ্রিত, নামিত ও মিশ্রিত। গমকসকলের লক্ষণ কথিত হইতেছে—ডমরুধ্বনির লঘুতম কম্পনের অনুকরণে সুন্দর এবং দ্রুতমাত্রার চতুর্থাংশবেগে তিরিপ-গমক হয়। দ্রুতমাত্রার তৃতীয়াংশে বেগ হইলে ‘স্কুরিত-গমক’ হয়। দ্রুতমাত্রার অর্ধপরিমাণে গান হইলে উহাকে ‘কম্পিত-গমক’ বলে। দ্রুতমাত্রায় বেগ হইলে ‘নীল-গমক’, লঘুমাত্রার বেগে ‘আন্দোলিত-গমক’ হয়। রাগবশে নানাপ্রকার বক্রতায়ুক্ত হইলে ‘বলি-গমক’ হয়। তিনটী ভিন্নস্থানে অবিশ্রান্ত ঘনভাবে স্বর হইলে ‘ত্রিভিন্ন-গমক’ হয়। বলি-গমক কোমল-কণ্ঠে গ্রন্থিযুক্ত হইলে ‘কুবল-গমক’ হয়। পূর্ব স্বরকে আঘাত করিয়া নিবৃত্ত হইলে ‘আহত-গমক’ হয়। যে গমক উত্তরোত্তর স্বরসকলে ক্রমে সঞ্চারণ করে তাহার নাম ‘উন্মামিত-গমক’। উচ্চগানে কম্পনকে ‘প্লাবিত-গমক’ কহে। মনোজ্ঞ হৃকার-গর্ভ গমকের নাম ‘হৃকৃত’। মুখ বন্ধ করিয়া যাহার উদ্ভব তাহা ‘মুদ্রিত-গমক’। স্বরের নীচুভাবে ‘নামিত-গমক’ কথিত হয়। ইহাদের মিশ্রণে ‘মিশ্র-গমক’ হয়। মিশ্র-গমকের অনেক ভেদ আছে। উক্ত গমকের অভ্যাস প্রকার এইরূপ—মাঘ ও পৌষ মাসের রাত্রিতে শেষ প্রহর মাত্র অবশিষ্ট থাকিতে সাধক জলমধ্যে থাকিয়া এই সকল গমকের সাধন করিবে।

বাক্যের উচ্চারণে সুখতা-অদোষ-রসযুক্ত সম্যক্ অর্থ-বোধ হইলে তাহাকে ‘অর্থনৈর্মল্য’ কহে। তাহাতে তেন

পাঠ-স্বরের বিচিত্রভাবে সন্নিবেশ কর্তব্য। পাঠ ও স্বরের পরে তেনের প্রয়োগ বিহিত, কখনও পূর্বেই নহে। তালহীনে কায়রোগ এবং ধাতুহীনে ধনক্ষয় হয়। যে গানে ধাতু-মাতু-পদ নাই সেই গীতকে 'রিপু কহে'। কথার স্থলন, 'তালরহিত ভাবে রচনা, ধাতুমা তু প্রভৃতির অভাব, কটুক্তি, রসাদিহানি শ্রুতিকর্কশতা প্রভৃতি গীতের দোষ। যদিও গীতে উক্ত বহু দোষ আছে, তথাপি তাহাদের বিশেষ উল্লেখ হইল না। গানে যদি তাহারা প্রকাশ পায় সেই স্থলে তাহা লক্ষ্য করিবে। 'গায়ক' উত্তম, মধ্যম ও অধম—এই তিনপ্রকার। যে গায়ক মার্জিতস্বর, সুগঠিতদেহ, বিবিধ রাগিণীর ভেদজ্ঞাতা, গ্রহ-মান-লয়ে অধিকার সম্পন্ন, তালজ্ঞ, ক্লান্তিরহিত, ত্রিভিন্নাদি গমকে সহজ ও সাবলীল গতিবিশিষ্ট, প্রবন্ধগানে নিপুণ, গান ক্রিয়াতে সাবধান, আয়ত্তকণ্ঠ, স্থায়িজ্ঞ, দোষরহিত ও মেধাবী—সে 'উত্তম'। তন্মধ্যে কতিপয় গুণাবিত গায়ক 'মধ্যম', গুণযুক্ত হইলেও বহুদোষসম্পন্ন গায়ক—'অধম'। গীতজ্ঞগণ পাঁচ প্রকার গায়নের কথা বলিয়া থাকেন—শিক্ষাকার, অনুকার, রসিক, রঞ্জক ও ভাবক। সমগ্র শিক্ষাদানে দক্ষ গায়ক সর্বসম্মত—'শিক্ষাকার'; পরের ভঙ্গির অনুকারী—'অনুকার'; রসাবিষ্ট গায়ক—'রসজ্ঞ'; শ্রোতৃগণের আনন্দবিধানকারী—'রঞ্জক'; গীতের অধিক আধানহেতু—'ভাবক'। অত্র প্রকারে গায়ক আবার তিন প্রকার—একল, যমল (যুগ্ম), বৃন্দ। যে একাকীই গান করে, সে 'একল' গায়ক; অপর একজনের সহিত গানকারী—'যমল'; বহুর সহিত গানকারী—'বৃন্দ' গায়ক।

গায়ক এইরূপ দোষযুক্ত হয়—ভীত, কথার অস্পষ্টতা, মস্তক-সঞ্চালন, ফুৎকারযুক্ত, স্বরের বিকৃতি, দন্ত দৃষ্ট হওয়া, চক্ষু মুদ্রিত করা, সমারন্ধ্রগ্রামে স্থির থাকিতে না পারা, গলা বাঁকাইয়া গান, স্বরের হ্রস্বতা (দমের অল্পতা), এক রাগিণীর সহিত অণু রাগিণীর মিশ্রণ, অঙ্গসঞ্চালন, অণুমনস্কতা, বৈরস্যোৎপাদন, কর্কশস্বর, ক্ষততা। আরও—বেতালা, গানের মাত্রার দীর্ঘতাকরী, ভীষণাকার; ছাগবৎ কর্ণধ্বনিবিশিষ্ট, চঞ্চল, গণ্ড স্ফীত করিয়া গানকারী, নাকি-স্বরে গায়ক,—গায়ক এইরূপ দোষযুক্ত হয়। আরও বহুপ্রকার দোষ আছে, তাহা বাহুল্য ভয়ে কথিত হইল না।

বাদ্যঃ—যে হেতু গীত এবং তাল বাদ্য ব্যতীত শোভা পায় না, অতএব এস্থলে মঙ্গলবিধায়ক বাদ্যের বিষয় কথিত হইতেছে। তত, আনন্দ, শুষ্কির ও ঘন—এই চারিপ্রকার বাদ্য। বীণাপ্রভৃতি তারের যন্ত্রকে 'তত', মুরজপ্রভৃতি চর্ম্মের আবরণযুক্ত যন্ত্রকে 'আনন্দ', মুখবায়ুর দ্বারা বাদিত বংশী প্রভৃতিকে 'শুষ্কির' এবং কাংশ্র-করতাল প্রভৃতিকে 'ঘন' কহে। সঙ্গীতদামোদরে—অলাবনী, ব্রহ্মবীণা, কিন্নরী, লঘুকিন্নরী, বিপঙ্কী, বল্লকী, জ্যোষ্ঠা, চিত্রা, ঘোষবতী, জয়া, হস্তিকা, কুঞ্জিকা, কুম্বী, শারঙ্গা, পরিবাদিনী, ত্রিশরী, শতচন্দ্রী; নকুলোষ্ঠী, কংসরী, ঔড়স্বরী, পিনাকী, নিবন্ধ, পুঙ্কল, গদাবারণহস্ত, রুদ্রবীণা, শরমণ্ডল, কপিলাস, মধুসুন্দী, ঘোণা প্রভৃতি তত বা তন্ত্রীযন্ত্রের বিধি প্রকার ভেদ। আর এক প্রকার—কচ্ছপী বীণা, উহাই রূপবতী বীণা। মর্দল, মুরজ,

ঢকা, পটহ, চাঙ্গু, পণব, কুণ্ডলী, ভেরী, ঘণ্টাবাদ্য, ঝঙ্কার, ডমরু, টমকি, মন্থ, ছড়কা, মডু, ডিগুম, উপাঙ্গ, দর্দুর ইত্যাদি আনদ্ধ বাদ্যযন্ত্র আনদ্ধ মধ্যে মর্দল শ্রেষ্ঠ।

সঙ্গীত দামোদরে—মৃদঙ্গ—মৃত্তিকানির্মিত। তদ্রূপ মর্দল সকল উত্তম বাদ্যের মধ্যে উত্তম ইহার সঙ্গলাভে অপর সকল বাদ্য শোভন হয়। সঙ্গীতপারিজাতে—মৃদঙ্গের মধ্যাংশে ব্রহ্মা সর্ব্বদা অবস্থান করেন। যেমন দেবগণ ব্রহ্মলোকে বাস করেন তদ্রূপ এইস্থলেও দেবগণ আছেন। যেহেতু মৃদঙ্গ সর্ব্বদেবময়, অতএব ইহা সর্ব্বমঙ্গল। উমাপতি রচিত সেই সকল পাঠবর্ণ বিংশতিসংখ্যক। মৃদঙ্গবাদক ধীর, বাদননিপুণ, বাবুপটু, বাদ্যাকর বা বোলপ্রকাশক, নানাভাবে বাদ্যের পারবর্তন, ভঙ্গির সহিত নৃত্যে কুশল, গানের গতির সহিত সঙ্গীতে উত্তম অভ্যস্ত, সন্তুষ্টচিত্ত, অনায়াসে বাদনকারী, লঘুহস্ত—এই সকল লক্ষণবিশিষ্ট বলিয়া কথিত বংশ, পারী, মধুরী, তিত্তিরী, শঙ্খ, কাহল, তোড়হী, মুরলী, বুক্কা, শৃঙ্গিকা, স্বরনাভি, শৃঙ্গ, লাপিকবংশ এবং চর্ম্মবংশ—শুষ্টির বাদ্যে এই সকল ভেদ পূর্ব্বসুরিগণ বলিয়াছেন। বংশী সুন্দর, সরল ও গ্রন্থিদোষ-রহিত। ইহা বেণুনির্মিত, খদিরকাষ্ঠনির্মিত, রক্তচন্দন নির্মিত, শ্বেতচন্দননির্মিত, সুবর্ণনির্মিত বা হস্তিদন্তনির্মিত হইবে। ইহার গর্ভচ্ছিদ্র কনিষ্ঠাঙ্গুলি পরিমিত হইবে। বংশী ন্যূনপক্ষে পঞ্চাঙ্গুল দীর্ঘ হইতে পারে। এক এক অঙ্গুলি বৃদ্ধি-ক্রমে আঠার অঙ্গুলি পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিয়া ইহার ষড়ঙ্গুল প্রভৃতি নাম হয়। মহানন্দ, নন্দ, বিজয় ও জয়—মতঙ্গমুনির মতে এই

চারি প্রকার বংশী উত্তম। তন্মধ্যে দশাঙ্গুল পরিমিত বংশীর নাম মহানন্দ, একাদশাঙ্গুলপরিমিতের নাম নন্দ, দ্বাদশাঙ্গুল-দীর্ঘের নাম বিজয়। চতুর্দশাঙ্গুলদীর্ঘ বংশীকে জয় বলা হয়। করতাল, কাংস্যবল, জয়ঘণ্টা, শুভ্রিকা, কম্পিকা, ঘটবাদ্য, ঘণ্টাতোদ্য, ঘর্ষর, ঝঞ্জাতাল, মঞ্জীর, কর্তরী, উস্কুর—এই দ্বাদশটি ঘনবাদ্যের ভিন্ন প্রকার—ভরতমুনি বলিয়াছেন। বীণা প্রভৃতি তত যন্ত্র দেবগণের, বংশী প্রভৃতি শুষ্ক যন্ত্র গন্ধর্ভগণের, ঢাক প্রভৃতি আনন্দ যন্ত্র রাক্ষসগণের এবং করতাল প্রভৃতি ঘন-যন্ত্র মানব বা কিন্নরগণের বাদ্য বলিয়া কথিত। সঙ্গীতপারিজাতে—ডমরু দ্বিমুষ্টি পরিমাণ, ছুই মুখ যুক্ত এবং মধ্যস্থলে সূক্ষ্ম। ইহার মুখ মুষ্টিপরিমাণ সূক্ষ্ম চর্মদ্বারা আচ্ছাদিত। সেই মুখে সংলগ্ন সূত্রের ছুইটী গ্রন্থির দ্বারা ইহা বাজান হয়। এই বাদ্য মহাদেবের হস্তে নিত্য শোভিত।

নর্তন ৪—নর্তন তিন প্রকার—নাট্য, নৃত্য ও নৃত্ত। নানা অবস্থাভেদযুক্ত লোকের যে স্বভাব তাহা আঙ্গিক অভিনয়-যুক্ত হইলে অর্থাৎ তাহার আঙ্গিক অনুকরণ হইলে পণ্ডিতগণ তাহাকে নাট্য বলিয়া থাকেন। বাক্যার্থ ও পদার্থের অনুকরণ-রূপ দ্বিবিধ অভিনয় নাটকে আছে। রসাত্মক বাক্যার্থ-অভিনয় ও ভাবাত্মক পদার্থাভিনয়—এই উভয়ই পূর্বে ভরতমুনি নাটকাদিতে প্রয়োগ করিয়াছেন। দেশপ্রচলিত রীত্যনুসারে প্রসিদ্ধ তাল-মান-লয়ের অনুসারী যে সবিলাস অঙ্গবিক্ষেপ, পণ্ডিতগণ তাহাকে নৃত্য বলেন। প্রিয়তমের দর্শন প্রভৃতি কার্যে নাট্যকার শৃঙ্গার-চেষ্টায়ুক্ত যে বৈশিষ্ট্য তাহাই বিলাস।

অঙ্গাভিনয়ে কথিত প্রকারানুসারে সর্বপ্রকার অভিনয়রহিত কেবল গাত্রবিক্ষেপকে নৃত্যবিদগণ 'নৃত্ত' বলিয়া থাকেন। নাট্য—সাত্ত্বিকবহুল রসাত্মক, বাক্যার্থাভিনয়াত্মক। নৃত্য—আঙ্গিকবহুল, ভাবাত্মক, পদার্থাভিনয়াত্মক। নৃত্ত—কেবল তাল-লয়ের অপেক্ষায়ুক্ত, অভিনয়শূন্য অঙ্গবিক্ষেপ। এই তিনটি 'মার্গ' ও 'দেশী' ভেদে দুই প্রকার। যেহেতু ব্রহ্মা-প্রভৃতি এই নৃত্য, গীত, বাদ্য শব্দুর নিকট প্রার্থনা করিয়া লাভ করিয়াছিলেন, পরে তাহা হইতে শিক্ষা করিয়া ভরতমুনি প্রভৃতি জগতে উহাদের প্রয়োগ করিয়াছিলেন সেইহেতু তাহা 'মার্গ' বলিয়া কথিত। যে গান, বাদ্য ও নৃত্য নানাদেশে তথাকার নৃপতিপ্রভৃতির অতিশয় আনন্দজনক হয় তাহাকে বিজ্ঞগণ 'দেশী' বলিয়া থাকেন। নৃত্য ও নৃত্ত তাণ্ডব ও লাস্ত্র ভেদে দুই প্রকার কথিত হয়। মহাদেবের দ্বারপাল তণ্ডু-কথিত উদ্ধতপ্রায় প্রয়োগকে 'তাণ্ডব' বলে। পুরুষের নৃত্যকে তাণ্ডব এবং স্ত্রীলোকের নৃত্যকে লাস্ত্র বলে। প্রেরণী ও বহুরূপ—ভেদে তাণ্ডব দুই প্রকার। যে তাণ্ডবনৃত্যে অঙ্গ-বিক্ষেপের আধিক্য, তদ্রূপ অভিনয়হীনতায়ুক্ত তাণ্ডবের নাম প্রেরণী। তাহার লৌকিক সংজ্ঞা দেশী। যে তাণ্ডবনৃত্যে ছেদন, ভেদন, নানাপ্রকার মুখভঙ্গি, বাণীগত উদ্ধত, তাহা বহুরূপ-তাণ্ডব। লাস্ত্রনৃত্য সুকোমলাঙ্গ ও কামবর্দ্ধক। তাহাও 'স্কুরিত' ও 'যৌবত' এই দুই প্রকার বলিয়া কথিত। যে শৃঙ্গাররসপ্রধান অভিনয়ে নায়ক-নায়িকা ভাবভরে রসভরে আলিঙ্গনচুম্বনসহিত নৃত্য করে তাহা স্কুরিত নামক

লাস্ফ-নৃত্য। যেথায় নটীগণ মধুরভাবে রচিত নানালীলা-ভঙ্গিতে নৃত্য করে সেই বশীকরণবিদ্যাসমুজ্জল নৃত্যকে যৌবত লাস্ফ কহে।

নৃত্তেরও তিনটি প্রকার কথিত আছে—বিষম, বিকট ও লঘু। রজ্জুভ্রমণাদিসহিত যে নৃত্ত তাহাকে ‘বিষম’ কহে। নানাপ্রকার বেশ ও অঙ্গ-ব্যাপারসহিত নৃত্তকে ‘বিকট’ কহে। অধিতপ্রভৃতি অল্প করণযুক্ত নৃত্তকে ‘লঘু’ কহে। অঙ্গাভিনয়-মধ্যে অঙ্গ, উপাঙ্গ ও প্রত্যঙ্গ সকলের শার্ঙ্গদেবাদিসম্মত নিরূপণ যথাজ্ঞানে প্রদর্শিত হইতেছে। শিরঃ, অংস, বক্ষঃ, পাশ্ব, হস্ত, কটি, পদ—এই সাতটি অঙ্গ। গ্রীবা, বাহুবংস, মণি-বন্ধ, পৃষ্ঠ, উদর, উরু, জঙ্ঘা, জানু ও ভূষণ—এই নয়টি প্রত্যঙ্গ। মূর্দ্ধা, চক্ষু, তারা, ভ্রুকুটী, মুখ, নাসিকা, নিশ্বাস, চিবুক, জিহ্বা, গণ্ড, দন্ত, অধর ও মুখরাগ—এই দ্বাদশটি উপাঙ্গ। তন্মধ্যে অঙ্গের প্রধানহেতু তাহাই সংক্ষেপে কথিত হইতেছে—ধৃত, বিধৃত, আধৃত, অবধৃত, কম্পিত, আকম্পিত (ঈষৎ কম্পিত), উদ্বাহিত, পরিবাহিত, অধিত, নিকুঞ্চিত, পরাবৃত্ত, উৎক্ষিপ্ত, অধোমুখ ও লোলিত—এই চতুর্দশ প্রকার শিরঃ অঙ্গের অভিনয়। ক্রমে ক্রমে আস্তে আস্তে, বক্রভাবে যে কম্পন তাহাকে ‘ধৃত-শিরঃ’ কহে। ইহা নিষেধে, অনীপ্তিত বিষয়ে, বিবাদে ও বিস্ময়ে সংঘটিত হয়। একোচ্চ, লগ্নকর্ণ, উচ্ছ্রিত, স্রস্ত, লোলিত—এই পঞ্চ প্রকার স্কন্ধ-অভিনয় কথিত হয়। নামমাত্রে উহাদের লক্ষণ পরিস্ফুট। নৃত্যবিদগণ মুষ্টিপ্রহার ও কুন্তপ্রহারে স্কন্ধাভিনয়ের নাম ‘একোচ্চ’, অলিঙ্গনে ও শীতে

‘কর্ণলগ্ন’, হর্ষগব্বাদিতে ‘উচ্ছিত’, ছুঃখে, পরিশ্রমে ও মত্ততায় ‘অস্ত’, মুচ্ছাঁ, লম্পটের নর্তন, হাস্য ও ছড্ডুকাবাদ্য-বাজনায় ‘লোলিত’ कहিয়াছেন। এই প্রকারে স্বক্কাভিনয় পাঁচ প্রকার।

বক্ষোহভিনয় পঞ্চ প্রকার, যথা—সম, আভুগ্ন, নিভুগ্ন, প্রকম্পিত ও উদাহিত। সৌষ্ঠবযুক্ত, চতুক্ষোণাঙ্গসংশ্রিত, প্রকৃতিস্থ বক্ষোহভিনয়কে ‘সম’ কহে ; স্বাভাবিক ভাবের অভিনয়ে ‘সম’ দৃষ্ট হয়। বিবর্তিত অপসূত, প্রসারিত, নত ও উন্নত—এই পাঁচ প্রকার পার্শ্বাঙ্গাভিনয়। পার্শ্বপরিবর্তনে ত্রিকের (মেরুদণ্ডের নিয়ন্ত্রাংশের) বিবর্তন-হেতু বিবর্তিত-সংজ্ঞা হয়। নৃত্যভেদে ও সাধারণতঃ হস্তাভিনয় তিন প্রকার ; যথা—অসংযুত, সংযুত ও নৃত্যহস্ত। যে-সকল হস্তাভিনয়ে এক হস্তে কার্য্য হয় তাহাদিগকে অসংযুত এবং যাহাদের অভিনয়ে হস্তদ্বয় দ্বারা কর্ম্ম কৃত হয় তাহাদিগকে সংযুত বলে। যাহারা কেবল নৃত্যকালে অবস্থান করে, কিন্তু কোন বস্তু নির্দেশ করে না, অঙ্গভঙ্গীর সহিত যুক্ত সেই অভিনয়সকলকে নৃত্যহস্তা বলে। ভারত ত্রিবিধ হস্তসঞ্চার বর্ণন করিয়াছেন—উত্তান, পার্শ্বাঙ্গ এবং অধোমুখ। পতাক, ত্রিপতাক, অর্দ্ধচন্দ্র, কর্তরী-মুখ, অরালমুষ্টি, শিখর, কপিখ, খটকামুখ, শুকতুণ্ড, কাঙ্গুল, পদ্মকোষ, পল্লব, সূচিমুখ, সর্পশিরা, চতুর, মৃগশীর্ষক, হংসাস্ত্র, হংসপক্ষ, ভ্রমর, মুকুল, উর্ণনাভ, সংদংশ, তাম্রচূড় ও কবি—এই চব্বিশ প্রকারের অসংযুতহস্তা কথিত হইয়াছে। অন্ত্রে অসংযুতসমূহের মধ্যে উপধান, সিংহমুখ, কদম্ব, নিকুঞ্জক—

এই চারিটা অধিক বলেন। দামোদর ইহার ত্রিশ সংখ্যা বলিয়াছেন। অর্থবশতঃ এই অসংযুতই সংযুত হয়।

যেই অসংযুতের অভিনয়ে অঙ্গুষ্ঠ বক্র এবং তজ্জনী মূলাশ্রিত থাকে, অঙ্গুলিসকল সরল ও সংযুক্ত থাকে তাহাকে পতাক বলে। এই পতাকাভিনয় স্পর্শস্থানে ও পেটস্থানে হয়। ইহার অঙ্গুলিসমূহ পতাকাতালিকাদিতে ও জ্বালাতে অর্দ্ধগমনপূর্ব্বক স্বল্প চঞ্চল হয়। পক্ষিপক্ষে পতাকার কটিস্থান ধারাতে অধোগমন করে। উৎক্ষেপাভিনয়ে হস্ত উচ্ছ্রিতস্থানে উর্দ্ধগমন করে, কিন্তু পুঙ্করস্থানে অধোগমন করে এবং কটিস্থানে উর্দ্ধগমন করে। কম্পন আভিমুখ্যস্থানে, নিজ-পার্শ্বদিকে, মুখস্থানে আগমন করে এবং পার্শ্ব ও নিষেধস্থানে কম্পন হয়। কিন্তু পার্শ্ব ও বিভজ্ঞনস্থানে পৃথক্ কম্পন হয়। ঘর্ষনোন্মর্দনস্থানে ও মার্জ্জনস্থানে ধীরে ধীরে পতাক কর্তব্য। শিলাদিস্থূলবস্ত্রসমূহের ধারণ ও উৎপাটনাদিস্থানে হস্ত ও কম্প্র পরস্পর সম্মুখীন করিয়া উচ্ছ্রিত ও বিচ্যুত করা কর্তব্য। উচ্ছ্রিততলাঙ্গুলি বায়ুবেগ ও তরঙ্গবেগে অধোগমন করে এবং ক্ষুদ্রপুঙ্করিণীনির্দেশে স্বস্তিক হইয়া বিচ্যুত হয়। গতিস্থানে স্বস্তিকাকারকে বিশ্লেষ করিয়া পতাক করা কর্তব্য। ছেদনস্থানে গোপন-আদর্শ-বাচন ও প্রোঞ্জনস্থানে অধোমুখ ও উত্তালতলযুক্ত হস্তদ্বয়কে কিঞ্চিৎ প্রসারিত করিয়া বেলা, বিল, গ্রাহ, গৃহ ও গুহা প্রদর্শন করা কর্তব্য। যদিও সম্পূর্ণরূপে হস্তপ্রয়োগসকল কথিত হইল, তথাপি লোকপ্রয়োগানুসারে হস্তপ্রয়োগ অভিনয়

করা কর্তব্য। কেন না, শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—লোকপ্রয়োগানুসারে ও নাট্যাঙ্গ আশ্রয় করিয়া সেই সেই চেষ্টানুসারে হস্ত প্রয়োগ করা কর্তব্য। ঘর্ষণ, ছেদন আদর্শ-বিভাগাদিস্থানে স্পষ্টরূপে হস্ত-প্রয়োগ হইয়া থাকে। ইতি পতাকাভিনয় সমাপ্ত।

সংযুত - অঞ্জলি, কপোত, কক্কট, স্বস্তিক, দোল, পুষ্প-পুটোৎসঙ্গ, খটক, বর্দ্ধমানক, গজদন্ত, অবহিৎ, নিষধ, মকর ও বর্দ্ধমান—এই তেরটা সংযুত হস্ত। যদি পতাক হস্তদ্বয়তল-সংশ্লিষ্ট হয় তাহা হইলে তাহাকে অঞ্জলি কহে। দেবতানমস্কারে এই অঞ্জলি শিরঃস্থ বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু গুরু নমস্কারে মুখস্থানগত হয় এবং বিপ্রনমস্কারে হৃদয়স্থ হয়। ইহা সাধুগণ ইচ্ছা করেন। আর অন্যান্য কপোতাদি-বিষয়ে কোন নিয়ম নাই। ইচ্ছামত যে কোন তিনটির দ্বারা নমস্কারাদি করা যাইতে পারে। চতুরস্র উদ্ভৃতাди ত্রিংশৎ-প্রকার নৃত্যহস্ত। কম্পিত, উদ্বাহিত, ছিন্ন, বিবৃত ও রেচিত এই পাঁচপ্রকার কটি-অভিনয় বলিয়া কথিত হয়। নৃত্যবিদগণ সম, অক্ষিত, কুক্ষিত, সূচ্যগ্র-তলসঞ্চর, মর্দিত, উদঘাটিত, অগ্রগ, পার্শ্বগ, পার্শ্বিগ, তাড়িত, উদঘাটিত, উচ্ছেদ ও উদঘাটিত এই তের প্রকার পদনৃত্য। স্বাভাবিকভাবে স্থিত পদদ্বয়কে সম বলে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু এই সঙ্গীত-ফোটার মহাশর্চ্যা ও বিপুল ব্যাপার প্রকটিত করিয়াছেন। পৃথিবীতে যত সঙ্গীত-সাহিত্য প্রচারিত হইয়াছে, সকলই উক্ত গোড়ীয়-সঙ্গীত-সাহিত্যের

বিকৃত আভাস মাত্র ; এমন কি, বৈকুণ্ঠের সঙ্গীত-সাহিত্যও গোড়ীয়-সঙ্গীত-সাহিত্যের অসম্পূর্ণ প্রকাশমাত্র। কারণ, সঙ্গীত-সাহিত্যের যেখানে চরমসীমা, সেই রাসক্ৰীড়ার নায়ক গোড়ীয়-সঙ্গীত-সাহিত্যের দেবতা। একমাত্র সর্বানর্থ-নিষ্পৃক্ত অপ্রাকৃত কৃষ্ণ-রস-রসিকগণই একথা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। রাসতাণ্ডবী কৃষ্ণের গৌরাবতারে যে সঙ্কীৰ্তন-রস প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা সঙ্গীত-সাহিত্য-বিশ্বে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। এমন নৃত্য-কলা, এমন বাদিত্র-কলা, এমন গীত-কলা আর কোথাও প্রকাশিত হয় নাই—যাহা শ্রীগৌরসুন্দর নিজ-গণ-সঙ্গে জগতে প্রকাশ করিয়াছেন। সঙ্কীৰ্তন-রাসস্থলী শ্রীবাসঅঙ্গনে, নগরসঙ্কীৰ্তনে এবং নীলাচলে রথাগ্রে নৃত্যকালে যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার দ্বিতীয় উদাহরণ আর কোথাও নাই। ‘সঙ্গীত-পারিজাত’, ‘সঙ্গীত-শিরোমণি’ প্রভৃতি শাস্ত্র সঙ্গীত-লক্ষণ-বর্ণনে গীত, বাজ ও নৃত্য—এই ত্রিবিধ প্রকার নির্দেশ করিয়াছে। এই তৌর্যাত্তিক নীতি-শাস্ত্রে ব্যাসনরূপে পরিগণিত। নৃত্য-নায়ক সেই তৌর্যাত্তিককেই ভগবৎসেবার পরম অনুকূল করিয়া জগতে প্রদর্শন করিয়াছেন। সঙ্গীত-সাহিত্য পরিপূর্ণরূপে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণে নিযুক্ত হইয়াছে—একমাত্র গোড়ীয়গণের সেবা-নৈপুণ্যে। মহাপ্রভুর দ্বিতীয়-স্বরূপ গন্ধর্বকণ্ঠ-ধিকারী শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামী প্রভু সেই অপ্রাকৃত সর্বশ্রেষ্ঠতম সঙ্গীত-স্ফোটকে বিক্ষারিত করিবার মূল মহাজন। তাই শ্রীমগ্নহাপ্রভু তাঁহাকে ‘দামোদর’ নাম প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীল স্বরূপ দামোদর প্রভু সঙ্গীত-

দামোদর' নামে একখানি সঙ্গীত-সাহিত্য-শাস্ত্র রচনা করিয়া সেই স্ফোট—সঙ্গীত-স্ফোটরূপে জগতের মহাদানরূপে বিতরণ করিয়াছেন। তাহার পর শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু, শ্রীল নরোত্তর ঠাকুর মহাশয় ও শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুগণের অভ্যুদয়-কালে রাণীহাটী, মনোহরসাহী ও গরণহাটী প্রভৃতি গোড়ীয়-সাহিত্যে সঙ্গীত-স্ফোটের অদ্ভুত প্রকাশ হইয়াছিল। মধুর মৃদঙ্গ-বাহুও সঙ্গীত-স্ফোটের এক অপূর্ব মাধুর্য্য প্রকাশ। তদ্বারা শ্রীমন্নহাপ্রভু ও তদীয় পার্শ্বদ ও অনুগত মহাজনগণ কৃষ্ণভক্তিরস অতি অদ্ভুত ও বিস্তৃত কৌশলে এবং বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করেন। কিন্তু পরবর্ত্তিকালে শ্রীগুরুপাদপদ্বানুগতের অভাবে সঙ্গীত-সাহিত্য-নায়কের ইন্দ্রিয়তর্পণের পরিবর্ত্তে যখন আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ-বৃত্তি জাগিয়া উঠিয়া তাল-লয়-মান-স্বরের বাহ্য-মোহ সেবা-চৈতন্যকে আবৃত করিয়া পণ্যদ্রব্য বা বিলাসীর ভোগোপকণে পর্য্যবসিত হইল।

স্ফোটের পরিপূর্ণতম প্রকাশ পরাকাষ্ঠা শিরোমণি প্রদাতা মূল মহাজন রাধাভাবছাতিসুবলিত শ্রীগৌরসুন্দর ও তদীয় পার্শ্বদ সঙ্গীগণ। তদীয় অনুগমগুলীর মধ্যে সর্ব্বপ্রধান শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামিপ্রভু, শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু, শ্রীল রূপ গোস্বামিপ্রভু, শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু, শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু, শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভু, শ্রীল গোপালভট্টগোস্বামী প্রভু, শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদ, শ্রীল হরিদাস ঠাকুর, শ্রীল কবিকর্ণপুর, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু, শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর, শ্রীল

নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর, শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু ইত্যাদি অসংখ্য গৌরপার্যদগণ। পরবর্তী কালে শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীল গৌরকিশোর বাবাজী মহারাজ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভৃতি। গ্রন্থের বিস্তারও বাহ্যিক ভয়ে এবং নিজ অযোগ্যতা নিবন্ধন সকলের নাম উল্লেখ সম্ভবপর না হওয়ায় প্রধান প্রধান মহাজনগণের মধ্যে কতিপয় নাম উল্লেখ মাত্র করিয়া সকলের শ্রীচরণে অহৈতুকী কৃপা ভিক্ষা করিতেছি। ইতি স্ফোটবাদ বিচার সমাপ্ত।

গ্রন্থকারের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

- ১। ভজন সন্দর্ভ :—আনুকূল্য প্রথমবেদ্য ৫.৭৫, দ্বিতীয়-বেদ্য ৫.৭৫, তৃতীয় বেদ্য ৬.০০, চতুর্থ বেদ্য ৬.০০। পঞ্চম ও ষষ্ঠ বেদ্য (যন্ত্রস্থ)।
 - ২। শিক্ষামৃত নির্ঘাস—২.৫০।
 - ৩। তীর্থ ও শ্রীবিগ্রহ দর্শন পদ্ধতি—৫০।
 - মায়াবাদ শোধন—২.৫০।
 - ৫। অপসম্প্রদায়ের স্বরূপ—২.৫০।
 - ৬। শ্রীগৌরহরির অত্যদ্ভুত চমৎকারী ভৌমলীলামৃত—৪.০০।
 - ৭। শিবতত্ত্ব—৮০।
 - ৮। শ্রীধাম নবদ্বীপ দর্শন—৭৫।
- ডাক মাণ্ডল স্বতন্ত্র।

(১) শ্রীল অদ্বৈতাচার্যের চরিত সুধা, (২) গীতার তাৎপর্য ও (৩) গৌরশাক্ত শ্রীগদাধর। যন্ত্রস্থ।